গৃহধর্ম্ম

শ্রীপ্রিয়নাথ বসু

শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন, এম্-এ, পি, আর, এস্

লিখিত ভূমিকা সম্বলিত।

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্
কলিকাতা।

প্রকাশক
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি, এস্‌-সি,
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দুই টাকা মাত্র

প্রিণ্টার—শ্রীকিশোরীমোহন মণ্ডল
নব-গৌরাঙ্গ প্রেস
১০৪ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

পরমারাধ্য পিতৃদেব

৺ তারক নাথ বসু মহাশয়ের

শ্রীচরণোদ্দেশ্যে ।

ভূমিকা

আমাদের দেশে গার্হস্থ্যাশ্রমকে সমস্ত সমাজের মূল বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। বিবাহ মানবজীবনের প্রধান ঘটনা তিনটীর অন্যতম। যে ব্যক্তি বিবাহিত জীবন যাপন করে না, সমাজে তাহার সাক্ষাৎভাবে অর্থাৎ স্বকৃত দায়িত্ব নাই, আঁর এই দায়িত্ব নাই বলিয়াই সামাজিক হিতসাধনে একদিকে যেমন তাহার অবারিত সুযোগ, অন্যদিকে আবার তেমনই বাধা। গার্হস্থ্যাশ্রম প্রয়োজনীয় ও প্রতিপালনীয় বলিয়া তাহা যে সহজ, বা তাহার জন্য যে কোনও সাধনার প্রয়োজন নাই, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না; বরং সংস্কৃত চরণের একটু আধটু অদলবদল করিয়া এবং ছন্দোভঙ্গের ভয়কে বিসর্জ্জন দিয়া বলিতে পারা যায়,—গৃহধর্ম্মঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ,—যাঁহারা কার্য্য-কুশল তাঁহারাও গৃহধর্ম্ম বুঝিতে পারেন না,—তাহা যে পরম গহন বা অতিশয় কঠিন।

লেখক প্রিয়নাথ বাবু কথাটা ভালভাবে বুঝিতে এবং বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এবিষয়ে আমাদের সাধারণ জ্ঞানের অত্যন্তাভাব তাঁহাকে পীড়া দিয়াছে; তাই তিনি বিবাহিত জীবনের সমস্যাগুলি সমগ্রভাবে দেখিয়াছেন;—স্বাস্থ্য, ধর্ম্ম, সত্য, চরিত্র, সঞ্চয়, দাসদাসীর প্রতি আচরণ, পুত্রকন্যার শিক্ষাদীক্ষা,—এসকল অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় তিনি আলোচনা করিয়াছেন। যাহাতে শিশু শৈশব হইতেই সদাচার অভ্যাস করে সে বিষয়ে পিতামাতার অবহিত হইতে হইবে; অনাড়ম্বর

অথচ পরিষ্কার জামাকাপড় তাহাকে পরাইতে হইবে,—এইভাবে শিক্ষার সূত্রপাত।

লেখক নারী জাগরণকে বিদ্রূপের দৃষ্টিতে দেখেন নাই, তিনি জানেন যে নারীশক্তি আজ তাহার স্বাভাবিক এবং কোনও কোনও বিষয়ে প্রাচীন প্রথানুযায়ী, অধিকার ফিরিয়া চাহিতেছে মাত্র। ইহা দেশের পক্ষে ও জাতির পক্ষে মঙ্গলকর, ইহাতে সমাজের অমঙ্গল আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক। তবে পুস্তকখানি তিনি শুধু নারীর দিক হইতেই রচনা করেন নাই; পুরুষকে, স্বামীকেও যে সংসারের অনেক বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, অবস্থা বিশেষে স্ত্রীর সেবা-যত্ন, পুত্রের শিক্ষাসংস্কার, তেলমাখা, মিতভোজন, হিসাব রাখা, ভবিষ্যতের চিন্তা, সাধারণ বিপদে আশু প্রতিকার বা প্রাথমিক প্রতিবিধান, এমন কি সূতিকা গৃহেও স্বামীর সতর্ক দৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা—খুঁটিনাটি কোনও বিষয়ই লেখক তুচ্ছ জ্ঞান করেন নাই।

ইহা ছাড়া পুস্তকের অন্য বৈশিষ্ট্য আছে। লেখকের মনে ধর্ম্মভাব সর্ব্বদা জাগরূক। বিবাহই জীবনের শেষ কথা নহে; তাহার দায়িত্ব, জাতির দিক হইতে তাহার মূল্য, একথাও বুঝিতে হইবে। প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেববাবু ইহা লইয়া পারিবারিক প্রবন্ধ ও সামাজিক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। প্রিয়নাথ বাবু তাঁহাকে আদর্শ করিয়া এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

আমাদের দেশে নারীশক্তি ও শিশুশক্তি অনর্থক অবহেলা পাইয়া আসিয়াছে, সেকথা ভাবিয়া তিনি দুঃখ বোধ করিয়াছেন। অন্য জাতির মধ্যে দেখা যায়, মাতার ও শিশুর স্বাস্থ্য ও শিক্ষা তাহারা জাতীয় কর্ত্তব্যের মধ্যে বিবেচনা করে। যাহা জাতীয় সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হইবার উপযুক্ত, যুগ যুগ সঞ্চিত অবজ্ঞার ফলে তাহা আজ আবর্জ্জনা,

উন্নতির বাধা বলিয়া মনে হইতেছে। আমাদের ভারতজোড়া কার্য্য তালিকার মধ্যে এই গৃহধর্ম্মের কথা কোথায় হারাইয়া গিয়াছে।

লেখক এ সকল বিষয়ে যাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন, শিষ্ট ও সংযত ভাষায় তাহা বাঙ্গালী পাঠকের নিকট বলিয়াছেন। নব বিবাহিত দম্পতির নিকট ইহার মূল্য যথেষ্ট। প্রাচীন সমাজে এ সকল কথা বলিবার ও বুঝাইবার জন্য বর্ষীয়ান্ আত্মীয়-স্বজন ছিলেন,—বর্ত্তমান যুগে সে সমাজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। "গৃহধর্ম্ম" গৃহে গৃহে রক্ষিত হইলে অচিরে সমাজের স্বাস্থ্য, শক্তি, শ্রী ফিরিয়া আসিবে এবং সেই উদ্দেশ্য লইয়াই পুস্তকটী লিখিত। "সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়।" এই পুরাতন কথা স্মরণ করিয়া বাঙ্গালী সমাজের সম্মুখে পুস্তকখানি উপস্থিত করিতেছি।

আশ্বিন, ১৩৪১ **শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন।**

নিবেদন

এই গ্রন্থ প্রণয়নে যে সব খ্যাতনামা চিকিৎসক, বন্ধু-বান্ধব, শ্রদ্ধাস্পদ ও স্নেহভাজনদের নিকট নানারূপে সাহায্য পাইয়াছি, এ গ্রন্থে প্রশংসার কিছু থাকিলে তাহা তাঁহাদেরই প্রাপ্য। আজ এই সুযোগে আমি তাঁহাদিগকে আমার সশ্রদ্ধকৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

অনিবার্য্য কারণে গ্রন্থ মধ্যে কয়েকটী ছাপার ভুল রহিয়া গেল। ১৭৬ পৃষ্ঠায় নবম পঙ্‌ক্তিতে 'অতিবাহিত' স্থানে 'অবিবাহিত' হইবে। বারান্তরে নির্ভুল করিবার আশা রহিল। " নিবেদন ইতি—

মহালয়া
১৩৪১ সাল। } শ্রীপ্রিয়নাথ বসু।

সূচিপত্র

বিবিধ প্রসঙ্গ ১৯২-২৩৭ পৃঃ।

গৃহধর্ম্ম

-:*:-

বিবাহ

বিবাহ মানব জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা। আপন আপন বংশ রক্ষা, প্রকারান্তরে ধর্ম্ম, জাতি, সমাজ ও শৃঙ্খলা রক্ষার ইহাই একমাত্র উপায়। হিন্দুর জীবনে ইহা অতি বড় ধর্ম্ম অনুষ্ঠান। এ সম্বন্ধ পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নী সম্বন্ধের ন্যায় পূর্ব্ব নিরূপিত না হইলেও হিন্দুর জীবনে ইহার স্থিতিকাল আজীবন, ইহার গুরুত্ব ও দায়িত্ব অত্যধিক এবং ইহার শুভাশুভ বংশ পরাম্পরাক্রমে প্রসারিত হইতে থাকে। বস্তুতঃ এই ঘটনার পর হইতেই মানব জীবনে গৃহধর্ম্মের সূত্রপাত হয়।

অনেক স্থলেই বিবাহের পূর্ব্বে পুরুষ বা নারী কাহারও স্কন্ধে তেমন গুরুতর দায়িত্ব বড় একটা থাকে না। ধূলা খেলায় দেখিতে দেখিতে শৈশব চলিয়া যায়, লেখাপড়া বা অন্য কোনরূপ বিদ্যাভ্যাসে অথবা নিরুদ্যম নিষ্কর্ম্ম সুখ-বিলাসে কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনের দুয়ারে পা দিয়া যখন জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্বকে মাথায় তুলিয়া লইতে হয়, তখন অনেকেই ইহার গুরুত্ব তেমন ভাবে উপলব্ধি করে না, করিবার প্রয়োজনও বোধ করে না। নিতান্ত হাসি খেলাচ্ছলে, অথবা চিরা-চরিত গতানুগতিক সংস্কারের বশে এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়াও

অতি অনায়াসে ইহা স্কন্ধে তুলিয়া লয়। এই অজ্ঞতার ফলে বিবাহিত জীবন দুর্ব্বহ, বিষময় ও নানারূপ দুঃখ-বেদনার লীলাভূমি হওয়া এতটুকুও অস্বাভাবিক নহে।

পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে গৃহধর্ম্মে প্রবেশ করিবার আগে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া আপন আপন দেহমনকে পুরুষত্ব, বলবীর্য্য ও সংযমাদি দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়া লইবার প্রথা ছিল। নানা কারণে সেই মহা মঙ্গলকর প্রথা দেশ হইতে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে দেহ, স্বাস্থ্য, সংযম, অর্থ, সামর্থ্য, বিদ্যাবুদ্ধি আমাদের যাহার যেরূপই থাকুক না কেন, বিবাহের পাত্রীর অভাব কাহারও হয় না। আপন অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া, স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি দিয়া, আমরা কেহ বিবাহ করি না, বিবাহ করিতে হয় বলিয়াই করি, তা' সে পিতামাতার আদেশেই হৌক, সংস্কারের বশেই হৌক, আর নিজের তাড়নায়ই হৌক, বিবাহ করিতে আমরা কেহ আপত্তি করি না, কাহারও পাত্রীরও অভাব হয় না। বিবাহ করিবার আকাঙ্ক্ষা হওয়া অন্যায় নয়, বরঞ্চ বিবাহ করিবার অভিলাস সংসারে থাকিয়া না হওয়াই অস্বাভাবিক। ভগবান সমস্ত জগৎব্যাপী দুই চোখে যাহা কিছু পড়ে সকলেরই অন্তরে এই আকাঙ্ক্ষার অঙ্কুর জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছেন, সময়ে তাহা বর্দ্ধিত হইয়া আপন প্রভাব বিস্তার করিবেই। কিন্তু আমরা সময় থাকিতে ইহার জন্য প্রস্তুত হইবার কথা চিন্তাও করি না, ইহাই এক অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। অধিকাংশ স্থলেই আমরা বিবাহের গুরুদায়িত্ব বহনে অক্ষম, এমন কি যাঁহাকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনিব, তাঁহাকে সরল, অনাড়ম্বর অন্নবস্ত্র নিয়মিত যোগাইতে পর্য্যন্ত অপারগ, তবুও অত্যন্ত অনায়াসে একটা বিবাহ করিয়া

ফেলি, ইহার সকল প্রকার কুফল নিজে মর্ম্মে মর্ম্মে ভোগ করিয়া ভবিষ্যৎ-বংশধরগণকে এক নিদারুণ নিরাশা ও মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণার মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া যাই। অক্ষম, অসুস্থ, অপরিপক্ক দেহ এবং অজ্ঞ, অপ্রস্তুত, অসংযত মন লইয়া আমরা এই অতি উচ্চ ও পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হই, কাজেই পূর্ব্বকালের মত এই চিরবাঞ্ছিত মিলনের অমৃতফলভোগী আমরা হইতে পারি না, ইহার গরলটুকুই আমাদের ভাগ্যে মিলে। দুঃখ, দারিদ্র্য, অভাব, অভিযোগ, শিশুমৃত্যু, প্রসূতিমৃত্যু, অকালমৃত্যু আমাদের সংসারে প্রেতের তাণ্ডব জুড়িয়া দেয়, জীবনে আর ইহার শেষ হয় না।

যে মিলনের অন্তরালে ভগবান তাঁহার সৃষ্টিরক্ষার কৌশল নিহিত রাখিয়াছেন, যাহা নরনারীর পক্ষে প্রায় একপ্রকার অপরিহার্য্য, যে দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া কত সীমাহীন শোকতাপ দৈন্যের কুরুক্ষেত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও অবিরত সংগ্রাম করিয়া চলিতে হয়, তাহাকে জীবনে সুসহ করিয়া লইবার শক্তি অর্জ্জন করিয়া লইতে পারিলে কতই না মঙ্গল, শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করা চলে।

যে দুই একজন মহাপুরুষ বহু জন্ম সাধনার ফলে বিধাতার এই ভুবন-মোহন মায়াজাল হইতে মুক্ত হইয়া অন্যপথে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। আমরা মায়াবদ্ধ সংসারী জীব, সংসার ত্যাগ করিয়া আত্মিক উন্নতির সাধনা দ্বারা ভগবানের পথে চলিয়া যাওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু চেষ্টা ও সাধনা থাকিলে আমরা এই মিলনের ভিতর দিয়াই আমাদের জীবনের সকল প্রকার ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া মানুষের মত বিচরণ করিতে পারি। আমাদের আদর্শ গৃহধর্ম্মকে অতি সাধারণ গৃহস্থালিতে রূপান্তরিত না করিয়া, কলহ কলরব করিয়া কয়েকটা দিন

কোন প্রকারে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সংগ্রাম না করিয়া," সময় থাকিতে চেষ্টা করিলে আমরাও মানুষের মত বাঁচিতে পারি, ঘরে ঘরে মানুষ জন্মিয়া আমাদের বংশ, পরিবার, সমাজ, স্বদেশ ও স্বধর্ম্মকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারে।

যে সংস্কার জীবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিবর্ত্তন আনয়ন করে, যাহাকে আশ্রয় করিয়া মানবদম্পতীর চারিদিক ঘিরিয়া সংসার গড়িয়া ওঠে, কত অনাগত অতিথির দল একে একে আসিয়া শূন্য গৃহ পূর্ণ করিয়া তোলে, কোলাহল কলরবে নিস্তব্ধ 'জীবন মুখরিত করিয়া দেয়, তাহাকে নিতান্ত খেলার বস্তু মনে করাও যেমন অন্যায়, সে সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানার্জ্জন না করাও তেমনই অনুচিত।

সত্য বটে আজ আর আমাদের দেশে সেই রাজর্ষি জনকের দিন নাই। নিদারুণ অন্নসমস্যা বিভীষিকার মত আমাদের চক্ষের সম্মুখে জাগিয়া উঠিয়াছে। জ্ঞান ও কর্ম্মের দুইখানি তরবারি দুই হাতে ঘুরাইয়া সংসারে চলিবার মত স্থান, আয়ু, স্বাস্থ্য কিছুই আজ আর অবশিষ্ট নাই, তথাপি এখনও তো দেশের এমন বহু লোকের নাম করা যায়, যাঁহারা প্রকাশ্যে বা লোক চক্ষুর অন্তরালে আপন স্ত্রী, পুত্র, পরিজনাদি পরিবৃত হইয়াও আপন আপন জীবনকে এক মহাসত্যের পথে টানিয়া লইয়া চলেন। তাই মনে হয়, বিবাহের উদ্দেশ্যকে অনেক পরিমাণে সিদ্ধ করিয়া তুলিয়া আপন আপন গৃহকে অনেকাংশে সংযত, সুশৃঙ্খল ও ধর্ম্মময় করিয়া তোলা একেবারে অসম্ভব নয়।

গৃহধর্ম্ম

কৈশোরকে অতিক্রম করিয়া মানুষ যখন যৌবনের দুয়ারে পা বাড়ায়, অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের লীলা যখন জোয়ারের জলের মতই ভরিয়া উঠিয়া দিনে দিনে তাহাকে চঞ্চল আত্মহারা করিয়া তোলে, সৃষ্টির সকল বস্তুই এক নূতন রূপ লইয়া চোখের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে, তখন আত্মহারা নিঃসঙ্গ মন একাকী সঙ্গোপনে আপন সঙ্গী অথবা সঙ্গিনীর মিলনলিপ্সায় বিভোর হইয়া ওঠে। এমন একটা কি যেন সে খুঁজিয়া ফিরে, যাহা পিতামাতার স্নেহের মধ্যে নাই, ভাইভগ্নীর মমতায় যাহা পাওয়া যায় না, নিকট আত্মীয় বন্ধুর ভালবাসায় যাহার সন্ধান মিলে না, যাহা পাইবার লিপ্সা নরনারীর হৃদয়ে আপনা হইতেই জাগ্রত হইয়া ওঠে।

এমনই এক সময় শুভলগ্নে পিতামাতা পুত্রকন্যার জন্য পাত্রীপাত্র আশীর্ব্বাদ করিয়া ঘরে তুলিয়া ল'ন।

কৈশোরকে অতিক্রম করিয়া যৌবনের বিচিত্র প্রভাতে প্রাণ যাহা খুঁজিতেছিল, তাহাই আয়ত্তে পাইয়া আনন্দ উদ্দামতার আর সীমা-পরিসীমা থাকে না। কিছুদিনের জন্য অনেকের হয়তো সংসারে ভাবিবার, চাহিবার, জানিবার, বুঝিবার সকল বস্তুই একাকার হইয়া যায়। ইহা অতি গুরুতর সমস্যার সময়। উচ্ছ্বসিত যৌবনতরঙ্গসঙ্কুল উদ্দাম, উন্মত্ত, উচ্ছল জীবন, সম্মুখে গুরুদায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যের পাষাণস্তূপ, শতবাহু বিস্তার করিয়া অন্যায়, অমঙ্গল, অশান্তি নিশ্চিত ধ্বংসের আবর্ত্তে টানিয়া লইতে হাত বাড়াইয়াছে, পাশাপাশি সদ্য বিবাহিত সংসার অনভিজ্ঞ দুই যুবক যুবতী, নিশ্চিত মঙ্গল, শুভ ও সত্যের পথ বাছিয়া লওয়া বড়ই কঠিন, বড়ই দুরূহ। উপযুক্ত শিক্ষা ও সংযমের বলে এই সময় হইতেই উভয়ে সকল দিক বুঝিয়া চলিতে পারিলে তবেই সংসার সুখের হয়,

বিবাহের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, জীবনের আদর্শ নিছক নিরাশা, শোকতাপ, দুঃখকষ্ট ও অশান্তির হাহাকারে ডুবিয়া যায় না।

আমরা সংস্কার বশে, আপন আপন সংসারের প্রয়োজনানুরোধে, ও আপনাদের নানা প্রকার সুখ সুবিধার জন্য একবার ও একাধিবার বিবাহ করিয়া থাকি, বিবাহের সত্যিকারের উদ্দেশ্য কেহই বড় ভাবিয়া দেখিনা। আপন আপন বংশ, সমাজ ও স্বদেশ রক্ষা করিবার জন্যই যদি বিবাহের প্রয়োজন হয়, তবে বিবাহিত জীবনের পূর্ব্ব ও প্রারম্ভ হইতেই সকল প্রকার মিতাচার, সংযমাদি দ্বারা স্বাস্থ্য, বলবীর্য্য ও উচ্চমনের সমতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলে, তবেই আপন আপন বংশ, সমাজ ও স্বদেশ রক্ষায় সমর্থ সন্তান আশা করা সম্ভব। সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষাই ভগবান কৌশলে স্ত্রী পুরুষের মিলন লিপ্সার অন্তরালে চির জাগ্রত রাখিয়াছেন। সন্তানই স্বামী, স্ত্রী, সমাজ, স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের সম্বল ও রক্ষক। কিরূপ দেহ ও মনের অধিকারী হইয়া বিবাহ করিয়া সন্তান সংসারে আনিলে তবে সেই সন্তান এত বড় দায়িত্ব বহনে সক্ষম হইবে, তাহা বিবাহের সময়ই ভাবিয়া দেখিয়া পাত্রপাত্রীর মনোনয়ন বিষয়ে অতিশয় সতর্ক হওয়া উচিত। বিবাহের উদ্দেশ্য যখন অর্থ সংগ্রহ নহে, আপন জীবনের সঙ্গী অথবা সঙ্গিনী সংগ্রহ, তখন সেই সঙ্গী ও সঙ্গিনী যাহাতে সর্ব্বপ্রকারে উপযুক্ত হন, তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করিয়া দেখাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

যদিও গৃহের সুখশান্তি অনেকাংশে গৃহিণীর উপর নির্ভর করে, তথাপি পুরুষের দায়িত্বই এক্ষেত্রে গুরুতর। পুরুষকেই সংসারে সকল কার্য্যে কর্ত্তারূপে বিরাজ করিতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষ দৈহিক

ও মানসিক বলে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া, এবং স্ত্রী স্বভাবতঃই কোমল স্বভাবা ও স্বামীর ইচ্ছানুগামিনী বলিয়া বিবাহিত জীবনের অধিকাংশ কার্য্যাবলির কর্ত্তা ও নিয়ন্তা স্বামীকেই হইতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বামীর ইচ্ছা, প্রকৃতি ও প্রভাবে স্ত্রীকে প্রভাবান্বিতা হইতে হয়, কাজেই বিবাহের পর স্ত্রীকে গঠন করা ও সংসারকে মনোমতরূপে ফুটাইয়া তোলার সকল দায়িত্ব স্বামীর উপরই বিশেষ ভাবে নির্ভর করে।

যাঁহাকে লইয়া স্বামীর আজীবন থাকিতে হইবে, ভগবান সাক্ষী করিয়া যাঁহাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করা হইল, যিনি 'সহধর্ম্মিণী' ও 'অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী' বলিয়া কত যুগ যুগান্ত হইতে অভিহিতা, তাঁহাকে মনের মত করিয়া গড়িয়া লওয়া উচিত। এমন ভাবে তাঁহাকে গড়িয়া লইতে হইবে যে, তাঁহাকে যেন কেবল গৃহের রাঁধুনী, চাকরাণী, ধাত্রী বা দাসীর মত ও স্বামীর নানারূপ সুখোৎপাদনের জন্যই জীবন ধারণ করিতে না হয়। তিনি যেন বিপদে বন্ধু, মন্ত্রণায় সচীব, সুখদুঃখ-সম্পদে অংশভাগিনী, গৃহের অন্নপূর্ণারূপিনী হইয়া আজীবন ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিতে পারেন। তাঁহার কোন প্রকার ভুলভ্রান্তি, দোষত্রুটী, অজ্ঞতা, বিরুদ্ধতা থাকিলেও, স্বামী আপন পুরুষত্ব, ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমাস্নেহের প্রভাবে সকল দোষত্রুটী সংশোধন করিয়া অজ্ঞতা দূর করিয়া দিয়া বিরুদ্ধতাকে বাধ্যতায় রূপান্তরিত করিয়া লইবেন।

স্ত্রী সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিবারে ভিন্ন রুচি, নীতি, আচার, ব্যবহারের আবেষ্টনে আজন্ম বর্দ্ধিতা; হয়তো তেমন শিক্ষাদীক্ষা পাইবার সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই। স্বামীর তুল্য জ্ঞানবুদ্ধি নানাকারণে তাঁহার না থাকাই সম্ভব; কাজেই প্রথম প্রথম স্বামীর সংসারে আসিয়া তাঁহার

নানারূপ দোষত্রুটী ভুলভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। একমাত্র স্বামীর মুখ চাহিয়াই অপরিপক্ক বয়সেও পিতামাতা, ভাইভগ্নী, আত্মীয়স্বজনের স্নেহ-মমতা পাছে ফেলিয়া, নিজের পাড়াপ্রতিবেশী, চিরপরিচিত ঘরবাড়ী সকল ছাড়িয়া তাঁহাকে স্বামীর সংসারে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়। এই সবের মায়ামমতা ছাড়িয়া আসিতে কত কষ্টই না তাঁহার হয়। স্নেহে, মমতায়, ভালবাসায় একে একে সকল কথা তাঁহাকে শিখাইয়া লওয়া, ন্যায় অন্যায় বুঝাইয়া দেওয়া, লঘুগুরু ভেদাভেদ জানাইয়া দেওয়া, স্বামীর কর্ত্তব্য ; যাহাতে নূতন সংসারে আসিয়াও অল্প সময়েই তিনি সকলের সাথে, সকল কাজে সমভাবে চলিতে পারেন। বিবাহের পরই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার মনে যেন এই ধারণা দৃঢ়ীভূত হইবার সুযোগ পায় যে, পিতৃগৃহের যে স্নেহ, মায়ামমতার আবেষ্টন দূরে রাখিয়া তাঁহাকে আসিতে হইয়াছে, এখানেও সেই স্নেহ, প্রীতি, ক্ষমা, অন্য আকারে পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। এখানেও তাঁহার অপরাধে ক্ষমা, ভুলে মার্জ্জনা ও সর্ব্বাবস্থায় স্নেহ করিবার লোক আছেন।

বিবাহের পর স্বামী অতিশয় স্নেহ-মমতার সঙ্গে আপন পত্নীকে গ্রহণ করিয়া ঘরে তুলিয়া লইবেন। আদরে, আপ্যায়নে তাঁহার মন পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়া নিজের সংসারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবেন। প্রথম প্রথম তিনি যদি মন খুলিয়া সর্ব্বপ্রকার আনন্দ দিতে না পারেন, লজ্জায়, সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া থাকেন, সেজন্য স্বামী কদাচ রূঢ় বা অসহিষ্ণু হইবেন না। আপনার অসামান্য সংযম, সহিষ্ণুতা ও অপরিসীম মমতা লইয়া তাঁহার সঙ্গে ব্যবহার করিবেন। তাঁহাকে প্রথম হইতেই নানা প্রকারে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিবেন যে,

গৃহধর্ম্ম

স্বামীই স্ত্রীর জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু, প্রাণসখা, সহায়, সম্পদ ও আশ্রয়স্থল। স্বামীর সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ ভালবাসার সম্বন্ধ; তাড়না, পীড়ন বা অত্যাচারের সম্বন্ধ নহে।

নব বিবাহিতা লজ্জানতা, সঙ্কুচিতা, নবাগতা, তরুণী স্ত্রী যেন প্রথম হইতেই বুঝিতে পারেন যে, সকল প্রকার সুখ, প্রীতি, ক্ষমা, স্নেহ, মমতার মূর্ত্ত প্রতীক পুরুষোচিত বলবীর্য্যে বীর্য্যবান্ স্বামী বিপুল আগ্রহে ও সসম্মানে তাঁহার প্রতীক্ষায় জীবনের পথে দাঁড়াইয়াছিলেন। যৌবন-তরঙ্গলীলায়িত উচ্ছ্বসিত তাঁহার নারীদেহমন পুষ্পিতা লতাটীর মতই কম্পিত আবেগে যে তরুটীকে আশ্রয় করিতে লতাইয়া আসিয়াছে, তাঁহার সে আশ্রয়তরু শাল্মলীর মত দৃঢ়, ঝড়-ঝঞ্ঝায় অচল অটল। তাঁহার অন্তরে অন্তরে আপন প্রেয়সীর জন্য সীমাহীন স্নেহ-মমতার ঝরণাধারা নিরন্তর বহিয়া চলিয়াছে। তাহা হইলে স্বামীর কোন আকাঙ্খাই অপূর্ণ থাকিবে না।

নারী যে নিজের সারা দেহমন, ইহকালের তাঁহার নিজের বলিতে যাহা কিছু সকলই অঞ্জলি ভরিয়া স্বামীকেই তাঁহার জীবন মরণের দেবতাজ্ঞানে নিবেদন করিয়া থাকেন। স্বামী যদি সসম্মানে হাত বাড়াইয়া সেই পূজারিণী দেবীকে, আপনার জীবনানন্দদায়িনী প্রাণ-সখীকে গ্রহণ করিতে পারেন, তবে সংসারজীবন নিশ্চয়ই পূর্ণানন্দময় হইবে।

সংসার পথে

—:*:—

স্বাস্থ্য রক্ষার কথা

বিবাহান্তে সংসার পথে পা বাড়াইবার সময় অনেকেই বুঝিতে পারে না, এই পথে কত বিপদ, অন্যায়, পীড়ন, ঝড়ঝঞ্ঝার সঙ্গে পাশাপাশি চলিতে হয়, কত শত্রু কত দিক হইতে কত ভাবে সংসারদুর্গ আক্রমণ করিতে চেষ্টা করে। বিবাহের পূর্ব্বে কত কল্পনার বিচিত্র চিত্রে যে সংসারের মনোমোহন ছবি হয়তো অন্তরে চিত্রিত হইয়া থাকে, সেখানে পদে পদে কতইনা অভাব, পীড়ন, লাঞ্ছনা, পথের সম্মুখে শত শত বাধার কতইনা পাষাণ স্তূপ। তাহাই অতিক্রম করিয়া এ সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হয়। কত জন হয়তো ক্ষত বিক্ষত হইয়া মধ্যপথেই ধরাশায়ী হইয়া পড়ে, কত জনের জীবন হয়তো বা কেবল সংগ্রাম করিয়াই নিঃশেষ হইয়া যায়, কত জনের কল্পনার সোনার প্রাসাদ অকালে ভূমিসাৎ হইয়া পড়ে, জয়লাভ খুব কম লোকের ভ্যাগ্যেই ঘটে।

যে কারণেই হোক্ আমাদের মধ্যবিত্ত ভদ্র ঘরের দুঃখ-দারিদ্র্য যেমন দ্রুতগতিতে সীমাপ্রান্তে চলিয়াছে, তেমনিই এই সীমাহীন দুঃখ-দারিদ্র্য সহিবার শক্তিও আমাদের খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে। নিত্য অভাব-অভিযোগ, রোগ-শোককে সহচর করিয়া লইয়া আমাদিগকে নিত্য নূতন সংসার পাতিতে হইতেছে, কি করিলে এই সব বাধা বিপত্তিকে আমাদের মধ্যে সুসহ ও সহজ করিয়া লইয়া আমরা

সংসারে অনেকাংশে শান্তির অধিকারী হইতে পারি, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত বলিয়া মনে হয়।

সংসার পথের অন্য কোন কথা ভাবিবার পূর্ব্বে স্বাস্থ্য রক্ষার কথাই আমাদের সকলের আগে মনে পড়ে, কারণ ইহাই মানুষের জীবনের সুখ-সম্পদের গোড়ার কথা। যে সংসারে মোটামুটী সকলেরই স্বাস্থ্য ভাল, সে সংসারে রোগ, অভাব ও অশান্তি অনেক পরিমাণে কম। স্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করিয়া যাঁহারা সংসার পাতেন, তাঁহাদের মনুষ্যোচিত কোন প্রকার ধর্ম্মাচরণ তো হয়ই না, রোগ, শোক ও বিশৃঙ্খলায় তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইয়া থাকে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এ বিষয়ে সতর্ক হইয়া চলিলে, এবং আপন আপন স্বাস্থ্যকে অতি অমূল্য সম্পদজ্ঞানে সযত্নে রক্ষা করিতে অভ্যস্ত হইলে, জীবনের অনেক দুঃখ ও অশান্তিকে এড়াইয়া চলা সম্ভব হয়। আমাদের সকলেরই মনে রাখা উচিত, শেয়াল-কুকুরের মত কলহ-কলরব করিয়া স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া আপনার ষোল আনা আগলাইয়া কোন প্রকারে বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিবেক প্রভৃতির অধিকারী করিয়া ভগবান আমাদিগকে সংসারে পাঠান নাই। মনুষ্যোচিত সমস্ত সৎগুণান্বিত হইয়া মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার স্পৃহা থাকাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। সে সমস্ত গুণের অধিকারী হওয়া আকাঙ্ক্ষা, অভ্যাস ও সাধনা সাপেক্ষ, সে সাধনায় সর্ব্বাগ্রে অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। জীবন সংগ্রামে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে হইলে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজন যে কত বড় তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। অথচ

স্বাস্থ্য রক্ষাই গোড়ার কথা।

স্বাস্থ্য অমূল্য সম্পদ।

স্বাস্থ্যরক্ষায় চির উদাসীন আমরা, শারীরিক বল, তেজ ও ক্ষমতা অর্জ্জনে চির অলস, তাই ঘরে ঘরে আমরা রুগ্ন, সন্তানাদি রুগ্ন। কেবল মস্তিষ্কের চর্চ্চা করিয়া দৈহিক আকার-আয়তনে পর্য্যন্ত আমরা দিন দিন খর্ব্ব বিকৃত হইয়া পড়িতেছি। আমাদের অবজ্ঞায়, উপেক্ষায়, অজ্ঞতায় আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা স্বাস্থ্যহীনা হইয়া গর্ভে সন্তান বহনে অক্ষম হইয়া পড়িতেছেন। প্রতি বৎসর কত বধূ সন্তানধারণ ও প্রসবের ক্লেশ সহিতে না পারিয়া আমাদের গৃহ শূন্য করিয়া নীরবে সরিয়া পড়িতেছেন ; আমাদের বংশ, সমাজ, স্বজাতি, স্বদেশের ভবিষ্যৎ কত সোনার দুলাল মরণের বুকে ঢলিয়া পড়িতেছে তাহার আদি অন্ত নাই, তাহার খবরও আমরা কেহ রাখি না।

স্বাস্থ্য রক্ষায় স্ত্রীর অবস্থা।

আমাদের দেশের নারীজাতি স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা, নিজের শরীরের যত্ন লওয়া তাঁহারা লজ্জাকর মনে করেন, অনেক সময় নিজের ব্যাধিপীড়ার কথা পর্য্যন্ত গোপন করিয়া থাকেন। পল্লীবধূদের মধ্যেই এই অভ্যাস সংক্রামক দেখা যায়; নিজের আহারকে পর্য্যন্ত ইঁহারা গণনার মধ্যেই আনেন না। পরিবারের সকলকে আহার করাইয়া যাহা কিছু বাঁচে তাহাই দিয়া কোন প্রকারে আপনার ক্ষুধাশান্তি করাকেই ইঁহারা গৌরব বোধ করেন। এই অভ্যাস পরিবারের অপর সকলের নিকটও এমনই স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে যে, যিনি রাঁধিলেন, বাড়িলেন, নিজে অনাহারে থাকিয়া সকলকে সন্তোষ সহকারে ভোজন করাইলেন, সকলের শেষে তাঁহার জন্য কি রহিল, না রহিল সে খোঁজটা পর্য্যন্ত অনেক স্থানে কেহ বড় করেন না। আমাদের মধ্যবিত্ত সংসারে

ঠাকুর, চাকর, দাসদাসী রাখিয়া স্ত্রীর সাংসারিক কার্য্যে সহায়তা করিবার ব্যবস্থা করা প্রায় অনেকেরই সাধ্যাতীত, কাজেই তাঁহাকে উদয়াস্ত আপন সংসারের জন্য হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিতে হয়। এত খাটিবার পরও তাঁহার স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী আহার্য্য তাঁহার ভাগ্যে মিলে না, কাজেই দুই একটী সন্তানাদি প্রসব করিবার পরই তাঁহার স্বাস্থ্য চিরজনমের মত ভাঙ্গিয়া যায়। রুগ্ন মাতার সন্তানাদিও রুগ্ন, দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। গৃহিণীর স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গেই গৃহের সমস্ত সুখ-শান্তি ধূলিসাৎ হইয়া যায়।

স্ত্রীর স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁহার নিজেরও যেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত, স্বামীরও তেমনই তাঁহার স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল সমস্ত ব্যবস্থা সাধ্যমত করিয়া দিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যরক্ষায় সহায়তা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সংসারে যে সব কার্য্য সম্পাদনে স্ত্রীকে সহায়তা করা সম্ভব, সে সব কার্য্যে স্বামী অম্লানবদনে তাঁহাকে সাহায্য করিয়া তাঁহার শ্রম লাঘব করিয়া দিবেন।

রন্ধন ও পরিবেশনের গৌরব।

দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের রন্ধনের ভার ইচ্ছায় অনিচ্ছায় স্ত্রীকেই লইতে হয়। নিজের হাতে রান্না করিয়া স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া স্বামী, অন্যান্য গুরুজন ও স্নেহভাজনদিগকে ভোজন করান নারীর অবশ্য কর্ত্তব্য ও গৌরবের বিষয়। সুখাদ্য, সুপাচ্য ও সুস্বাদু আহার্য্য কেবল তৃপ্তিসাধক নহে, তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অপরিহার্য্য ও পরম হিতকর। স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশ্যে ও পরিবারের কে কি খাইতে ভালবাসেন, না বাসেন তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রন্ধন কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। প্রতিদিনই অনেকগুলি ডাল তরকারী রাঁধিবার প্রয়োজন হয় না, সুখাদ্য ও পুষ্টিকর দুই একটী ডাল, তরকারী, ঝোল,

সামান্য কিছু ভাজাভুজি ও একটি চাটনি রাঁধিলেই যথেষ্ট। সঙ্গে কিছু ঘৃত, দধি বা দুগ্ধ থাকিলে অতি উত্তম হয়। প্রতিদিনই পরিবারের সকলে যাহাতে সামান্য কিছু কিছু দুগ্ধ বা ঘৃত অন্ততঃ এক বেলাও পান সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া রন্ধনের পদ দুই একটী কমানও মন্দ নহে। অরুচিকর, অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত মসলাযুক্ত, স্বাস্থ্যরক্ষার বিঘ্নকর, কোন আহার্য্যের ব্যবস্থা কদাপি করিতে নাই। শরীর রক্ষার উদ্দেশ্যেই আহার করা, কেবল যা তা দিয়া ভুরি ভোজনই উদ্দেশ্য নহে। জীবন-ধারণের জন্য আহারের প্রয়োজন, কেবল আহারের জন্য জীবন ধারণ নহে, একথা আমরা কয়জন ভাবিয়া দেখি? যে অন্নের জন্য দিবানিশি কত দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়া সংগ্রাম করিয়া চলিতে হইতেছে, যে অন্নের উপর স্বাস্থ্য ও জীবন নির্ভর করে, সেই অন্ন কোথায় কি ভাবে প্রস্তুত হইতেছে, তাহার খোঁজই বা আমরা কয়জন রাখি, আর সেই অন্ন-রন্ধনের ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত থাকে তাঁহারাই বা কয়জন তাহার গুরুত্ব ও দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া দেখেন?

রান্না ঘরের খোঁজ খবর।

যাঁহাদের নিজের হাতে রাঁধিবার প্রয়োজন হয় না, তাঁহারাও রান্না-ঘরের সকল প্রকার খোঁজ খবর নিজেরা উপস্থিত থাকিয়া রাখিবেন। সর্ব্বাগ্রে প্রতিদিনই দেখিবেন, রাঁধিবার ডেগ-হাঁড়ি-কড়া ইত্যাদি সুপরিষ্কৃত আছে কি না। রান্নাঘরে কোন পচা বা বাসি খাদ্য কোন কোণে পড়িয়া দুর্গন্ধ, মাছি ও নানা-রূপ ব্যাধির বীজাণু সৃষ্টি করিতেছে কি না। ডেগ-হাঁড়ি-কড়া ইত্যাদি প্রতিদিন রান্নার পর মাজিয়া রাখাই উত্তম ব্যবস্থা। যাঁহাদের সাধ্যে কুলায়, তাঁহারা ঐ সব দ্রব্য দুই প্রস্থ রাখিলে কাজের সুবিধা হয়।

আমি দেখিয়াছি, অনেক পরিবারে ডেগ ও কড়ার ভিতরটা কেবল রান্নার পর জল দিয়া কোন প্রকারে ধুইয়া রাখা হয়, এবং পরদিন আবার তাহাই ব্যবহার করা হয়। কড়াটা হয়তো বহুদিনের ব্যবহারে এমন তেল চিট্‌চিটে হইয়া থাকে যে, তাহা দেখিতেও ঘৃণা হয়; অথচ তাহারই মধ্যে প্রতিদিন নির্ব্বিবাদে রন্ধন কার্য্য চলিতেছে, এবং পরিবারের সকলে নির্ব্বিচারে তাহাই গলাধঃকরণ করিতেছে। ইহা অতিশয় কদর্য্য ও স্বাস্থ্যহানিকর অভ্যাস। প্রতিদিন না পারিলেও মাঝে মাঝে রাঁধিবার ডেগ-কড়ার ভিতর বাহির ঝক্‌ঝকে করিয়া মাজিয়া লইতে হইবে, এবং প্রতিবার রান্নার পূর্ব্বে ও পরে ভিতরটা উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে, নতুবা তাহার মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের যে সব অংশ সূক্ষ্মাকারে লাগিয়া থাকে তাহা পচিয়া বিষাক্ত হইয়া নানারূপ ব্যাধির বীজাণু সৃষ্টি করে, ও স্বাস্থ্যরক্ষায় বিঘ্ন জন্মাইয়া থাকে।

অন্ন প্রস্তুতের দায়িত্ব।

যে অন্নের দুই মুঠা একবেলা না পাইলে চক্ষে অন্ধকার দেখায়, যাহার উপর নিজের, নিজের প্রিয়তম স্বামীর ও পরিবারের অপরাপর সকলের স্বাস্থ্য ও জীবন নির্ভর করে, কদাপি আলস্য বা অবহেলা করিয়া তাহার উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে বিরত থাকা কোন গৃহিণীরই কর্ত্তব্য নহে। নিজের হাতে রান্না করিতে না হইলেও বেতনভুক্ ভৃত্যাদির উপর তাহার সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা সুগৃহিণীর লক্ষণ নহে। পরিবারের রান্না সমাপ্ত করিয়া বা রান্নার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া রান্না শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিজে যথানিয়মে

সস্নেহ পরিবেশন।

স্নান করিয়া শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করিয়া নিজের হাতে সস্নেহ পরিবেশন করিয়া সন্তোষ সহকারে সকলকে ভোজন

করাইতে হইবে। নিজের স্বামী হইতে স্নুরু করিয়া গৃহের কুকুরটীরও দৈনিক নিয়মিত আহারের খোঁজ খবর গৃহিণীর নিজে রাখিতে হইবে। পরিবেশন করিবার সময় কদাচ কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা উচিত নহে। সমস্নেহে, সমভাবে সকলকে আহার্য্য পরিবেশন করিতে হইবে এবং কে কি খাইলেন, না খাইলেন, কাহার পেট ভরিল, না ভরিল, উপস্থিত থাকিয়া নিবিষ্ট মনে এই সব লক্ষ্য করিয়া ভবিষ্যতে তদনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পরিবর্ত্তিত ও পুষ্টিকর খাদ্য।

প্রতিদিন একই খাদ্য না খাইয়া রুচি অনুযায়ী পরিবর্ত্তিত খাদ্যের ব্যবস্থা স্বাস্থ্য ও তৃপ্তির সহায়ক। আহার্য্য যাহাতে অতিশয় পুষ্টিকর, লঘুপাচ্য ও সুখাদ্য হয়, সেদিকে সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কোন্ খাদ্য অল্পব্যয়ে অধিক পুষ্টিকর ও সুখাদ্য হইবে, কোন্ খাদ্যে শরীর পোষণকারী পদার্থ কি পরিমান আছে, সে সম্বন্ধে একটা মোটামুটী ধারণা রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য, সেই অনুসারে খাদ্যনির্ব্বাচন করা চলে। টাট্‌কা ফলমূল, তরী-তরকারী, দধি-দুগ্ধ-ঘৃত এই সব যাহাতে প্রতিদিনই কিছু না কিছু আহার করা যায়, সাধ্যমত সেইরূপ ব্যবস্থা করা ভাল। পল্লীর অধিবাসিগণ একটু চেষ্টা ও যত্ন করিলেই গৃহে দুই একটী গরু পুষিয়া দুগ্ধের সংস্থান করিতে পারেন। বাড়ীর আশপাশ নিজেরাই কোদাল মারিয়া যে দিনকার যে তরী-তরকারী ফলমূল কিছু না কিছু জন্মাইয়া লইতে পারেন। ইহাতে বিনা ব্যয়ে পুষ্টিকর, সুখাদ্য পাওয়া যায়। গরু পুষিতে, বাগান করিতে, গাছের পরিচর্য্যা করিতে স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। আমি পল্লীর এমন বহু অধিবাসী দেখিয়াছি,

যাঁহাদের গৃহ সংলগ্ন জায়গা, জমি অমনি পতিত অবস্থায় পড়িয়া আছে।

স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্য।

চেষ্টা করিলে সেখানে অনেক ফলমূল অনায়াসে জন্মাইয়া লইতে পারেন। গৃহে তুই একটী গরু পুষিয়া পরিবারের সকলের দধিদুগ্ধের সংস্থান করিতে পারেন, কিন্তু সেদিকে তাঁহাদের লক্ষ্যও নাই। তাঁহারা দিবানিশি তাস পিটিয়া, পরের নিন্দা চর্চ্চা করিয়া এবং নিজের সকল প্রকার অক্ষমতা, দুঃখদৈন্য বঞ্চনার জন্য একমাত্র অদৃষ্টকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া নিতান্ত নিষ্কর্ম্ম আলস্যে দিনাতিপাত করিতেছেন।

স্বাস্থ্যরক্ষায় জলের স্থান।

শরীর রক্ষার আর একটী শ্রেষ্ঠ উপাদান জল। পরিষ্কৃত বিশুদ্ধ জল স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে এতদূর অপরিহার্য্য যে, জলকে আমাদের শাস্ত্রে নারায়ণ বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে কেবলমাত্র বিশুদ্ধ জল প্রয়োগ ও ব্যবহার দ্বারা অনেক কঠিন রোগের চিকিৎসা চলিতেছে। বড় বড় সহরে বিশুদ্ধ জল সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু দেশের শত করা প্রায় ৯৩ জন মানুষ যেখানে বাস করে, সেই পল্লীতে নদী, পুকুর, ইঁদারা ও কূপের জলই সম্বল, শোধিত জলের কোন ব্যবস্থা নাই। পল্লীবাসীরাও অভ্যাস ও অজ্ঞতা বশতঃ ব্যাধিপীড়ার সময়ও সেই জলই নির্ব্বিচারে ব্যবহার করিয়া থাকে। এক ফোঁটা শোধিত জল ও এক ফোঁটা সাধারণ জলের মধ্যে যে কত বড় পর্ব্বতপ্রমাণ ব্যবধান, তাহা অনুবিক্ষণ দ্বারা দেখিলে বেশ বুঝা যায়। অনেক পল্লীতে আবার ইঁদারা বা কূপ পর্য্যন্ত নাই, দুই একটা পুকুর মাত্র সম্বল। চাষীরা গরু স্নান করাইয়া, ধোপা কাপড় কাচিয়া, পল্লীবধূরা বাসন মাজিয়া, সংক্রামক ব্যাধির

বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া সর্ব্বদা সেই জল দূষিত করিয়া, আবার তাহাই কলসী ভরিয়া গৃহে লইয়া যাইতেছেন। এই সব অজ্ঞতার ফলে আমরা নানাভাবে দূষিত জলের সহিত নানা সংক্রামক ব্যাধির বীজাণু গলাধঃকরণ করিতেছি, আর কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি মহামারীর আকারে জাগিয়া উঠিয়া প্রতি বৎসর আমাদের এক একটা দিক ধ্বংস করিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে। বিশুদ্ধ আকারে ব্যবহার করিলে যে জল আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষায় অন্যতম সহায়ক হইতে পারে, যে জলের সাহায্যে দেহের সমস্ত দূষিত পদার্থ দেহ হইতে বহির্গত হইয়া যায়, অজ্ঞতা হেতু সেই জল স্থান, কাল ও ক্ষেত্র বিশেষে আমাদের নিকট বিষ হইয়া উঠিতেছে। তৃষ্ণায় যখন ছাতি ফাটিয়া যায়, তখন আমরা যেমন তেমন এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল পাইলেই সন্তুষ্ট। কোথাকার জল, জল বিশুদ্ধ কিনা, তাহা মনেও উদয় হয় না। আমরা জানি বহুপ্রকার কঠিন ও দুরারোগ্য ব্যাধি জল আশ্রয় করিয়া নিরন্তর আমাদের মধ্যে প্রসারিত হইতেছে, তথাপি অলস, দুর্ব্বল ও অন্ধ বলিয়া আমরা তাহার প্রতীকার করি না। বড় একটী পরিবারের জন্য বড় দুই কলসী ও ছোট একটী পরিবারের জন্য বড় এক কলসী জল প্রতিদিন রান্নার পূর্ব্বে উত্তমরূপে ফুটাইয়া লইলেই আমরা অতি অনায়াসে নির্দোষ জল পাইতে পারি ; কিন্তু আমরা ব্যাধিপীড়ায় ভুগিয়া জীর্ণ, শীর্ণ, দুর্ব্বল, ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া কোন প্রকারে বাঁচিয়া থাকিতে রাজী, মহামারীর আক্রমণে জন্তুর মত অসহায় অবস্থায় চক্ষু মুদিয়া মরিতে প্রস্তুত, তবুও সারাদিনে আধ ঘণ্টার জন্য এই শ্রমটুকু স্বীকার করিতে নারাজ।

জলের দোষে মহামারী।

জল ফুটাইয়া লইয়া দুইটা পাত্রে ঢালাঢালি করিয়া ঠাণ্ডা করিয়া একটু কর্পূর বাসিত করিয়া লইলেই বেশ সুস্বাদু হয়। প্রথম কয়েক দিন জল সিদ্ধ করিয়া লইতে ও সিদ্ধ জল খাইতে একটু কষ্ট বোধ হয়। কিন্তু কিছুদিন পরেই ইহা অভ্যাস হইয়া যায়। মা লক্ষ্মীরা একটু শ্রম স্বীকার করিয়া এই কাজটী তাঁহাদের আর দশটা কাজের মত গ্রহণ করিয়া অভ্যাসে পরিণত করিয়া লইলে আপন আপন পরিবারকে বহুপ্রকার অযথা বিপদ, ক্লেশ ও দুর্ভোগের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারেন।

বিশুদ্ধ জলের সহজ ব্যবস্থা।

আমাদের জীবন ধারণের শ্রেষ্ঠ উপাদান বায়ু, এই জন্য বায়ুকে আমাদের শাস্ত্রে জীবন বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। বায়ু আমাদের জীবন বলিয়াই দয়াময় ভগবান আমাদিগকে বায়ুর অতল সমুদ্রে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন। দিবানিশি নিদ্রায়, জাগরণে বায়ু আমাদের পক্ষে তুল্যভাবে প্রয়োজনীয়।

বায়ুই জীবন।

রাত্রিতে শয়ন করিবার সময় অনেকে গৃহের সমস্ত দরজা জানালা রুদ্ধ করিয়া, আবার কেহ কেহ বা সেই রুদ্ধ ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়া শয়ন করেন। ইহা স্বাস্থ্য রক্ষার অতিশয় প্রতিকূল আচরণ। শয়নগৃহ যাহাতে সর্ব্বদা নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ বায়ুতে পরিপূর্ণ থাকে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা অতিশয় প্রয়োজন। রাত্রিতে প্রয়োজন বোধ করিলে গায়ে চাদর ব্যবহার করা চলে, কিন্তু ঘরে বায়ু প্রবেশের ও নির্গমণের পথ রোধ করিয়া কদাপি শয়ন করিতে নাই।

পরিমিত পানাহার, নির্ম্মল বায়ুপূর্ণ শুষ্ক গৃহে বাস, প্রয়োজন মত অঙ্গ চালনা, সংযত অনাড়ম্বর সরল জীবনযাপন ও সর্ব্ব কর্ম্মে সর্ব্বাবস্থায়

গৃহধর্ম্ম

ভগবানে বিশ্বাস ও নির্ভরই স্বাস্থ্য রক্ষার প্রধান সহায়ক। জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বক্ষণে এই কয়টী বিষয় হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিয়া দেখিয়া সংসার পথের প্রতিপদে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের সহায়তায় এই কয়টী অভ্যাস জীবনে সহজ করিয়া লইতে পারিলে অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যের অধিকারী হইয়া সংসারে অনেক দুঃখ কষ্টের হাত এড়াইয়া চলা সম্ভব হইবে।

ধর্ম্মাচরণ

গৃহধর্ম্মে মনুষ্যোচিত সকল প্রকার ধর্ম্মাচরণে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সহায়তা করিবার জন্যই বিবাহকে হিন্দুরা জীবনের অতিবড় ধর্ম্মানুষ্ঠানে পরিণত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং পত্নী পতিকে এই সব ধর্ম্মাচরণে সহায়তা করিতেন বলিয়া ধর্ম্মপত্নী, সহধর্ম্মিণী প্রভৃতি কথার উদ্ভব হইয়াছে। আমাদেরই পূর্ব্ব পুরুষগণের সেই ধর্ম্ম, সত্য, স্বাস্থ্য, আয়ু, বল, শক্তি আজ আমাদের স্বপনেরও অগোচর হইয়া গিয়াছে। দেশের সেই সুখ-শান্তি-স্বচ্ছলতার দিন চির অন্তর্হিত হইয়া কঠিন জীবন সমস্যা আজ বিভীষিকার মত আমাদের চক্ষের সম্মুখে জাগিয়া উঠিয়াছে; তথাপি সংযম চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা এই নিদারুণ দুর্দ্দশার সংসারেও আমরা ধর্ম্মরক্ষার অধিকারী হইতে পারি, সে বিষয়ে সংশয়ের লেশমাত্রও নাই।

মানবজীবনের সকল প্রকার ধর্ম্মাচরণ দ্বারা উচ্চতর গতিপথে অগ্রসর হইবার জন্য শক্তির অধিকারী করিয়া ভগবান আমাদিগকে সংসারে পাঠাইয়াছেন, কিন্তু নানা কারণে আমরা সেই ধর্ম্মকেই বাদ দিয়া ঘরে ঘরে সংসার পাতিতেছি। সংসারে থাকিয়া স্ত্রী, পুত্র, পরিবার প্রতিপালন করিযা, স্বামী, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, দেবর, ভাসুর, আত্মীয়, স্বজন, অতিথি, অভ্যাগত, আশ্রিত, মুখাপেক্ষী, দরিদ্র, কাঙ্গাল, ভিখারী সকলের সেবা ও যত্নের ভিতর দিয়া আমরা অনেকাংশে সেই ধর্ম্ম পালন করিতে পারি।

কৈশোর বা যৌবনে ঈশ্বরানুরাগ।

অনেক স্থলে দেখা যায়, কৈশোর বা যৌবনে কেহ কেহ একটু ঈশ্বরানুরাগী হইলে পিতামাতা বা অন্য আত্মীয় স্বজন তাড়াতাড়ি তাহার একটা বিবাহ দিয়া তাহাকে সে পথ হইতে ভ্রষ্ট করিবায় প্রয়াস পান। জীবনের এই অতি বড় ধর্ম্মানুষ্ঠান বিবাহটা কি তবে এমনই একটা জিনিষ, যাহার প্রভাবে মানুষ উচ্চতর গতিপথ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে? এই পবিত্র সংস্কারের উদ্দেশ্য কি ইহাই যে, স্বামী-স্ত্রী দুইজনে নিতান্ত অন্ধের ন্যায় সংস্কার বশে একত্র মিলিত হইয়া কতকগুলি সন্তান সংসারে আনিয়া অভাব, অভিযোগ, রোগ, শোক, তাপের সহিত অবিরাম সংগ্রাম করিয়া অন্যায়, অধর্ম্মের আশ্রয়ে কোন প্রকারে কয়েকটা দিন বাঁচিয়া যাইব? পরস্পরের সাহায্যে যেমন তেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকাটাই বিবাহের উদ্দেশ্য, না দুইজনের সহায়তায় দুইজনে ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সাধনায়, সত্যে দুইজনের জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলাই ইহার উদ্দেশ্য?

কুশিক্ষার ফলে আজ আমরা আমাদের পৈতৃক ধর্ম্মপ্রবণতা হারাইয়া

ফেলিয়াছি। ভগবানের কথা উঠিলেই আমরা নানা তর্ক জুড়িয়া দিয়া তাঁহার অস্তিত্বে অনাস্থা ও অবিশ্বাস স্থাপন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি।

ঈশ্বরতত্ত্ব হৃদয়ের বস্তু।

ভগবানতত্ত্ব সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, ব্যাকরণ, শাস্ত্রের ন্যায় সহজ লভ্য নহে। ইহা কোন প্রকার পুঁথিগত বিদ্যাসাপেক্ষ নহে, ইহা কেবল অন্তর দিয়া জানিবার ও বুঝিবার বস্তু। যাঁহারা উর্দ্ধপদে, হেট মুণ্ডে জীবনব্যাপী তাঁহার সাধনা করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা জীবন ভরিয়া তাঁহার জন্য কাঁদিয়াছেন, তাঁহাকে ডাকিয়াছেন, সরল মনে তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করা ভিন্ন আমাদের পক্ষে গত্যন্তর নাই এবং সেই বিশ্বাসেই সংসারে

ঈশ্বরে সরল বিশ্বাস।

দুঃখে, বিপদে অনেক বল, অনেক সাহস যখন পাওয়া যায়, তখন কাজই বা কি আমাদের অত তর্কে? দুর্দ্দশা দুরবস্থায় পড়িলে আপনা হইতেই যাহার নাম মনে পড়িয়া শত বিপদেও একটু বল, একটু ভরসা কোথা হইতে যেন আসিয়া জোটে। এ সংসারে যাহার কেহ নাই, তাহার ভগবান আছেন মনে করিয়া সে যখন অন্তরে অন্তরে একটু আশ্রয় পায়, তখন আর বিচারের কি-ই বা আছে? শোকে, ব্যাধিতে, অন্তিমে যাঁহার নাম আপনা হইতেই প্রাণে সান্ত্বনা বহিয়া আনে, তাঁহার কথা লইয়া তর্ক অবিশ্বাসেরই বা প্রয়োজন কোথায়?

তিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া ইহারই মধ্যেই ব্যাপ্ত হইয়া আছেন।

তাঁহাকে আশ্রয় করা ও না করা।

আমরা চক্ষু মেলিয়া দেখিলেই তাঁহাকে দেখিতে পাই, প্রাণ খুলিয়া ডাকিলেই তিনি অলক্ষ্যে পাশে আসিয়া দাঁড়ান। তাঁহাকে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত করিয়া সংসারে প্রবেশ করিতে

পারিলে আমাদের তো কোন দুঃখই থাকে না। কিন্তু আমরা পাপ, হিংসা, দ্বেষ, বিলাস, বাসনা প্রভৃতি দ্বারা অভ্রভেদী প্রাচীর তুলিয়া তাঁহার আসিবার পথটুকু রুদ্ধ করিয়া রাখি, আমাদের সংসার যাত্রায় তাঁহাকে আমরা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বোধে বাদ দিয়া লই, তাই পদে পদে পথভ্রান্ত হইয়া শোক-দুঃখে আমরা অভিভূত হইয়া পড়ি, দুঃখকষ্ট সহিবার শক্তিহারা হইয়া কতই না হা হুতাশ করিয়া মরি।

যাহাকে আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রের ন্যায় মহাসমর জয় করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আমরা সংসারসংগ্রামে অগ্রসর হইতে পারিলে আমাদের পরাজয়ের কোন আশঙ্কাই তো থাকে না।

এই দুঃখ দারিদ্র্যের সংসারে তাঁহারই নাম আমাদের মূলধন করিয়া লইয়া চলিতে হইবে, যাহাতে কোন বিপদ আমাদের কাছেও ঘেঁষিতে না পারে।

স্বামী যদি ধর্ম্মপথে জীবনযাপন করিতে চান ধর্ম্মপত্নী কদাপি তাঁহাকে সে পথে বাধা দিতে পারেন না। যিনি দেন, বুঝিতে হইবে, তিনি ধর্ম্মপত্নী নহেন, তিনি স্বামীর শুভ ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী নহেন, হিন্দুর বিবাহের উদ্দেশ্য ও গৃহধর্ম্মে প্রবেশের তাৎপর্য্য তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, বিবাহকে কেবল কতগুলি সুখ-সুবিধার উপায় মাত্র ধরিয়া রাখিয়াছেন।

ধর্ম্মপত্নী।

স্বামীও স্ত্রীর সকলপ্রকার ধর্ম্মকার্য্যে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করিবেন। আগে আমাদের দেশে স্ত্রীলোকেরা কত প্রকার ব্রত, পার্ব্বণ, পূজা, উপবাস ধর্ম্মের নামে কত কষ্ট হাসি মুখে বরণ করিতেন। কুশিক্ষা ও অশিক্ষার ফলে এই নিষ্ঠা দ্রুতগতিতে

অন্তঃপুরে ধর্ম্মাচরণ।

দেশ হইতে চলিয়া যাইতেছে। এই যে পূজা, পার্ব্বণ, ব্রত, উপবাস, ধর্ম্মের নামে কৃচ্ছ্রসাধন আমাদের দেশের মেয়েরা আগে ঘরে ঘরে করিতেন, তাহার কি সত্যিকারের কোন মূল্যই ছিল না? তাহাই আমাদের গৃহের পবিত্রতা ও বৈশিষ্ট রক্ষা করিয়া চলিত, তাহাই আমাদের প্রতি ঘরে ধর্ম্মের দীপ জ্বালিয়া রাখিত। সেই সব হারাইয়া আমাদের অনেক গৃহের গৃহিণীরা বিদেশী হাবভাব, চালচলন অনুকরণ করিয়া আপনাদিগকে মহাকৃতার্থ বোধ করিতেছেন। সন্ধ্যার সময় মাটীর মলিকায় প্রদীপ জ্বালিয়া ধূপ-ধূনার গন্ধে গৃহখানি আমোদিত করিয়া গৃহিণী যখন তুলসী তলায় প্রণাম করিয়া ঘরে ঘরে ধূপ বাতি দেন, তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘেরিয়া যে অসামান্য শুচিতা ফুটিয়া ওঠে, তাহার কি সত্যিকারের কোন মূল্যই নাই? আমাদের কুশিক্ষায় ও অজ্ঞতায় আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা পর্য্যন্ত আজ পথভ্রান্ত হইতে বসিয়াছেন।

উৎসবের নামে দরিদ্র নারায়ণের সেবা।

সে ভক্তি-বিশ্বাস আজ আমরা হারাইয়াছি, যাহার ফলে গৃহে গৃহে বার মাসে তের পার্ব্বণ হইত, গৃহীগৃহিণী আহার নিদ্রা ভুলিয়া আত্মীয়, স্বজন, মুখাপেক্ষী, গ্রামবাসী, প্রতিবেশী দরিদ্রনারায়ণের সেবা করিতেন। গরীব-কাঙ্গাল পেট ভরিয়া খাইয়া বাঁচিত, হাতে একখানি নূতন কাপড় পাইয়া মুখের হাসির অন্তরালে এক ফোঁটা চক্ষের জল ফুটিয়া উঠিত। সেদিন আমরাই হারাইয়া বসিয়াছি, যেদিনে সারাদিনমান অনাহারে থাকিয়াও গৃহীগৃহিণী পরকে খাওয়াইতে, গোলাভরা দ্রব্যসম্ভার পরের জন্য বিলাইয়া দিতে এতটুকু কাতরতা বোধ করিতেন না। যখন পূজার ছুটী পাইলেই দেশবিদেশে যাইয়া স্বাস্থ্য সঞ্চয় না করিলেও শতবর্ষ পরমায়ু

ভোগ করা চলিত। হিন্দু আমরা, দিনে দিনে আমরা আমাদের সকল প্রকার নিষ্ঠা, বৈশিষ্ট, আচারত্যাগী হইয়া উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতির কোন্ স্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, তাহা ভাবিবার বিষয়।

আমাদের দেশের নারীরা স্বভাবতঃই ধর্ম্মপ্রবণ, দেশে যদি এখনও কিছু ধর্ম্মের ভাব থাকে, তাহা তাঁহাদের মধ্যেই আছে। তাঁহারা তাঁহাদের অন্তঃপুর হইতে সেই নিষ্ঠাকে যেন কিছুতেই নির্ব্বাসন না দেন। তাঁহারা যেন সংসারের শত কর্ম্মের মধ্যেও আপনার নিষ্ঠা, বৈশিষ্ট ও তপস্যার দীপটীকে জ্বালাইয়া রাখেন, তাহারই আলোকে আমাদের গৃহের অন্তঃপুরের অন্ধকারটুকু অন্ততঃ দূরীভূত হইবে, আর সেই আলোকের রশ্মিতে সেই পবিত্র ধূপ-ধূনার গন্ধে হয়তো আমাদের মনের অবিশ্বাস, অন্ধকার, সংশয় একদিন দূর হইয়া আবার আমরা সত্যপথের সন্ধান খুঁজিয়া লইতে পারিব।

একান্নভুক্ত পরিবার

সংসার করিতে গেলে ধনের যেমন প্রয়োজন, জনবলের প্রয়োজন সকল ক্ষেত্রে ঠিক তদনুরূপ না হইলেও একেবারে কম নহে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে একান্নভুক্ত পরিবারের বাহুল্য থাকায় প্রতি পরিবারেই ধনবল ও জনবলের একত্র সমাবেশ দেখা যাইত। অধুনা দেশ হইতে

সেই একান্নভুক্ত পরিবার লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ায়, যেখানে ধন আছে, সেখানে জনের অভাব, যেখানে হয়তো বা জন আছে, সেখানে ধনের সংস্থান হয় না। একান্নভুক্ত পরিবার রক্ষা করিতে হইলে সমদর্শিতা, পরার্থপরতা, ন্যায়ানুরাগ, পরমত সহিষ্ণুতা প্রভৃতি যেসব গুণের প্রয়োজন তাহার একটীও আমাদের অনেকের মধ্যে না থাকায় সর্ব্বসুখসমন্বিত সাধের একান্নভুক্ত পরিবার ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, আর কোন দিন তাহা ফিরিয়া আসিবে কিনা তাহা সেই সকল জানার মালিক অন্তর্য্যামী ভগবান জানেন।

একান্নভুক্ত পরিবারের উপকারিতা।

তখন গৃহের কর্ত্তাকে সকলে মানিতেন, তাঁহার নির্দ্দেশমত সংসার চলিত। উপার্জ্জনশীল সকলে আপন আপন উপার্জ্জিত অর্থ আনিয়া তাঁহার হাতে দিতেন, তিনি গৃহের সক্ষম অক্ষম সকলের জন্য সমভাবে তাহা ব্যয় করিতেন, দানধ্যান, পূজাপার্ব্বণাদির ব্যবস্থা করিতেন, উদ্বৃত্ত যাহা কিছু থাকিত সকলের জন্য সঞ্চয় করিতেন। পরিবারের বধূরা সমভাবে বস্ত্রালঙ্কার পাইতেন, বিধবা বধূ তাঁহার তীর্থ ভ্রমণের অর্থ পাইতেন, গৃহের কর্ত্তা হইতে সুরু করিয়া ভৃত্যটী পর্য্যন্ত একভাবে আহার্য্য পাইতেন, সকলে 'সমান ব্যবহার পাইতেন। গৃহে কাহারও অসুখ-বিসুখ হইলে সেবা শুশ্রূষার লোকের অভাব হইত না। বিপদে আপদে একই পরিবারে বহু লোক একসঙ্গে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইতেন। একজনের অপমান দশজনের বুকে বাজিত, দশজন একত্র দেখিয়া অপর কেহ সাহস করিয়া পরিবারের কোন অনিষ্ট করিতে উদ্যত হইত না। বর্ত্তমানে আমরা সেই সুখের ঘর ভাঙ্গিয়া দিয়াছি। একই মাতৃগর্ভজাত পরম স্নেহময় ভাই আজ

আমাদের নিকট বহুদূরবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ আমরা নিজের ষোল আনা রোজগার নিজে পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করিবার আশায় কোন প্রকার আয়ের সুবিধা করিতে পারিলেই সস্ত্রীক আপনার আত্মীয়-স্বজন হইতে বিছিন্ন হইয়া পড়িতে শিখিয়াছি। প্রকৃতির লীলানিকেতন অবাধ আলোক-বাতাস পরিপূর্ণ শান্তিময় পল্লীর গৃহে আমাদের স্থানের অকুলান হইয়া উঠিয়াছে, যে কোন সহরে বসিয়া আপন উপার্জ্জন দ্বারা আপনার স্ত্রীপুত্রাদির সুখ-সুবিধা ভবিষ্যতের সঞ্চয় ও ঔষধের শিশি লইয়া ছুটাছুটি করিতেই প্রাণান্ত হইয়া যাইতেছে।

কেবল চাকুরী চাকুরী করিয়া চাকুরীর মোহে সমাজ, স্বজন হইতে বিছিন্ন হইয়া আমরা সামান্যমাত্র চাকুরী অবলম্বন করিয়া সহরের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছি, আর নানা দেশপ্রত্যাগত ব্যবসায়ীর দল স্বাধীন উপার্জ্জনের সকল পথ রুদ্ধ করিয়া আমাদের গণ্ডে চপেটাঘাত করিয়া আমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা অর্থ লুটিয়া লইতেছে। সমস্ত আত্মীয়-স্বগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একা থাকার জন্য স্ত্রীর অসুখে-বিসুখে সাহায্য করিবার আর কেহ নাই, মাসে আট দশ দিন হয়তো হোটেলেই চালাইতে হয়। এই ভাবে সুখের আশায় আনন্দের বাজার ভাঙ্গিয়া দিয়া আজ আমরা কোথায়

আজ আমরা কোথায় দাঁড়াইয়াছি ?

দাঁড়াইয়াছি ? আজ আমাদের পরমায়ু গড়ে ২২ বৎসর মাত্র। অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাঙ্গালীর* স্বাস্থ্য ও বল-বীর্য্যের তুলনা না করাই ভাল। সমস্ত শুভ, কল্যাণ ও সত্য পথ, যাহা আশ্রয় করিয়া আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ বাঁচিয়াছিলেন, নিতান্ত নির্ব্বিচারে তাহা ছাড়িয়া দিয়া মোহগ্রস্তের ন্যায়, অন্ধের ন্যায় আমরা মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ভদ্র সন্তান নিশ্চিত ধ্বংশের পানে দ্রুত গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছি।

যাঁহাদের অনুকরণে আমরা কেবলমাত্র স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া পৃথক থাকিতে অভ্যস্ত হইতেছি, আমরা ভাবিয়া দেখি না, কেন তাঁহাদের ঐরূপ থাকা সম্ভব হয়। তাঁহারা সম্পূর্ণ উপযুক্ত না হইয়া কেহ বিবাহ করেন না, তাঁহাদের রোগে শুশ্রূষা, চিকিৎসার জন্য গৃহ হইতেও উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা হাঁসপাতালে আছে, তাঁহাদের প্রসূতির জন্য উপযুক্ত প্রসবাগারের অভাব নাই, আমাদের ঐরূপ ব্যবস্থা কয়টাই বা আছে, আর তাহা এই কোটি কোটি লোকের প্রয়োজনে কতই না নগণ্য।

অনুকরণের অসুবিধা।

একান্নভুক্ত পরিবার নষ্ট হইয়া যাওয়ার জন্য বধূরা অনেকাংশে দায়ী, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহারা যে সংসার হইতে আসেন সেখানেও অনেকে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই দেখিয়া আসেন। কেবল নিজের ভাইভগ্নী পিতামাতাকে লইয়া সংসার করিয়া ও আপন জ্যাঠাখুড়া, জ্যেঠীখুড়ী, জ্যাঠতুত, খুড়তুত ভাইভগ্নীকে পৃথক ও পর দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া এবং জ্যেঠীখুড়ীর সহিত নিজের জননীকে অতি তুচ্ছ কারণে ঝগড়াঝাটি করিতে দেখিয়া নিজেও সেই বিবাদ কলহে যোগ দিয়া স্বজনদ্রোহিতা শিক্ষা করিয়া আসেন। কাজেই স্বামীর সংসারে আসিয়া বড় পোষ্য পরিবার দেখিয়া তাঁহারা হাঁপাইয়া ওঠেন। যদি নিজের স্বামীর অর্থে পরিবার প্রতিপালিত হইতে দেখেন, তবে অত্যন্ত অবলীলাক্রমে অক্ষম দেবরভাসুরপত্নীর স্কন্ধে সংসারের সমস্ত কাজের ভার চাপাইয়া দিয়া কেবল তাঁহাদের ছিদ্রান্বেষণ করিয়া কি ভাবে সোনার সংসারকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া আপনার ষোল আনা বুঝিয়া লওয়া যায়, তাহারই

একান্নভুক্ত পরিবারে স্বার্থপর স্ত্রী।

সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকেন। এই শ্রেণীর বধূর সংখ্যা আমাদের দেশে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ইঁহারা আপন আপন স্বামীকে গৃহপালিত জন্তুবিশেষ করিয়া লইতে এমনই পটু এবং অনেকে আবার পিতৃগৃহ হইতে আসিবার সময় বহুদর্শিনী জননীর নিকট হইতে এমন সব উপদেশাবলি আপন উদরে সঞ্চয় করিয়া লইয়া আসেন, যাহা উদ্গীরণ করিয়া অতি অনায়াসেই তাঁহারা স্বামীর একান্নভুক্ত পরিবারকে তিক্ত বিষাক্ত করিয়া তোলেন।

বধূ অন্য এক সংসার হইতে স্বামীর সংসারে আসেন। সাধারণতঃ তাঁহার বুদ্ধি বিবেচনা স্বামী অপেক্ষা অপরিপক্ক, তিনি হয়তো একান্নভুক্ত পরিবারের সুযোগ সুবিধা দেখিবার ও বুঝিবার অবকাশ পান নাই। স্বামী তো আপন সংসারের ভালমন্দ হিতাহিত সকলই বুঝিতে পারেন। স্বামীর পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নী, আত্মীয়, স্বগণের প্রতি স্বামীর ন্যায় ভক্তি স্নেহ ভালবাসা স্ত্রীর না থাকা অসম্ভব নহে। তাঁহাদের কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ বা আপন স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া কাহারও বিরুদ্ধে মিথ্যা বলিয়া অন্যায় দোষারোপ করিয়া নানাভাবে স্বামীকে উত্তেজিত করাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে। কিন্তু তাঁহারই প্ররোচণায় আপন ঘনিষ্ঠদের প্রতি অন্যায় আচরণ করা, আপন সংসারকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা পুরুষের শোভা পায় না। কেবলমাত্র স্ত্রীর পরামর্শে আত্মস্বার্থপ্রণোদিত হইয়া, যে সহোদরকে ভগবান একই জঠরে স্থান দিয়া নিতান্ত ঘনিষ্ঠ করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছেন, তাহাকে দূর করিয়া দেওয়া পাপবৈ আর কিছুই নহে। এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীকে সস্নেহে সকল কথা বুঝাইয়া দিয়া অতিশয় দৃঢ়তা অবলম্বন করাই স্বামীর কর্ত্তব্য।

নিজেদেরই যদি দুইটী পুত্র সন্তান হয়, তাহাদের একটী সক্ষম ও অপরটী অক্ষম হয়, এবং সেই সক্ষম যদি অক্ষম ভাইটীকে পৃথগন্ন করিয়া দিয়া তাহারই দারিদ্র্যের পাশে মহাসুখে বিরাজ করিতে থাকে, তবে সক্ষমের জাঁক জমক দেখিয়া মনে সুখের উদয় হইবে, না অক্ষমের প্রতি সক্ষমের ব্যবহারে দুঃখ হইবে? তাহাই ভাবিয়া দেখিয়া পরিবারের প্রত্যেকের প্রতি কর্ত্তব্য স্থির করাই স্বামী-স্ত্রীর উচিত।

সকল পরিবারে সকলে সমভাবে কোনদিনই উপযুক্ত হইতে পারে না। ভগবান একজন উপযুক্তকে উপলক্ষ করিয়া দশজন অক্ষম অনুপযুক্তের জীবিকার সংস্থান করিয়া থাকেন। সেই সব অক্ষম ও মুখাপেক্ষীদের উপেক্ষা করিয়া নিজের ষোল আনা নিজে ভোগ করিবার চেষ্টার ফলেই আমরা মনুষ্যোচিত সকল প্রকার গুণাবলি ও পারিবারিক, সামাজিক সকল প্রকার একতা, সুখসুবিধা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পশুর ন্যায় জীবন ধারণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছি।

পরিবারের অক্ষম মুখাপেক্ষীদের বঞ্চিত করিয়া যে অর্থ আমরা কেবলমাত্র আমাদের জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখি, তাহা কি আমাদের সঙ্গে যায়? কাহার সঞ্চিত অর্থ কোথায় কি ভাবে ব্যয়িত হইবে, না হইবে, তাহার কোনই নিশ্চয়তা নাই, সে অর্থ কাহার ভোগে আসিবে, না আসিবে, তাহাও কেহ দেখিতে আসিবে না। অর্থের সদ্ব্যবহারই অর্থের প্রকৃত সঞ্চয়। অর্থ যার দাস, সে-ই প্রকৃত মানুষ। আমরা একথা ভুলিয়া গিয়া জীবনব্যাপী কেবল স্ত্রী ও অর্থের দাসত্ব করিয়া জীবনে নানা দুঃখ ও পাপ অর্জ্জন করিয়া রিক্ত হাতে একদিন চক্ষু বুজি। আপন প্রারব্ধ কর্ম্মফলে যে দুঃখভাগী

অর্থ কাহারও সঙ্গে যায় না।

হইয়া সংসারে আসিবে, সে ধনীর ঘরেই আসুক, আর দরিদ্রের ঘরেই আসুক দুঃখভোগ তাহার অনিবার্য্য। তাহার পিতামাতা তাহার জন্য অসংখ্য টাকা রাখিয়া গেলেও সে কোন প্রকারেই আপন কর্ম্মার্জ্জিত দুঃখের হাত এড়াইতে পারিবে না, এরূপ ঘটনা সংসারে বিরল নহে। আর জন্মান্তরের কর্ম্মবলে যে সুখভোগের জন্য আসিতেছে, দুঃখদারিদ্র্যের শত পাষাণভার ঠেলিয়াও সে আপনার প্রাপ্য আদায় করিয়া লইবে, কেহ তাহার গতি প্রতিরোধ করিতে পারিবে না, এরূপ বহু ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। আপন আপন কর্ম্ম দ্বারাই আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত। সুখদুঃখ আমরাই যখন আপন আপন কর্ম্মদ্বারা জন্ম হইতে জন্মান্তরে অর্জ্জন করিয়া লই, তখন কেন বৃথা মনুষ্যোচিত ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, পশুর মত হীনস্বার্থের দাসদাসী হইয়া, কেবলমাত্র আপনাকে লইয়া বিব্রত থাকিয়া ভবিষ্যৎ জীবনকে হীনতার ভাগ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া যাই।

কর্ম্মফলে সুখদুঃখ ভাগী।

একান্নবর্ত্তী পরিবারে যাঁহারা নিতান্তই অক্ষম, সক্ষমরা যাঁহাদিগকে নিতান্ত বোঝা ও গলগ্রহ জ্ঞান করেন, যাঁহারা প্রায় প্রতি পরিবারেই চিরকাল ধরিয়া দুই একটী করিয়া ছিলেন ও আছেন, তাঁহারাও পরিবার ও গ্রামের কত বড় একটা স্থান পূর্ণ করিয়া থাকেন, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হয়। তোমরা যাঁহারা সক্ষম, তাঁহাদের অসুখে বিসুখে তাঁহারাই ডাক্তার কবিরাজের জন্য দিবারাত্রি ছুটাছুটী করিবেন, রাত্রি জাগিয়া প্রাণপণ করিয়া তাঁহারাই তোমাদের জন্য শিয়রে বসিয়া থাকিবেন, তোমাদের মলমূত্র তাঁহারাই অম্লানবদনে দুই হাত পাতিয়া পরিষ্কার করিবেন। তোমাদের

পরিবার ও গ্রামের বন্ধু।

কোন উৎসব আনন্দে তাঁহারাই আপনার উৎসব জ্ঞানে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইবেন, তাঁহাদেরই হাসি কলরবে তোমাদের গৃহপ্রাঙ্গণ মুখরিত হইবে, আপনার কাজ জ্ঞানে দাসদাসীর কাজও তাঁহারাই অম্লানবদনে স্বহস্তে সম্পাদন করিবেন, তোমাদের গৃহাগত নিমন্ত্রিত অতিথি অভ্যাগতদিগকে তাঁহারাই আদর আপ্যায়ণে পরিতুষ্ট করিবেন। তোমাদের অন্তিম কালে তাঁহারাই ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন, ধূলায় লুটাইয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিবেন, তাঁহারাই কাঁধে করিয়া লইয়া গিয়া তোমাদের সৎকার করিয়া বন্ধুর কাজ করিবেন। তাঁহারা হয়তো উপার্জ্জন করিতে পারেন না, পরিবারে আর্থিক সাহায্য করিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহারাই অল্পে তুষ্ট, মিষ্ট কথার তাঁহারা দাস; পরিবারের তাঁহারা হিতৈষী, গ্রামের বিপদে, আপদে, উৎসবে, আনন্দে, অন্তিমে, শ্মশানে তাঁহারাই বন্ধু। তাঁহারাই পরিবার ও গ্রামকে জীবন্ত করিয়া রাখেন। কেবল অর্থকরী বিদ্যা তাহাদের নাই বলিয়া কদাপি তাঁহাদের প্রাপ্য অন্নমুষ্টি হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করা উচিত নহে। নানাপ্রকার বিরুদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া পল্লীর এই সব বন্ধুর দল অন্তর্হিত হইতে চলিয়াছে। অনেক স্থানে এখন নিমন্ত্রণে পরিবেশনের লোক জোটে না, বরযাত্রী যাইবার লোক মিলে না, গ্রামের শবদাহ করিবার লোকের পর্য্যন্ত অভাব বোধ করিতে হয়।

যদি বাস্তবিকই এমন কোন সাংসারিক কারণ ঘটে, যাহার জন্য ভিন্ন না হইয়া উপায় নাই, তবে অতিশয় সহৃদয়তা, সদ্বিবেচনা ও সহিষ্ণুতার সহিত তাহা হওয়া কর্ত্তব্য। জেদ, ক্রোধ, প্রতিহিংসা বা কেবলমাত্র আত্মস্বার্থপরায়ণ হইয়া স্বজনবিচ্ছেদ ঘটান কর্ত্তব্য নহে। স্ত্রীর অন্যায়

প্ররোচনায়, ঘরভেদী অপর লোকের কানকথায় বা অপরের অযাচিত সহানুভূতি ও উপদেশে নিতান্ত ঘনিষ্ঠদের প্রতি অবিচার করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। অনেক স্থানেই এমন ক্রূর প্রকৃতির ও পরশ্রীকাতর দুই চারিজন লোক থাকে, যাহাদের কাজই অপরের সুখের ঘরে আগুন দেওয়া, সৎকর্ম্মে বিঘ্ন জন্মান, এবং গায়ে পড়িয়া শুভানুধ্যায়ী সাজিয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলে দূরে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখা। তাহাদের কোন কথা আপাতঃ মধুর ও অত্যন্ত রুচিকর হইলেও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। তাহারা পর, অপরের ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের টান তাহারা উপলব্ধি করিবে কিরূপে? নিজে অতিশয় চিন্তা ও সদ্বিবেচনা করিয়া যদি সংসারে পৃথক হওয়াই স্থিরীকৃত হয়, তবে পরিবারের সকলের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া নিজেদের মধ্যে আপোষে পৃথক হওয়াই ভাল।

অনেক সময় দেখা যায় পরম স্নেহময় ভাই পৃথক হইয়া পরম শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, এমন কি পরস্পরের মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যায়। সংসারে অতিশয় মনোমালিন্য, স্বার্থপরতা ও বাদবিসম্বাদের পর পৃথক হওয়ার ইহাই পরিণাম। পৃথগন্নে বাস করিয়া অনেক স্থলে এক ভ্রাতা অপর ভ্রাতাকে লোক সমাজে হেয় ও অপদস্থ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। ইহাতে যে প্রকারান্তরে নিজেকে ও নিজের পিতৃবংশকে অপমানিত করা হয়, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া তখন আর তাহা খেয়াল থাকে না। এরূপ ক্ষেত্রে গৃহিণীরা স্বামীদের ভুল ধরাইয়া দিলে সংশোধন হইবার সম্ভাবনা।

আত্মদ্রোহিতা, স্বজনদ্রোহিতা ও স্বার্থপরতার ভয়াবহ পরিণাম কুরুক্ষেত্র মহাসমর। দুর্য্যোধন যদি দাম্ভিক, গর্ব্বী, স্বজনদ্রোহী না হইয়া

সহৃদয়, স্বজনবৎসল ও পরার্থপর হইতেন, বোধ হয় তিনি আজীবন একচ্ছত্র রাজত্ব ভোগ করিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহার মত প্রবল পরাক্রান্ত রাজাকেও স্বজনদ্রোহিতা, স্বার্থপরতা ও দম্ভের ফলে মহাবীর পরাক্রান্ত শত ভ্রাতা সহ অকালে জীবনলীলা সাঙ্গ করিয়া চলিয়া যাইতে হইল। তাঁহার সেই পাপ পক্ষ অবলম্বন করিয়া আরও কত শত পরাক্রান্ত নৃপতি, অগণিত সৈন্য, সেনাপতি, প্রজা ক্ষয় হইয়া গেল। পক্ষান্তরে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া আত্মধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন বলিয়া ভগবান স্বয়ং তাঁহাদিগকে রক্ষা করিলেন।

স্বাত্মদ্রোহিতার পরিণাম।

আমরা ইহা হইতে অনায়াসে এই ধারণায় উপনীত হইতে পারি যে, যে সংসারে পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নী, স্ত্রীপুত্র, আত্মপরিজন এক মধুর প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া সকলে সকলের প্রতি যথোচিত কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া ন্যায়, সত্য ও ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতে পারেন, শত দুঃখ, বাধা, বিপদজালে জড়িত হইলেও ভগবান যে ভাবেই হৌক্ তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবেন। আর তাহার বিপরীত পথগামী স্বার্থপর, স্বজনদ্রোহী, আত্মসুখরত, অধার্ম্মিক পরিবার অসামান্য ধনৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেও সেই দর্পহারী বিধাতার এক গদাঘাতে ধরাশায়ী হইয়া মিলাইয়া যাইবে।

চরিত্ররক্ষা

অনেক পরিবারে চরিত্রহীন স্বামী ও ক্বচিৎ কোন পরিবারে চরিত্রহীনা স্ত্রী দেখা যায়। ইহারা বড় ভয়ঙ্কর। চরিত্র মানবমাত্রেরই এক অতি শ্রেষ্ঠ সম্পদ, নিষ্ঠা ও তপস্যা বিশেষ। জীবনে কায়মনোবাক্যে যিনি যত চরিত্রবান্, তিনি জীবনের ব্রত উদ্‌যাপনে ততদূর অগ্রসর। স্ত্রী পুরুষ সকলেরই এই সম্পদের অধিকারী হইবার সামর্থ্য ও প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে।

চরিত্রহীনা স্ত্রী।

চরিত্রহীনা স্ত্রী অতি ভয়ঙ্করী, সে না করিতে পারে এমন কোন পাপ বোধ করিবা মানবের কল্পনায়ও আসে না। আপন স্বামীকে বিষ পর্য্যন্ত দিতে ইহারা কুণ্ঠা বোধ করে না, এরূপ ঘটনা শুনা গিয়াছে।

আমাদের দেশের পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতির গুণে শৈশব হইতেই সকলে চরিত্ররক্ষা করিয়া চলিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠে।

অনেক স্থলে দেখা যায় স্ত্রী চরিত্রহীনা হইলে, বা তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহমাত্র হইলে স্ত্রী তাহার চরম দণ্ডে দণ্ডিতা হইয়া থাকেন। স্বামী চরিত্রহীন হইলে তাহা বিশেষ দোষের বলিয়া গণ্য হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী পুরুষের প্রলোভন, প্ররোচনা ও জবরদস্তিতে বিপথে চালিতা হইয়া শেষে আবার সেই পুরুষ কর্তৃকই নির্ম্মম ভাবে পরিত্যক্তা হইয়া তিলে তিলে দগ্ধ হইয়া পুড়িয়া মরেন। নারীই কেবল এই পতনের সমস্ত শাস্তি, সকল দুঃখ-বেদনার মর্ম্মান্তিক জ্বালা আজীবন বহিয়া বেড়ান,

পুরুষ পূর্ব্বের মতই উচ্চশিরে সংসারে বিচরণ করে। যে কারণেই হোক্ একই অপরাধে পুরুষ ও নারীর শাস্তির তারতম্য যখন অতি গুরুতর, তখন স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে স্বামীর মনে ভুলেও যাহাতে কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক না হইতে পারে সেজন্য স্ত্রী সর্ব্বদা অতিশয় সতর্ক থাকিবেন। স্বামী সন্দেহ বশতঃ কোন ব্যক্তি বিশেষের সহিত আলাপ করিতে ও কোন স্থান বিশেষে যাইতে স্ত্রীকে নিষেধ করিলে, স্ত্রী কদাপি তাহার বিরুদ্ধাচারণ করিবেন না। যাহার চরিত্র সম্বন্ধে স্ত্রীর নিজের, স্বামীর বা অপর কাহারও সন্দেহ আছে, স্ত্রী কদাচ তাহার সঙ্গে হাসি গল্প করিবেন না। কোন কথা বলিবার নিতান্ত প্রয়োজন বোধ করিলে সকলের সম্মুখে অতি সংক্ষেপে বলিবেন, কদাচ গোপনে কোনরূপ আলাপ করিবেন না। তাহার সঙ্গে কথা কহিবার সময় স্বামী বা অপর কেহ আসিয়া সে স্থানে উপস্থিত হইলে সহসা সে প্রসঙ্গ চাপা দিবার চেষ্টা করিবেন না, তাহাতে স্বামীর বা পরিবারের অপর কাহারও মনে স্ত্রীর সম্বন্ধে অমূলক সন্দেহ হইতে পারে। স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে স্বামীর মনে তিলমাত্র সন্দেহ একবার জন্মিলে জীবনে অকারণে বড়ই কষ্ট পাইতে হয়, এরূপ ঘটনা দেখা গিয়াছে। অনেক শিক্ষিত সন্দিগ্ধ স্বামীর হাতে পড়িয়া নিষ্ঠাবতী স্ত্রীকে অযথা কষ্ট পাইতে দেখা গিয়াছে। সন্দিগ্ধ স্বামী কারণে অকারণে স্ত্রীকে সন্দেহ করেন, এবং নানাভাবে তাঁহাকে নির্য্যাতন করিয়া থাকেন। সন্দেহের কারণ নিজে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান না করিয়া সন্দেহমূলক কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অজ্ঞতারই পরিচায়ক। এরূপ অবস্থায় স্ত্রী যথাসম্ভব স্বামীর পাশে থাকিয়া তাঁহার সেবা যত্ন করিবেন, তাঁহাকে

সন্দিগ্ধ স্বামী।

অতিশয় ভাল বাসিবেন, এবং নিজের কার্য্য দ্বারা তাঁহার প্রতি ভক্তি, ভালবাসা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবেন। সদা সর্ব্বদা ভগবানকে ডাকিবেন, এবং যখন স্বামীর মন ভাল থাকে, তখন সস্নেহে ও সবিনয়ে তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিবেন, এরূপ অমূলক সন্দেহ করিয়া তিনি কেবল নিজে মনঃকষ্ট পাইতেছেন, স্ত্রীর মনে নিদারুণ কষ্ট দিতেছেন, ও বাহিরের লোকের বিদ্রূপ ভাজন হইতেছেন।

যেখানে স্বামী-স্ত্রীর মিলন সত্যিকারের ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানে কদাপি কোন প্রকার অমঙ্গল, অশান্তি আসিতে পারে না, আসিলেও তাহা স্থিতি লাভ করিতে পারে না, দূর হইয়া যায়। প্রথম দেখার পর হইতেই পরস্পর পরস্পরকে বুঝিয়া আপনাদের সংযম নিষ্ঠা স্নেহপ্রীতির সহিত পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করা উভয়েরই একান্ত কর্ত্তব্য।

স্বামী চরিত্রহীন হইলে সে পরিবারের দুঃখদুর্দ্দশা ও স্ত্রীর দুর্গতির আদি অন্ত থাকে না। চরিত্রহীন স্বামীর ভাবিয়া দেখা উচিত, স্ত্রী তাহার মত চরিত্রহীনা হইলে স্বামী তাঁহাকে লইয়া ঘর করিতেন কি না। স্বামী নিজের চরিত্রকে কলুষিত করিবেন, আর নিরপরাধা স্ত্রী আপনার সকল প্রকার বঞ্চনাকে অন্তরে বহিয়া সেই স্বামীরই সংসারে দাসী বাঁদীর মত খাটিয়া মরিবেন, ইহা অমানুষিক ও অধর্ম্মোচিত।

চরিত্রহীন স্বামী।

স্বামী চরিত্রহীন হইলে প্রতিশোধ বা জেদের বশবর্ত্তী হইয়া কোন স্ত্রীরই আপন নিষ্ঠা ও তপস্যাকে ব্যর্থ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। মনের আগুন মনে চাপিয়া রাখিয়া ভগবানকে ডাকা ভিন্ন এ ক্ষেত্রে আর কোন উপায়ই নাই।

চরিত্রহীন স্বামীর চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, ভগবান সাক্ষী করিয়া যাঁহাকে সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, তিনি কি অপরিসীম স্নেহ ভালবাসায় বুকখানি ভরিয়া লইয়া স্বামীর প্রেমাকাঙ্ক্ষায় তৃষ্ণার্ত্ত হৃদয়ে তাহার পথপানে চাহিয়া থাকেন, আর তাঁহার ইহকালের দেবতা, নারীজীবনের সর্ব্বস্ব, মাতৃত্বের পুরোহিত কি অসীম অনাদর ও অবহেলায় তাঁহাকে ঠেলিয়া দিয়া তাঁহার জীবন, যৌবন, নারীত্ব, মাতৃত্বকে ব্যর্থ নিরর্থক করিয়া দেয়। স্বামীরই প্রয়োজন ও আহ্বানে যে নারীদেহমন উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হইয়া তাহার পদপ্রান্তে আসিয়াছিল, সেই স্বামীরই অনাদর, অবহেলা, উপেক্ষায় ব্যর্থ নিরাশার ভাটার টানে ক্ষয়ের কোন্ সীমাপ্রান্ত পথে সেই নিরপরাধা নারী ছুটিয়া চলিয়াছে। স্বামী যখন স্থানে অস্থানে পড়িয়া থাকে, তখন তাহারই অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী গৃহদেবী সুদীর্ঘদিনব্যাপী কঠোর শ্রমে শ্রান্ত দেহ লইয়া তাহারই প্রতীক্ষায় শ্রাবণের ধারা বিগলিত দুই নয়ন পথের পানে পাতিয়া চাহিয়া চাহিয়া দুঃখ বেদনা নিরাশার ভারে তন্দ্রায় ঢলিয়া পড়েন। যে গৃহপ্রতিমাকে স্বামী অনায়াসে বর্জ্জন করিয়া যাইতে পারে, স্বামীকে বর্জ্জন করিবার কল্পনাও তাঁহার মনে উদয় হয় না। স্বামীরই মঙ্গল কামনায় শত চিন্তা, শত ব্যস্ততা, শত আকুলতায়, তাঁহার সুদীর্ঘ দিনমান অতিবাহিত হয়, স্বামীরই চিন্তায় তাঁহার দৈনন্দিন আহার, নিদ্রা, বসন, ভূষণ তিক্ত বিষাক্ত হইয়া ওঠে, তাঁহার নারী জীবন এক ব্যর্থ নিরাশার হাহাকারে ডুবিয়া যায়।

চরিত্রহীন
স্বামীর কর্ত্তব্য।

চরিত্রহীন স্বামী সর্ব্বদা স্ত্রীর গুণের কথা চিন্তা করিবেন। তাঁহার দুঃখবেদনা, বঞ্চনা, ব্যর্থতার কথা নীরবে বিরলে বসিয়া ভাবিবেন। মন

চঞ্চল হইয়া উঠিলে স্ত্রীর কাছে কাছে থাকিবেন ও তাঁহার সঙ্গে নানারূপ গল্প করিবেন। যদি স্ত্রীর দুঃখ দেখিয়া মনে দুঃখ হয়, আর স্বামীর পাপের জন্য স্ত্রীকে সংসারে কত সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হইতেছে, অপরের নিকট অকারণে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, বিদ্রূপভাগিনী হইতে হইতেছে, কত মনঃকষ্টেই না চক্ষের জলে তাঁহার উদয়াস্ত অবসান হইয়া যাইতেছে, এই সব ভাবিয়া যদি মনে অনুশোচনা হয়, তবে অসঙ্কোচে স্ত্রীর হাত দুইখানি ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। তাহাতে লজ্জা বা দ্বিধার কিছু মাত্র নাই। ক্ষমা চাহিবামাত্র সেই নিরপরাধা, প্রেমময়ী নিশ্চয় ক্ষমা করিবেন এবং তাঁহার দুই চক্ষের পবিত্র জলধারায় স্বামীর অন্তরের সকল পাপ, সকল অনাচার, দুঃখ, গ্লানি ধুইয়া মুছিয়া যাইবে।

দরিদ্রের সংসার

স্বামী যদি দরিদ্র হ'ন, সে দারিদ্র্যকে হাসিমুখে বরণ করিয়া লওয়া ভিন্ন স্ত্রীর গত্যন্তর নাই। স্বামীর হাল চাল, ঘর দুয়ার, দরিদ্র হইলেও তুচ্ছবোধে তাহাকে কদাপি অবহেলা করিতে নাই। কেবল ধনৈশ্বর্য্যের মধ্যেই সংসারের প্রকৃত সুখ আছে, ইহা মনে করা ভ্রমাত্মক। অর্থের সঙ্গে মানুষের মনুষ্যত্বের বা সত্যিকারের সুখ-দুঃখের খুব গভীর সংযোগ আছে বলিয়া মনে হয় না। এ সংসারে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে

প্রতিপদে অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু প্রভূত অর্থের প্রয়োজন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ততটা হয় না, যতটা প্রয়োজন হয় চিত্ত সংযমের। অল্পে তুষ্ট ও সংযত হইয়া চলিলে অতি অল্প আয়েও সংসারে স্বচ্ছলতা ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া অনেক কল্পিত অভাব অভিযোগের হাত এড়াইয়া চলা যায়। অল্পের মধ্যে হাসিমুখে সকল দিক রক্ষা করিয়া চলিতে পারাই গৃহিণীর নিপুণতার পরিচায়ক। অভাবের জন্য দিবারাত্রি হা হুতাশ না করিয়া, যাহার যাহা আছে, তাহা দিয়াই কি ভাবে নিপুণতার সহিত নীরবে সংসার গুছাইয়া লওয়া যায়, তাহাই চিন্তা করিয়া দেখাই সুগৃহিণীর কর্ত্তব্য।

চিত্তসংযম।

হইলেনই বা স্বামী দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত, সেজন্য স্ত্রীর মনঃকষ্টের কারণ নাই। ইচ্ছা করিলেই লোক ধনী হইতে পারে না, ধনী হইতে না পারাও একটা পাপ বা অপরাধ নহে। স্বামী দরিদ্র হইলে সাধ্যাতীত কোন বস্তুর জন্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করা স্ত্রীর কর্ত্তব্য নহে। অনেক গৃহিণীর অতিরিক্ত খরচের স্বভাব অথবা অলঙ্কারপ্রিয়তা থাকে। কাহার কাহারও বা এ দুইটাই থাকে। স্বামী সেই খরচপত্রের উপযুক্ত অর্থ ও অলঙ্কারাদির সংস্থান করিতে না পারিলে, স্ত্রীর বড়ই মনঃকষ্ট হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কলহও হইয়া থাকে। স্বামী উদয়াস্ত কাল অমানুষিক শ্রম করিয়া হয়তো বৃহৎ পরিবারের অন্নবস্ত্র যোগাইতেছেন, স্ত্রী তাঁহার প্রতি ফিরিয়াও চাহেন না। নিজের পোষাক, পরিচ্ছদ, অলঙ্কারাদি আশানুরূপ না হইলে স্বামীকে ও নিজের মন্দভাগ্যকে অনুযোগ দিয়া পারিবারিক জীবনে অযথা অশান্তি ডাকিয়া আনেন।

গৃহিণীর অতিরিক্ত খরচের স্বভাব ও অলঙ্কারপ্রিয়তা।

অবস্থাপন্ন ঘরের বৌ-ঝিদের বস্ত্রালঙ্কারের উল্লেখ করিয়া আপন জীবন-ধারণই বৃথা মনে করেন। ইহা স্ত্রীর পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত, স্বামী তাঁহাকে কত ভালবাসেন, তাঁহাকে উপযুক্ত বস্ত্রালঙ্কার দেওয়া তো স্বামীর অনিচ্ছা নয়, তাহা দিতে না পারিয়া স্বামীর মনঃকষ্টও তো বড় কম হয় না, তাই লইয়া নিজের স্ত্রী যদি তাঁহার প্রতি অবিচার করেন, তবে তাঁহার দুঃখ রাখিবার ঠাঁই কোথায়? অধিকাংশ মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সংসারেই গৃহস্বামীকে গুরুশ্রম ও চিন্তাভারে ভারাক্রান্ত থাকিতে হয়। স্ত্রী যদি আবার নূতন নূতন বায়না লইয়া অবুঝের ন্যায় তাঁহাকে উত্যক্ত করেন, তবে তাঁহার বড়ই দুঃখ হয়। স্ত্রীকে কিছু দিতে না পারার দুঃখ যাহাতে স্বামীর মনে উদয় না হইতে পারে, তাহা করাই স্ত্রীর কর্ত্তব্য। যখন দুঃখ, দারিদ্র্য, চিন্তা, শ্রম ক্লিষ্ট স্বামী দিনান্তে অবসন্ন দেহে শয্যাশ্রয় করেন, তখন স্ত্রী তাঁহার সঙ্গে সংসার সম্বন্ধে সহানুভূতিপূর্ণ নানা কথা তুলিয়া তাঁহার দেহের শ্রান্তি ও মনের অবসাদ দূর করিতে চেষ্টা করিবেন। কি করিলে অল্প শ্রমে অধিক আয় হয়, দারিদ্র্যের মধ্যে থাকিয়াও কি করিলে স্বামীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে, কি করিলে সংসারের ব্যয় কিছু সঙ্কোচ করা চলে, এই সব নানা কথা আলোচনা করিবেন। ইহাতে তাঁহার দুশ্চিন্তায় ব্যাঘাত জন্মিবে, ও শ্রমের উৎসাহ বাড়িবে। স্ত্রীকে গহনাপত্র দিতে না পারার জন্য যদি তিনি কখনও দুঃখ প্রকাশ করেন, তবে স্ত্রী সস্নেহে ও সযত্নে প্রিয়তমের হাত দুইখানি নিজের গলদেশে জড়াইয়া বলিবেন, প্রিয়তম, এইতো আমার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার,

দরিদ্র স্বামীর স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

সোনা-দানা তো ইহার কাছে কত তুচ্ছ। তোমার ভালবাসা পাইয়াছি, নারী জীবনে সে-ইতো আমার পরম লাভ। যদি আমার গাভরা গহনা পাইতাম, আর তোমার ভালবাসায় বঞ্চিতা হইতাম, তবে এ জীবনে তো আমার দুঃখের অবধি থাকিত না। ওকথা কহিয়া আমার প্রাণে কষ্ট দিওনা লক্ষ্মীটী আমার। ইহা শুনিলে আনন্দে আবেগে তাঁহার চোখের কোণ বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িবে। উচ্ছ্বাসে তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া যাইবে। সংসার সংগ্রামের সকল ক্লান্তি, সর্ব্ব গ্লানি, সকল নিরাশা, দুঃখ-বেদনা তাঁহার হৃদয় হইতে দূর হইয়া যাইবে। স্ত্রীর প্রতি অপরিসীম স্নেহে তাঁহার সারা দেহমন প্লাবিত হইয়া অননুভূত, অপার্থিব বিমলানন্দে কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। স্ত্রীও সেই আনন্দের অংশ গ্রহণ করিয়া বুঝিতে পারিবেন, সোনা-দানাই বড়, না স্বামীর ভালবাসাই বড়। স্বামীর দুঃখ-দারিদ্র্যের অংশ গ্রহণ করিয়া নিরাভরণা হইয়া সংসারে থাকাই শ্রেয়ঃ, না তাঁহার মনে কষ্ট দিয়াও সোনা-দানার বোঝা বহিয়া বেড়ানই উচিত।

স্বামীর ভালবাসা ও সোনা-দানা।

একমাত্র স্বামী ভিন্ন স্ত্রীর এমন আপনার জন আর এ জগতে কে আছে? বিবাহের দূরত্বে পিতামাতার দায়িত্ব ও আকর্ষণ কমিয়া যায়, নিজেদের সন্তানাদি বড় হইয়া বিবাহ করিয়াই আপনাদের লইয়া বিব্রত হইয়া পড়েন। কিন্তু স্বামীর সুখে চিরকাল স্ত্রীর সুখ। স্বামীর দুঃখেই স্ত্রী চিরদুখিণী। স্বামীর জীবন মরণের সঙ্গে স্ত্রীর দৈহিক, মানসিক ও সকল প্রকার সুখশান্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্ত্রীর ভাগ্য, সুখদুঃখ, ভালমন্দ সকলই স্বামীর ভাগ্যের সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা।

স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র আপন জন।

স্বর্গ বলিয়া পৃথক কোন বস্তু বা স্থান আছে কিনা জানিনা, কিন্তু মনে হয়, যে সংসারে স্বামী-স্ত্রী সত্যাশ্রয়ী, ধর্ম্মানুগামী, সুখদুঃখে, সম্পদে, বিপদে একমন, একপ্রাণ হইয়া মনুষ্যোচিত কর্ম্ম সমাধান করিয়া জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করেন, সেই সংসারেই স্বর্গসুখ বিরাজ করে। স্বর্গ রচনা করা ও নরক সৃষ্টি করার শক্তি ভগবান আমাদিগকে দিয়াছেন। নরক সৃষ্টি করা আপাতঃ সুখকর ও সহজসাধ্য, তাই স্বর্গের ছবি আমরা মন হইতে নির্ব্বাসন দিয়া অন্যায়, অধর্ম্ম, অসত্য, স্বার্থপরতা, বিলাস, বাসনা প্রভৃতি দিয়া নরক রচনা করিয়া আপন স্ত্রী, পুত্রাদি লইয়া মহাসুখে কাল কাটাইতেছি।

সংসারে স্বর্গ।

না-ই থাকিল গাভরা অলঙ্কার, বাক্সভরা কাপড়, জামা, সেজন্য ক্ষোভ দুঃখের কিছুই নাই। আমাদেরই দেশের কত অগণিত বুভুক্ষু নরনারী তো অনাহারে, অর্দ্ধাহারে রহিয়াছে, তাহাদের পাশে বসিয়া যাঁহারা মোটা ভাত, মোটা কাপড় পাইতেছেন, নূতনতর আকাঙ্ক্ষার জন্য তাঁহাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। মানুষের গুণই তাহার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। সেই অলঙ্কারে যিনি আপনাকে বিভূষিত করিতে পারেন, বাহ্যিক সাজগোজ তাহার প্রয়োজন হয় না।

গুণই শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।

স্বামী সক্ষম হইলেও একান্নভুক্ত পরিবারে বাস করিয়া গোপনে বা পিত্রালয়ের নাম করিয়া গহনাপত্র তৈয়ারী-করান কর্ত্তব্য নহে। একই পরিবারের জাননদরা যতদিন বেশ ভূষায় সমকক্ষ না হন, বা নিজে সাহায্য করিয়া তাঁহাদিগকে সমকক্ষ করিতে না পারেন, ততদিন ঘরে বা বাহিরে কোন উৎসবাদিতে যাইতে নিজে নানা প্রকারে সাজিয়া নিরাভরণা জা-ননদদের সঙ্গে যাওয়া সুগৃহিণীর কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে তাঁহাদের

মনঃকষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কোন কারণেই কদাচ কাহারও মনঃকষ্টের কারণ হইতে নাই। পরিবারের যাঁহারা বেকার, রুগ্ন, আতুর, মুখাপেক্ষী, তাঁহাদের সকলের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করাই সুগৃহিণীর কর্ত্তব্য। কেবল নিজের খাওয়া-পরা, সাজগোজের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে নাই। সাধ্যমত সকলের অভাব অভিযোগের সমাধান করিয়া দিয়া পূজনীয় পূজনীয়াদের আশীর্ব্বাদ কুড়াইয়া ও ছোটদের ভক্তি আকর্ষণ করিয়া পরিবারের সকলের আশা ও আশ্রয়স্থলরূপে বিরাজ করাই সুগৃহিণীর লক্ষণ।

গৃহিণীই গৃহ।

গৃহের সর্ব্বপ্রকার সুখ, শান্তি, মঙ্গল একান্তভাবে গৃহিণীর উপর নির্ভর করে। এইজন্য গৃহিণীকেই গৃহ বলিয়া থাকে এবং গৃহিণীর অভাব হইলেই লোকে বলে, গৃহশূন্য হইয়াছে। গৃহের সমস্ত সুখশান্তি, মঙ্গলামঙ্গল যাঁহার উপর নির্ভর করে, তাঁহার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য যে কত গুরুতর, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি ইচ্ছা করিলে এক নিমেষে মুখের একটী কথায় বিষোদ্‌গারণ করিয়া প্রিয়তমের চিরসুখের নীড়কে জর্জ্জরিত করিয়া দিতে পারেন, আবার তিনিই ক্ষমা-দয়া-প্রেম-স্নেহময়ী হইয়া সমস্ত বিরুদ্ধতাকে বাধ্যতায় আনিয়া পরিবারের সর্ব্ব সুখশান্তির মূর্ত্তপ্রতীক আশ্রয় কল্পতরুরূপে বিরাজ করিতে পারেন।

পরিবারের বিপদে স্ত্রীর সহায়তা।

যদি স্বামী বা পরিবারের উপর কেহ কোন গুরুতর ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়েন, অর্থাভাবে সুচিকিৎসা চালাইবার উপায় না থাকে, তবে অম্লানবদনে ও নির্ব্বিচারে সে সময় আপন অলঙ্কারাদি দ্বারা সাহায্য করিয়া পরিবারকে বিপদ হইতে রক্ষা করা সুগৃহিণীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

নিজের গরীব পিতামাতা বা দরিদ্র স্বামী যদি কখনও স্বেচ্ছায় দুই একখানি অলঙ্কার দেন, তবে সন্তুষ্ট চিত্তে মহানন্দে হাত পাতিয়া তাহা তুলিয়া লইবেন। অতি অল্প মুল্যের সামান্য বস্তু হইলেও কখনও তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের মনে কষ্ট দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। গহনাপত্র যৎসামান্য যাহা কিছু থাকে, বিপদ, আপদ ও ভবিষ্যতের সম্বলজ্ঞানে অতি যত্নে তাহা ব্যবহার করা ও সযত্নে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। দৈবাৎ জীবনে বৈধব্যগ্রস্তা হইতে হইলে ইহা দ্বারা অনেক সাহায্য হইবার সম্ভাবনা।

গহনাপত্র ভবিষ্যতের সম্বল।

মৃত্যু যখন মানব জীবনে অনিবার্য্য সত্য, তখন স্বামীর অকাল মৃত্যু বা পূর্ব্ব মৃত্যুতে বিধবা স্ত্রী যাহাতে নিঃসম্বল হইয়া পথে না দাঁড়ান, এজন্য দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত স্বামীরও সময় থাকিতে তাহার কিছু না কিছু উপায় করা কর্ত্তব্য। অলঙ্কারাদি তাহার অন্যতম উপায়। পরিবারের সকলের অনাড়ম্বর ভরণ-পোষণ যোগাইয়া যৎসামান্য যাহা কিছু বাঁচে, তাহা দ্বারা সর্ব্ব প্রথম স্ত্রীর ভবিষ্যতের জন্য কিছু না কিছু সংস্থান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হাতে কিছু অর্থাদি থাকিলে লোকে তাঁহার দুর্দ্দিনে তাঁহাকে ততটা কৃপাপাত্রী মনে করিবে না, নিঃসম্বল হইয়া বিধবা হইলে যতটা মনে করিবে।

দরিদ্র স্বামীর স্ত্রীর জন্য সম্বল।

অনেক পরিবারে অসহায়া বিধবাকে আপন ভ্রাতা, ভাসুর বা দেবরের সংসারে দাসী বাঁদীর মত খাটিতে দেখিয়াছি। অপরের মন রক্ষার জন্য নিজের দেহ ও মনের উপর অমানুষিক অত্যাচার

করিতে দেখিয়াছি; কিন্তু সেই পরিবারের কাহাকেও তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, সহানুভূতি বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে খুব কমই দেখিয়াছি। অনেক স্থলে এরূপও দেখা গিয়াছে যে, বিবাহের অল্পদিন পরই স্বামী মারা গিয়াছেন, তখন পরিবারের অপর সকলে স্বামীর মৃত্যুর সকল দায়িত্ব অসহায়া বিধবা স্ত্রীর স্কন্ধে চাপাইয়া তাঁহার প্রতি অমানুষিক নির্য্যাতন করিয়াছেন। একেতো স্বামীর অকাল বিয়োগে স্ত্রী জীবন্মৃতার ন্যায় সংসারে বাঁচিয়া থাকেন, তাহার উপর পরিবারের নির্দ্দয় শ্বশুর, শ্বাশুড়ী বা জা-ননদদের তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ কিভাবে তাঁহাকে এফোঁড় ওফোঁড় করিয়া দেয়, তাহা যে কত বড় মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণাদায়ক, তাহা যাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে তিনি ভিন্ন অপরের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব।

অসহায়া বিধবা।

বিধবা বধূর উপর অযথা নির্যাতন।

বৈধব্য নারী জীবনের কোন অপরাধ নহে। স্বেচ্ছায় কেহ সে অপরাধ করেন না। কর্ম্মদোষে বিধাতা যাঁহার ললাটে এই নিদারুণ দুঃখ লিখিয়াছেন, তিনিই কেবল মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারেন, নারী জীবনের এই চরম দুঃখ ও বঞ্চনাকে আমরণ বহিয়া বেড়ান কত পীড়াদায়ক। নারীজীবনের সুখশান্তি, আনন্দ সকল আহরণ করিয়া লইয়া জীবনের চিরসঙ্গী যেদিন চলিয়া যান, সেদিন তিনিই কেবল বুঝিতে পারেন, সংসারে তাঁহার বাঁচিয়া থাকা, না থাকার মধ্যে পার্থক্য কতটুকু। আমরা কেহ বড় তাহা বুঝিয়া দেখিতে চেষ্টা করি না। নারী আমাদের দেশে অতিশয় সুলভ, তাই নারীর সম্মান ও নারীত্বকে আমরা বড় একটা গণনার

বৈধব্য কোন অপরাধ নহে।

মধ্যেই আনি না। তাঁহার সুখদুঃখ, ভালমন্দ, বাঁচিয়া থাকা, না থাকা, আমাদের চিন্তারও বহির্ভূত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীকে পুরুষের বিলাসের দাসীর ন্যায় বাঁচিয়া থাকিতে হয়। যৌবন ও সংসারের প্রয়োজনানুরোধে পুরুষ একবার বা একাধিকবার বিবাহ করিয়া থাকে, এবং সঙ্গত, অসঙ্গত সকল কাজে নারীকে লাগাইতে দ্বিধাবোধ করে না। আমরা কেহ বড় একটা ভাবিয়া দেখি না, নারীরও পুরুষের ন্যায় সুখদুঃখ, ভালমন্দ, হিতাহিত বোধ আছে, নিতান্ত নিরুপায় ও পরমুখাপেক্ষী হইয়া তাঁহাকে জীবন যাপন করিতে হয় বলিয়া তাঁহারা নীরবে সকল দুঃখ, বেদনা, অবিচার, অত্যাচার সহিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু লজ্জা, দুঃখ, অপমান, অবিচারে তাঁহাদের নারীত্বও লাঞ্ছিত ও ব্যথিত হয়।

নারী আমাদের দেশে সুলভ।

পরিবারের কেহ বিধবা হইয়া অসহায় অবস্থায় পতিতা হইলে অনেক স্থলেই তাঁহার অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া গৃহের যাবতীয় কার্য্যের ভার তাঁহার স্কন্ধে নির্ব্বিচারে চাপাইয়া দিয়া আমরা সচ্ছন্দ চিত্তে নিজের স্ত্রী, পুত্রাদি লইয়া অসঙ্কোচে আহার, বিহার, হাসি, গল্প, আমোদ, প্রমোদ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করি না। যে স্বামী নিজের স্ত্রীকে ভালবাসেন, যিনি স্বেচ্ছায় ভগবান সাক্ষী করিয়া তাঁহার জীবনব্যাপী সর্ব্বপ্রকার ভার বহনে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, পরিবারের অনাড়ম্বর ভরণপোষণের পর সর্ব্ব প্রথম সেই সতী স্ত্রীর জন্য কিছু না কিছু সঞ্চয় করা দরিদ্র স্বামীরও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। যাহাতে এইরূপ দুঃখের বেড়াজালে পরিয়া দুই মুষ্টি আতপ তণ্ডুল বা এক খণ্ড বস্ত্রের জন্য তাঁহাকে

অসহায়া বিধবার উপর জুলুম।

পরের মুখাপেক্ষী হইয়া দিবানিশি চক্ষের জলে ভাসিয়া বেড়াইতে না হয়।

জঠরের তাড়নায় ও শিশুপুত্রাদির ভরণপোষণের অভাবে কোন কোন বিধবাকে চরিত্রহীনা হইতে বা আত্মহত্যা করিতে দেখা গিয়াছে।

স্বামীর অভাবে অসহায়া বিধবার অবস্থা।

সংসারের সর্ব্বসুখের মূলাধার, প্রেমময়ী, অর্দ্ধাঙ্গভাগিণী স্বামীর অভাবে অপরের গলগ্রহ হইয়া কাঁদিয়া দিনাতিপাত করিবেন, দুই মুষ্টি অন্নের কাঙ্গালিনী হইয়া গৃহের অন্নপূর্ণা অপরের মুখ চাহিয়া থাকিবেন, হয়তো কত লোকে তাঁহাকে কত কটু কথা কহিবে, কত বিদ্রূপ করিবে, অভাগিণী পাইয়া ঘৃণ্য প্রলোভন দেখাইবে, অন্যায় অপবাদ দিবে, তাঁহার সেই মর্ম্মান্তিক দুঃখের দিনের কথা সময় থাকিতে দরিদ্র স্বামীরও ভাবিয়া দেখা একান্ত কর্ত্তব্য।

ভাঁড়ার ঘর

ছোট হোক্, বড় হোক্ সকল গৃহেই জিনিষপত্র সাজাইয়া গুছাইয়া রাখার জন্য পৃথক একখানি ভাঁড়ার ঘর থাকা উচিত। গৃহিণী এই ঘরে সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য বেশ করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া

রাখিবেন। গৃহের তৈজসপত্র, চাল-ডাল-ঘি-ময়দা-তেল-নুন যৎ সামান্য যাহা কিছু থাকে, অত্যন্ত যত্ন ও মমতার সহিত তাহা এই ঘরে সাজাইয়া রাখিলে কাজ-কর্ম্মের বেশ শৃঙ্খলা হয়। সকাল বেলায় প্রয়োজন মত দ্রব্যাদি ভাঁড়ার হইতে বাহির করিয়া আবাব রাত্রিতে তাহা মিলাইয়া, গুছাইয়া, সাজাইয়া তুলিয়া রাখিলে জিনিষপত্র নষ্ট হইবার বা খোয়া যাইবার সম্ভাবনা কম থাকে। ঘরের এক দিকে তাক করিয়া তৈজসপত্রাদি ও অপর দিকে তেল, নুন, মসলা, ঘি, ময়দা, আচার, চাট্নী, তরীতরকারী প্রভৃতি গুছাইয়া রাখিলে বেশ সুবিধা হয়। চাল-ডাল-ঘি-ময়দা প্রভৃতির পাত্র সর্ব্বদা উত্তমরূপে ঢাকিয়া রাখা উচিত। সমস্ত জিনিষের পাত্রই এমন ভাবে সাজাইয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে একটা খুঁজিতে দশটা হাঁড়ি নামাইতে বা নাড়াচাড়া করিতে না হয়। ভাঁড়ারের জিনিষপত্র মাঝে মাঝে রৌদ্রে আনার যে প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা অতীব উত্তম। প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্যই ভাঁড়ার হইতে একেবারে নিঃশেষ হইয়া না যায় এবং কোন দ্রব্য অতিরিক্ত খরচ হইয়া বা অসাবধানতায় পড়িয়া নষ্ট হইয়া না যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

ভাঁড়ারে জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখা।

অনেক গৃহের ভাঁড়ার ইঁদুর, আরশুলার গন্ধে এমন বিশ্রী হইয়া থাকে যে সেখানে প্রবেশ করিতেও ঘৃণা বোধ হয়। সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট অন্ধকার স্যাঁৎস্যাঁতে ঘর ভাঁড়ারের জন্য নির্দ্দিষ্ট করার ফলেও অনেক সময় ঐরূপ হয়। অনেক গৃহে বা চাল-ডাল-তেল-নুন মেজের উপর পড়িয়া কত নষ্ট হইতেছে, কতদিন হইতে মেজেতে পড়িয়া আছে, তাহার কোন খোঁজ খবরই কেহ রাখেনা। হয়তো ভুলে ঘৃতের পাত্রের মুখ ঢাকা

হয় নাই, একটা ইঁদুর তাহাতে পড়িয়া মরিয়া আছে, তেলের বোতলের মুখ খোলা পাইয়া কতকগুলা আরশুলা ঢুকিয়া তেলের উপর ভাসিতেছে, চাল-ডাল-ময়দার সঙ্গে হয়তো কত ইঁদুর, আরশুলার বিষ্ঠা মিশিয়া রহিয়াছে, তাহা কাহারও চোখেও পড়িতেছে না। গৃহের কর্ত্তা হয়তো দৈবাৎ একদিন তাহা দেখিয়া সাময়িক একটু চটাচটি করিলেন, ভাঁড়ারখানি দুই দিনের জন্য একটু পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হইল, আবার দুইদিন না যাইতেই পূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইল। ইহা গৃহিণীর অযোগ্যতারই পরিচায়ক। যে খাদ্য বস্তুর উপর পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যসুখ নির্ভর করে, ভাঁড়ারজাত সেই সমস্ত দ্রব্যের উপর অবহেলা অমার্জ্জনীয় ত্রুটী। সমস্ত জিনিসই উপযুক্ত পাত্রাদি দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া ঘরখানি সকালে সন্ধ্যায় দুইবার ঝাড় দিলেই বেশ হয়। খাদ্যের অভাবে ইঁদুর, আরশুলারও বংশ বৃদ্ধি হয় না, আর নানা প্রকার পোকামাকড়ের বিষ্ঠা খাইয়া স্বাস্থ্যও নষ্ট হয় না, স্বামীর মাথার ঘাম পায়ে ফেলা অর্থেরও অপচয় হয় না।

ভাঁড়ারে বিশৃঙ্খলা।

ভাঁড়ারের দায়িত্ব।

অনেক গৃহে স্বামীবেচারী যথেষ্ট জিনিষপত্র আনিয়া দিয়াও কোন দিন তৃপ্তির সহিত সময়মত দুই মুঠা আহার করিতে পারিতেছেন না। তেল, ঘি, তরীতরকারী পচিতেছে, নষ্ট হইতেছে, গৃহিণীর সেদিকে লক্ষ্যও নাই, শুধু ব্যবস্থার অভাবে সকলে যা-তা দিয়া আহার করিতেছে।

গৃহিণীর ব্যবস্থার অভাব।

প্রতিদিন সকাল বেলার কাজ শেষ হইলেই গৃহিণী ভাঁড়ারে ঢুকিবেন। তরীতরকারী সমস্ত পরীক্ষা করিয়া যাহা শীঘ্রই নষ্ট হইয়া

যাইবার সম্ভাবনা, তাহাই রান্নার জন্য বাহির করিবেন। তেল, মসলাদি যথা সময় বাহির করিয়া ভাঁড়ারে চাবি বন্ধ করিয়া রাখিবেন। যা'কে তা'কে ভাঁড়ারে ঢুকিতে বা হাত দিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে। দিনের বেলায় ভাঁড়ারের সকল জানালা খুলিয়া রাখাই উচিত।

বাহিরের আয় উপার্জ্জনাদি যেমন গৃহীর উপর একান্তভাবে নির্ভর করে, সে পথ বন্ধ হইলে যেমন সংসার অচল হইয়া ওঠে, গৃহিণীর উপরও তেমনই দুইটী গুরুতর কর্ত্তব্য ন্যস্ত, যাহার ব্যতিক্রমে সংসারযাত্রা অতিশয় বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া পড়ে। একটী শিশু পালন ও গঠন, অপরটী পরিবারের সকলের আহারাদির সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া সকলের স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষায় সহায়তা করা। এই দুইটীর দায়িত্ব যে কত বড় তাহা লিখিয়া বুঝান কষ্ট। সেই খাদ্য প্রস্তুতের সমস্ত দ্রব্যই যখন ভাঁড়ারে মজুত থাকে এবং গৃহিণীই যখন ভাঁড়ারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, তখন ভাঁড়ার ছোট হোক্, বড় হোক্ কদাপি তাহাকে অবহেলা করিতে নাই, অতি যত্নের সহিত তাহার তত্ত্বাবধান করিতে হয়। রাত্রি দুপ্রহরে একটু সাগুবার্লির প্রয়োজন হইলে যদি তখনই পয়সা লইয়া বাজারে ছুটিতে হয়, আবার অতিরিক্ত সঞ্চয় প্রিয়তার জন্য যদি ভাঁড়ারে যথেষ্ট জিনিষ থাকিতেও তাহা কাহারও ভোগে না লাগে, তবে গৃহিণীর ব্যবস্থাই তাহার জন্য একান্তভাবে দায়ী। গৃহে দুইজন অতিথি আসিলে দু'খানা লুচি, একটু তরকারী, একটু হালুয়া করিবার ব্যবস্থা যদি গৃহে

গৃহিণীর কর্ত্তব্য।

গৃহিণীর ব্যবস্থার ত্রুটী।

না থাকে, পয়সা লইয়া বাজার হইতে কতগুলি খাবার আনাইয়া তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিতে হয় এবং যে স্থানে খাবার মিলে না, সেঁ স্থানে অতিথির জলযোগের ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া গৃহের সকলকে যদি লজ্জিত হইতে হয়, তবে সে লজ্জা একান্তভাবে গৃহিণীরই প্রাপ্য। কেবলমাত্র ঠাকুর, চাকরের উপর নির্ভর করিয়া থাকার জন্য যদি বাড়ীর ছেলেদিগকে প্রায়ই না খাইয়া স্কুলে যাইতে হয় এবং টিফিনের সময় শুক্‌নো মুখে দু'টী ভাতের জন্য গৃহে ছুটিয়া আসিতে হয়, কাহারও কোন ট্রেণ ধরিতে হইলে যদি ব্যবস্থার অভাবে সে বাড়ী হইতে চারিটা ভাত খাইয়া যাইতে না পারে, তবে গৃহিণীই তাহার জন্য দায়ী।

স্বামী যেমন কলম পিষিয়া, গতর খাটাইয়া নানারূপ দুঃখ সহিয়া অর্থ আহরণ করিয়া আনিয়া দিবেন, স্ত্রীও যদি তেমনই অশেষ কষ্ট, গ্লানি বা লাঞ্ছনা অর্জ্জিত অর্থ দ্বারা গৃহের সুব্যবস্থা রক্ষা করিতে না পারিলেন, তবে বৃথাই তিনি গৃহিণী, মিথ্যা তাঁহার সংসারধর্ম্ম আচরণ, স্বামীর প্রতি ভালবাসা। স্বামী কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা যখন যে বস্তুটী ক্রয় করিয়া আনিয়া দিবেন, হোক্ না তাহা যতই ক্ষুদ্র, যতই অকিঞ্চিৎকর, স্ত্রী হাসিমুখে পরম সমাদরে দুই হাত পাতিয়া তাহা লইয়া সযত্নে তুলিয়া রাখিবেন, সস্নেহে তাহা রক্ষা করিবেন ও তাহার সদ্ব্যবহার করিবেন, তবেই না স্বামীর শত দুঃখেও শান্তির নিঃশ্বাস পড়িবে, শ্রমের উৎসাহ বাড়িবে, অল্প আয়েও সংসার শৃঙ্খলার সহিত চলিবে।

স্বামীর আয় যেরূপই হোক্ না কেন, তাহাতে অসন্তুষ্ট বা অধৈর্য্য না হইয়া তদ্দ্বারাই কি ভাবে সুশৃঙ্খলার সহিত সংসার চলিতে পারে,

অতিশয় চিন্তা ও বিবেচনা পূর্ব্বক সেই পন্থা নির্ণয় করাই গৃহিণীর কর্ত্তব্য।

স্বামীর আয় হইতে সঞ্চয়।

স্বামীর আয় হইতে অতি অকিঞ্চিৎকর হইলেও কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এমন সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করা উচিত নহে, যাহাতে পরিবারের সকলের অনাড়ম্বর ও সরল অন্নবস্ত্রে ব্যাঘাত জন্মে। যদি পরিবারের সকলের সাধারণ গ্রাসাচ্ছাদন যোগাড় করিতে উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থই ব্যয়িত হইয়া যায়, তবে আর সঞ্চয় করা সম্ভব নহে। সঞ্চয় অতি সামান্য হইলেও তাহা করা কর্ত্তব্য। মাসে মাসে দুই একটী টাকাও যদি সঞ্চিত হয় তাহাতেও দোষ নাই, ক্ষুদ্র বলিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিতে নাই। এই দুই একটী টাকা করিয়া আরম্ভ করা সঞ্চয়ই হয়তো একদিন বৃহৎ সঞ্চয়ে পরিণত হইতে পারে। তা ছাড়া ইহা দ্বারা আরও দুইটী বড় কাজ হয়, একটী ক্ষুদ্রকেও যত্ন করিতে শিক্ষা করা, অপরটী সঞ্চয়ের অভ্যাস রক্ষা করা।

সামান্য যৎকিঞ্চিৎ অর্থ যাহাই কেন সঞ্চিত হোক্ না, সুগৃহিণী চেষ্টা ও যত্ন করিলে তাঁহার ভাঁড়ারে আনীত চাল, ডাল, তেল, কিছু

ভাঁড়ারে সঞ্চয়।

কিছু বাঁচাইয়া সঞ্চয় করিতে পারেন। তদ্দারা নানা প্রকারে পরিবারকে অল্পবিস্তর সাহায্য করা চলে। প্রতিদিন পরিবারের যে চাউল লাগে, তাহা ঠিক ঠিক ভাবে ওজন করিয়া ভাঁড়ার হইতে বাহির করিবার সময় চাউলের পরিমাণ বুঝিয়া তাহা হইতে প্রতি বেলায় দুই তিন মুঠা চাউল অন্য একটা হাঁড়িতে জমা করা চলে। সাবধানে পরিবেশন করিলে তাহাতে ভাত কাহারও কম পড়ে না। মাসান্তে সাধারণ পরিবারে পাঁচ সাত

সের ও বৃহৎ পরিবারে তদপেক্ষা অনেক বেশী চাউল জমিয়া যায়। মাস শেষ হইয়া গেলে তাহা বিক্রয় করাইয়া গৃহিণী একটা পৃথক্ তহবিল করিতে পারেন, এবং দৈব দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া ঐ অর্থ ব্যয় হইয়া না গেলে অতি সামান্য ভাবে আরম্ভ করা এই সঞ্চয় দশ বৎসর পরে বৃহৎ সঞ্চয়ে পরিণত হইতে পারে। এইরূপ সঞ্চয়কে অতি সামান্য জ্ঞানে অনেকেই উপেক্ষা করেন এবং কতদিনে এই সঞ্চয় কোথায় আসিয়া দাঁড়াইবে, না দাঁড়াইবে, তাহা চিন্তা করিয়াই অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন। অতি সামান্য হইতেই বৃহতের উৎপত্তি, ইহা অতি বড় সত্য কথা। মরণ না হইলে সংসার ছাড়িয়া দিয়া যখন পলাইবার উপায় নাই, তখন দশ বৎসর পরে কি জমিবে, না জমিবে তাহা ভাবিয়া আগেই অসহিষ্ণু হইবার কোন সঙ্গত হেতু নাই। কাহার কত দশ বৎসর সংসার করিতে হইবে, অন্তর্য্যামী ভিন্ন তাহা কেহই বলিতে পারে না। আমাদের দেশে এমন অনেক পরিবার আছে, সামান্য দুইটী পয়সার অভাবও যাহাদিগকে সময়ে বোধ করিতে হয়। সঞ্চয় যে ভাবেই হৌক্ এবং যত ক্ষুদ্রই হৌক্ কিছুতেই অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে রান্নার তেল ভাঁড়ার হইতে বাহির করিবার সময় তাহা হইতে সামান্য কিছু তেল, দশ বিশ ফোঁটা হইলেও দোষ নাই, একটা পৃথক শিশি বা বোতলে প্রতিদিন জমাইলে, গৃহে কোন অতিথি অভ্যাগতের আগমনে দুই এক পদ বেশী রাঁধিতে হইলে দরিদ্র স্বামীকে বোতল লইয়া বাজারে ছুটিতে হয় না। এই সমস্ত ক্ষুদ্র বিষয়েও প্রত্যেক দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহিণীর নিষ্ঠা ও সহিষ্ণুতার সহিত অভ্যস্ত হওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন। স্বামী যখনই যাহা আনিয়া

দিবেন তাহাই খরচ করিয়া ফেলা ও দিবানিশি নাই নাই করা অলক্ষ্মীর চিহ্ন।

কেবলমাত্র উদরান্ন সংস্থানের জন্য আমাদিগকে দিবানিশি কত কষ্ট সহিতে হয়। সমস্ত পৃথিবীব্যাপী অর্থের পূজা, অর্থের জন্য লড়াই, বিবাদ, কলহ চলিতেছে। অর্থ যাহার নাই জীবনে সীমাহীন দুঃখ, দুশ্চিন্তার সঙ্গে তাঁহাকে যুঝিয়া চলিতে হয়। নিতান্ত ঘনিষ্ঠ অর্থবানের নিকটও অর্থহীন উপেক্ষিত হইয়া থাকে। অর্থ না থাকিলে আমাদের সংসারযাত্রা অচল হইয়া ওঠে। যাহা আয় করা যায়, তাহা হইতেই কিছু না কিছু সঞ্চয় করিতে পারিলে খুব ভাল হয়। যাঁহারা বেশ সচ্ছল, আয়ের সিকিভাগ সঞ্চয় করাই বোধকরি তাঁহাদের উচিত।

সাধারণ সঞ্চয়।

অবশিষ্ট বার আনার আট আনা দ্বারা সংসারের ভরণ-পোষণ সমাধা করিয়া বাকি চারি আনা দান, পরোপকার ও অন্যান্য সৎকর্ম্মে ব্যয় করাই কর্ত্তব্য। প্রয়োজন হইলে সঞ্চয় ও সংসারের ব্যয় আরও সঙ্কোচ করিয়া দানেব মাত্রা বাড়ানই বোধ হয় মানুষের কাজ।

অর্থ সংসারে যতই অপরিহার্য্য ও অত্যাবশ্যকীয় হোক্ না কেন, মনুষ্যত্ব হইতে তাহা কোন প্রকারেই উচ্চস্থান পাইতে পারে না। অর্থ

অর্থ অপেক্ষা মনুষ্যত্ব বড়।

মানুষকে সাময়িক কিছু সুখ-সুবিধা দেয় মাত্র। অর্থ দ্বারা অন্ন, বস্ত্র, চাল, ডাল, বস্ত্রালঙ্কার, প্রতিপত্তি হইতে পারে, নানা প্রকার আশা আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সাধন কতক পরিমাণে হইতে পারে কিন্তু অর্থ মনুষ্যত্ব দিতে পারে না। ক্ষেত্র বিশেষে মনুষ্যত্ব অর্জ্জনে বাধা স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, কাজেই অর্থ

আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় হইলেও জীবনের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে।

আমরা আমাদের সকল প্রকার সংযম বিসর্জ্জন দিয়া আপন আপন অভাব, অভিযোগ, বিলাস, বাসনা, আশা, আকাঙ্ক্ষাকে পর্ব্বত প্রমাণ করিয়া তুলিয়াছি। তাহাই মিটাইবার জন্য অর্থের আশায় পৃথিবীব্যাপী সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছি। এই অসংযমী উশৃঙ্খল আশা-আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় উদ্ভূত এই অন্ধ সংগ্রামের পরিণাম কোথায় যাইয়া লয় প্রাপ্ত হইবে, তাহা অন্তর্য্যামী ভিন্ন আর কে বলিবে?

আমরা আপন আপন সুখ, সুবিধা ও স্ত্রীপুত্রাদির ভবিষ্যতের অর্থ সংস্থানের কথা চিন্তা করিয়া অস্থির হইয়া পড়ি। অর্থ উপার্জ্জন ও তাহা সঞ্চয়ের জন্য কত প্রকার ফন্দি ফিকির করিয়া মাথা ঘামাইয়া মরি। কেবল নিজের স্ত্রীপুত্রাদি যাহাতে নিজের আয় ও সঞ্চয়ের ষোল আনা ভোগ করিতে পারে, আইনের মার প্যাঁচে অতি নির্ম্মম ভাবে ঘনিষ্ঠদের বঞ্চিত করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিয়া যাই। আমরা এমনই নির্ব্বোধ যে যাহা জীবনে ও জীবনান্তে একান্তভাবে আমাদেরই সম্বল হইত, এমন কিছু সঞ্চয় করিবার চেষ্টা আমরা করিনা, প্রয়োজনও বোধ করিনা। যাহার একটী কপর্দ্দক মাত্রও সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিব না, তাহাই অর্জ্জন করিতে কতই না পাপ, অন্যায়, পীড়নের আশ্রয় লই, তাহাই রক্ষা করিতে কতই না চিন্তা, উদ্বেগ, আশঙ্কা, তাহাই সদ্ব্যয় করিতে কতই না কষ্ট, কতই না কুণ্ঠা, কতই না বিবেচনা! যাহা জন্ম হইতে জন্মান্তরে আমাদের সঞ্চয় হইত, যাহা ক্রমশঃ আমাদিগকে এই জন্মমৃত্যুযন্ত্রণার

জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চয়।

হাত হইতে রক্ষা করিয়া নিশ্চিত শান্তির সন্ধানে লইয়া যাইত, যাহা আমাদিগকে সত্য নিত্য আনন্দের সকাশে যাইতে সাহায্য করিত, তাহা সঞ্চয়ের কথা আমাদের মনেও পড়ে না।

অভাব অভিযোগ ও ভোগবিলাস

নিজেদের অভাব, অভিযোগকে কদাপি বাড়াইতে নাই, ও বড় করিয়া দেখিতে নাই। এ সংসারে ধনী, দরিদ্র সকলেই অভাবগ্রস্ত। গরীবের যেখানে অন্নবস্ত্রের অভাব, ধনীর হয়তো সেখানে কোন বিলাস দ্রব্যের অভাব। অভাবের জন্য সর্ব্বদা অসহিষ্ণু হইয়া তাহাকে অন্তরে লালন করিলে তাহা ক্রমশঃ বাড়িতেই থাকে। অল্পে তুষ্টি দ্বারা অভাবকে শৃঙ্খলিত, সংযত ও জীবনে সুসহ করিয়া লওয়া চলে। আপন অভাব অভিযোগের কথা মনে উঠিলেই দরিদ্রতর সংসারের অবস্থা চিন্তা করিলে আর নিজের অভাবের জন্য কষ্ট হয় না। আমাদের অপেক্ষা আরও দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির বা পরিবারের অভাব আমাদের দেশে নাই। নিবারণের পক্ষেও অপর্য্যাপ্ত শতছিন্নবস্ত্রপরিহিত, অর্দ্ধাহার, অনাহারক্লিষ্ট শত শত লোক নিত্য নিরন্তর আমাদের চক্ষে পড়িতেছে। কাহারও বা ঝড়বৃষ্টি, কুজ্ঝটিকা, বাদল, অন্ধকারে মাথা গুঁজিবার ঠাঁইটুকুও নাই। পল্লীতে গাছতলা, সহরে পায়েচলা

অল্পে তুষ্টি।

অতি দরিদ্রের অবস্থা।

পথ, ধর্ম্মশালা, অতিথিশালা এমনই একটা কিছু তাহাদের আশ্রয় স্থল। মরণের দিনটিতে তাহারা এমনই ভাবেই কোথায় কোন্ অজানা স্থানে লোক চক্ষুর অন্তরালে জীবনের সকল কামনা, বাসনা অপূর্ণ রাখিয়া দুঃখের জীবনের শেষ করিয়া দিয়া যায়। একমুষ্টি ভিক্ষা পাইলেই ইহারা তুষ্ট, একটি পয়সা বা একখানা ছেঁড়া কাপড় কেহ যাচিয়া দিলে ইহাদের চক্ষু আর্দ্র হইয়া ওঠে। না জানি কোন্ অপরাধে সংসারে আসিয়া বিধাতার এতবড় দণ্ড, জীবনের এত বড় বঞ্চনা, রিক্ততা ইহারা বহিয়া বেড়ায়। তাহারাও মানুষ, মানুষের মত সুখ, দুঃখ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভাল, মন্দ, আশা, আকাঙ্ক্ষা সকলই ইহাদের আছে, কিন্তু তাহার কোন্টী ইহারা সফল করিতে পারিতেছে? তাহাদের সঙ্গে নিজেদের অবস্থা তুলনা করিলে আর অভাব, অভিযোগের কোন ক্ষোভই থাকে না।

জীবনের আদর্শের জন্য সংগ্রাম।

জীবনের আদর্শকে অতিশয় বড় করিয়া তাহার জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে। সুখ-সুবিধা-বিলাস-ব্যসনের আশা, আকাঙ্ক্ষাকে আপনার মধ্যে চূর্ণ করিয়া রাখিতে হইবে। আপনার অভাবকে বড় করিয়া লইয়া ভোগ-তৃষ্ণার তাড়নায় দিবা-নিশি হা হুতাশ করিয়া মরিলে জীবনের কোন প্রকার উচ্চতর গতি লাভ করিবার, কোন বড় আদর্শকে আয়ত্তে আনিবার সম্ভাবনাই থাকে না। অভাব, অভিযোগ কাহারও কোন দিন মিটে না, ভোগ-বিলাসের তৃপ্তিও হইতে চাহে না। মানব জীবন লাভ করিয়া কেবলমাত্র নিজেদের অভাব, অভিযোগের জন্য জীবনপাত না করিয়া, জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শকে বাছিয়া লইয়া তাহার জন্য জীবনপাত করাই মানুষের কাজ।

একবার ভোগবিলাসের নেশা জন্মিলে, তাহা ত্যাগ করা বড়ই কষ্টকর হইয়া পড়ে। ভোগবিলাসের সীমা এ পর্য্যন্ত জগতের কেহ নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারে নাই। বিলাসের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অজ্ঞাতে অহঙ্কার, অভিমান প্রভৃতি আসিয়া জুটিয়া মানুষকে অতি দ্রুতগতিতে বিপথে চালিত করে।

ভোগবিলাসের নেশা।

সাধ্যায়ত্ত হইলে কোন পূজা, পার্ব্বণ বা উৎসবাদিতে শুদ্ধ রেশমী বস্ত্রাদি ব্যবহার করা মন্দ নহে কিন্তু সর্ব্বদা অতিশয় মূল্যবান্ বস্ত্রাদি ব্যবহার করা এবং অপরের দেখাদেখি তাহার মাত্রা ক্রমশঃই বাড়াইয়া চলা অপব্যয়ের নামান্তর মাত্র। সে অর্থদ্বারা প্রতিবেশী, গ্রামবাসী, সমাজ, স্বদেশের অনেক মর্ম্মান্তিক প্রয়োজনে সাহায্য হইতে পারে। স্বামী নিজে নানা ফ্যাসানের জামা জুতা, চশমা, ঘড়ি, গাড়ী ব্যবহার করিতেছেন, স্ত্রী হয়তো অলঙ্কারের ভারে নড়িতে পারেন না, প্রয়োজনাতিরিক্ত আসবাব পত্র লোকজন রাখিয়া জাঁক প্রকাশ করা হইতেছে, আর প্রতিবেশী, গ্রামবাসী বা দেশবাসী কত লোক অনাহারে, অর্দ্ধাহারে, এক বস্ত্রে রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কত প্রার্থী, মুখাপেক্ষী বিফল মনোরথে বিষণ্ণ মুখে ফিরিয়া যাইতেছে, কত ভিখারী অন্ধ, আতুর এক মুষ্টি ভিক্ষার জন্য দুয়ারে ভিড় জমাইয়া এক প্রহর চীৎকার করিয়া শেষে চাকর বা দারোয়ানের গলা ধাক্কা খাইয়া মলিন মুখে চলিয়া যাইতেছে। ইহারই জন্য জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধির, অধিকারী করিয়া ভগবান মানুষকে সংসারে পাঠান নাই। দৈবাৎ কিছু অর্থের অধিকারী হইয়া বিলাস, ব্যসনে মত্ত থাকিয়া কাহাকে অবহেলা করা হইল তাহা ভাবিয়া দেখা

বিলাস অপব্যয় মাত্র।

বিলাসীর অন্ধতা।

উচিত। অহঙ্কার, বিলাস, ব্যসনের ব্যবধানে অন্তরের ঠাকুরকে কতদূরে ঠেলিয়া দেওয়া হইল তাহা চিন্তা করিয়া উপলব্ধি করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

সর্ব্বজীবে ভগবান বিরাজিত।

সর্ব্বজীবে সর্ব্বাবস্থায় তিনিই বিদ্যমান। তিনিই পরীক্ষা করিবার জন্য ঐশ্বর্য্য দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়া দীন-দুঃখী ভিখারীর রূপে দ্বার হইতে দ্বারান্তরে ফিরিতেছেন। তিনিই কাঙ্গালের বেশে আসিয়া অনাদর, অবহেলা, উপেক্ষায় ফিরিয়া গেলেন। তিনিই অগণিত, উপেক্ষিত, অনাদৃত দীন দরিদ্র ব্যাধিগ্রস্ত মুমূর্ষুর বুকে বসিয়া তাহাদের সমস্ত ব্যথা, সকল যন্ত্রণার জ্বালা আপন বুকখানি দিয়া সহিতেছেন। নিপীড়িত, ক্ষুধার্ত্ত, রোগক্লিষ্ট

ভগবানকে অবহেলা।

ব্যথিত মানবাত্মাকে অবহেলা করিয়া তাঁহাকেই অবহেলা করা হইল। ক্ষুধাপীড়িতের পাশে বসিয়া স্বর্ণথালায় অন্ন পরিবেশন করিয়া স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া আহার করার মধ্যে নিজের আভিজাত্য বা লোকমান্য যতই প্রকাশ হউক, মনুষ্যত্ব সেখানে ধীকৃত, জীবনের আদর্শ সেখানে পদদলিত।

পুরুষও নারীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

যিনি পুরুষ, পুরুষোচিত বল, বীর্য্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া প্রভৃতি ভগবানের আশীর্ব্বাদরূপে তিনি পাইয়া থাকেন, কদাচ কোন কারণেই তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আপন জীবনকে বিপথে চালিত করা তাঁহার উচিত নহে। যিনি নারী, বিশ্বজননী মহামায়া জগদ্ধাত্রীর অংশে তাঁহার জন্ম, স্নেহ-মায়া-মমতা তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কোন প্রকারেই সে ধর্ম্মকে বাদ দিয়া তাঁহার চলা কর্ত্তব্য নহে। যে সংসারে পুরুষ নির্দ্দয়, বিলাসী, আত্মাভিমানী, অহঙ্কারী, অপরের দুঃখে, কষ্টে, বিপদে, আপদে অন্ধ বধির,

আর দীন, দুঃখী, ভিখারী, কাঙালের করুণ নিবেদন যে সংসারে নারীর প্রাণে করুণা জাগাইতে পারে না, অপরের দুঃখ-কষ্ট-ব্যাথার চোখের জল দেখিয়া যে সংসারের নারীর স্নেহহস্ত সেই জল মুছাইয়া দিতে উদ্যত হয় না, সে সংসার ধনৈশ্বর্য্য, লোকমান্য, বিলাস ব্যসনের যে স্তরেই অধিষ্ঠিত থাকুক না কেন, মানুষের প্রাণের ঠাকুর সেই পাষাণপুরী হইতে চির নির্ব্বাসিত। ভগবান ব্যথিত হইয়া সে পুরী ত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইয়া যান।

ব্যথিত ভগবান।

—:*:—

গৃহের অন্যান্য কথা

সংসারে অতি সামান্য বস্তুও অপচয় করিতে নাই। অপচয় করিলে অতি অল্প সময়ে রাজার ভাণ্ডারও উজাড় করিয়া দেওয়া যায়! যত্ন করিয়া রাখিলে এক টুকরা ছেঁড়া কাগজ, একখণ্ড ছেঁড়া ন্যাকড়াও সময়ে অনেক কাজে লাগে। অপচয়ের অভ্যাস অলক্ষ্মীর চিহ্ন। গৃহের কোন দ্রব্য যাহাতে লোকসান বা অপচয় না হয়, সেজন্য গৃহিণীর সর্ব্বদা সাবধান থাকা উচিত। সংসার স্বামী বা স্ত্রী কাহারও একার নহে, সংসার উভয়েরই। তাহার একটী দ্রব্যও নষ্ট হওয়া উভয়েরই তুল্য ক্ষতির কারণ। ধনীই হৌন্, আর দরিদ্রই

অপচয়।

হৌন্, সংসারের ছোট বড় প্রতিটী বস্তু অগাধ মমতার সহিত ব্যবহার করিলেই অপচয় কম হয়।

গৃহের প্রতিটী দ্রব্য অতি সাবধানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া বা করাইয়া যথাস্থানে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিলে সময়ে ও প্রয়োজন মত অল্প আয়াসেই তাহা পাওয়া যায়, গৃহের সৌন্দর্য্যও রক্ষা পায়। ক্ষুদ্র, বৃহৎ প্রতিটী দ্রব্য যথাস্থানে রাখিলে প্রয়োজনের সময় অকারণে তাহা খুঁজিয়া মরিতে হয় না।

গৃহের আসবাব পত্র।

গৃহের আসবাব পত্র, থালা, ঘটী, বাটী, আলো, লণ্ঠন প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যের একটা হিসাব থাকা কর্ত্তব্য। সম্ভব হইলে প্রতিদিনই একবার তাহাদের খোঁজ খবর লওয়া ভাল। গৃহের তৈজস পত্রাদিতে নাম লেখাইয়া লওয়া মন্দ ব্যবস্থা নহে, ইহাতে প্রতিবেশীর তৈজষ পত্রের সহিত গোলমাল হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কোনটী হারাইয়া গেলে, না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহার অনুসন্ধান করা উচিত, ইহাতে গৃহের দাস, দাসীরাও জিনিষ পত্রের প্রতি যত্ন লইতে শিখিবে।

হিসাব রক্ষা।

স্বামীর সময়াভাব হইলে সংসার খরচের হিসাবপত্র সযত্নে রক্ষা করিয়া স্ত্রী স্বামীকে সংসার প্রতিপালনে সহায়তা করিবেন। খরচ পত্রের সঠিক হিসাব যথাসম্ভব নিজেদের হাতে লিখিয়া রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। যখন যে জমা বা খরচ হইবে, তখনই তাহা সযত্নে লিখিয়া রাখার প্রথা ও অভ্যাস ভাল। আলস্য করিয়া কদাচ তাহার অন্যথা করিতে নাই। আয় অল্প হইলেও তাহার একটা জমা খরচ রাখা উচিত। কোন মাসে যদি

কোন দ্রব্যের জন্য অতিরিক্ত খরচ হয়, তবে সে খরচের সন্তোষজনক কারণ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। খরচ অকারণে হইলে আর যাহাতে সেরূপ না হয়, সে বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে।

অনেকে ভাবেন নিজের টাকা নিজে খরচ করিব, তাহার আবার হিসাব কি রাখিব। ইহা অতিশয় ভ্রমাত্মক। খরচ নিজের টাকাই হোক্, আর পরের টাকাই হোক্, তাহার একটা বিস্তারিত হিসাব রাখিতেই হইবে। জীবনে শৃঙ্খলা রক্ষার ইহা অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়।

ধোপার কাপড়ের একটা হিসাব রাখা উচিত। অনেক গৃহে ধোপার কাপড়ের হিসাব মুখে মুখে থাকে, ইহা অতিশয় অন্যায়। সুযোগ বুঝিয়া ধোপা প্রায়ই কাপড় গোলমাল করে। পরিবারের প্রত্যেকখানি কাপড় নূতন বা পুরাতন যে অবস্থায় ধোপাকে দেওয়া হয়, তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে এবং সময়মত তাহা বুঝিয়া লইয়া যা'র যা'র কাপড় তাহাকে দিয়া দিলেই ভাল হয়। কোন কাপড় জামা একটু ছিঁড়িলেই অমনই তাহা সযত্নে সেলাই করিয়া লইতে হইবে। আলস্য করিয়া বিলম্ব করিলে আর তাহা সেলাই করা হইবে না, শীঘ্রই তাহা অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িবে।

ছেঁড়া বা সেলাই করা বস্ত্রাদি ব্যবহারে লজ্জা বা নিন্দার কোনই কারণ নাই। বস্ত্রাদি ছেঁড়া হোক্ দোষ নাই, ময়লা, দুর্গন্ধযুক্ত ও নোংরা না হইলেই হয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত মনের প্রফুল্লতা ও স্বাস্থ্যের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে মন বেশ প্রফুল্ল থাকে। মনই দেহের রাজা, মন ভাল থাকিলে দেহও ভাল থাকিবার সম্ভব।

পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে মন ও স্বাস্থ্যের যোগ।

অতিরিক্ত মূল্যবান বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া নিজের জাঁক জমক প্রকাশ করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নয়, সাধ্যায়ত্ত হইলেও উচিত নয়, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা সকলেরই কর্ত্তব্য। ইচ্ছা থাকিলে সকলেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারে। ইহা সম্পূর্ণ ইচ্ছা ও অভ্যাসের উপর নির্ভর করে।

অনেকে দেহের অনিত্যতা ভাবিয়া ইহার যত্ন লইতে চান না, এবং সর্ব্বদা রুক্ষ মলিন বেশে থাকিয়া সেই অনিত্যতাকে আপনার দেহে ও মনে সজাগ রাখিতে চাহেন। এই দেহ যতই কেন অনিত্য হৌক্ না, যতদিন এই দেহে আমার থাকিবার অধিকার ভগবান দিয়াছেন, ততদিন ইহাকে যত্ন না করিয়া অনাদরে, অবহেলায়, অযত্নে ইহাকে জীর্ণ করিয়া ফেলাও তো অন্যায়। এই দেহে ভগবান বাস করেন, ইহা তাঁহারই লীলাভূমি। যত ক্ষুদ্রই কেন হৌক্ না তাঁহার অংশ এই দেহে আছে, অতএব ইহাকে কোনরূপেই মলিন করা কর্ত্তব্য নহে। আমাদের সকলের পিতা, সর্ব্বাপেক্ষা আপন জন, আমাদের সখা, আমাদের বন্ধু, এই দেহে যখন বিরাজ করেন তখন অন্তর বাহিরের সর্ব্ব প্রকার শুচিতা ও পবিত্রতা রক্ষা করাই তো আমাদের কর্ত্তব্য। তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে হইলে, অন্তরের শুচিতা যেমন অপরিহার্য্য, হৃদয় আসনখানি যেমন নির্ম্মল প্রেমভক্তি-মার্জ্জিত করিয়া বিছাইয়া রাখিতে হয়, দেহের বাহ্যিক শুচিতার প্রয়োজনও ঠিক তেমনই। দেহ ও মনের সংযোগ যে অতি ঘনিষ্ঠ। কাজেই এ দেহের বাহ্যিক শুচিতা, পবিত্রতা, প্রফুল্লতা সজীব

অনিত্যতা বোধে দেহের অযত্ন।

দেহ ভগবানের লীলাভূমি।

রাখিবার জন্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা অপরিহার্য্য। আমাদের কোন প্রিয়জনের আসিবার সময়ে, কোন উৎসব আনন্দে যাইতে, আমরা যেমন সকলের আগে বাহ্যিক সাজগোজ করিয়া লই, তেমনই যাঁহারা এই দেহকে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমের মন্দির বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, অন্তরে অন্তরে তাঁহারই আগমনের চির উৎসব যিনি অনুভব করিতে পারিয়াছেন, দেহের অনিত্যতা বোধ তাঁহার পক্ষে যতই তীব্র হোক, অন্তর বাহির দুইয়ের শুচিতাই তাঁহার নিকট অপরিহার্য্য। বিলাসিতার প্রয়োজন না থাকিতে পারে কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন প্রত্যেক মানবের অবশ্যই আছে।

দেহ সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমের মন্দির।

অনেক গৃহিণীকে শুচিবায়ুগ্রস্তা দেখা যায়। ইহা একটী গুরুতর ব্যাধি। এই ব্যাধি যাঁহাকে আক্রমণ করে, তাঁহার পক্ষে গৃহের কোন কর্ম্মই সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। এই রোগ একবার আক্রমণ করিলে সহসা আর দূর হইতে চায় না। আমি এইরূপ শুচিবায়ু-গ্রস্তা গৃহিণী দেখিয়াছি। মাসের মধ্যে পনর বিশ দিন তাঁহারা একবেলা মাত্র ভাত খাইতেন, অন্যবেলা যা'তা' খাইয়া দিন কাটিত। স্নান করিতে ও ঘর মুছিতেই গৃহিণীর দিন চলিয়া যাইত। স্বামীবেচারী প্রায়ই অনাহারে আফিসে যাইতেন এবং আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিজের হাতে ভাতে ভাত রান্না করিয়া সপুত্রক আহার করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে সম্প্রীতি মোটেই ছিল না, দিনরাত্রি কেবল কলহ হইত।

শুচিবায়ু।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও শুচিবায়ুগ্রস্ততা দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু।

একটী অবশ্য পালনীয়, অপরটী সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। অশুচিতার সন্দেহ মাত্রেই অনেকে দিনের মধ্যে আট দশ বার স্নান করিয়া থাকেন, গৃহের চাকর, দাসী, স্বামী, পুত্রের সঙ্গে শুচিতা লইয়া সর্ব্বদা বচসা করেন এবং নিজের স্নানাহারের কোন বিধি নিষেধই ইঁহারা রক্ষা করিতে পারেন না। নিজের ও গৃহের প্রকৃত শুচিতা ইঁহারা রক্ষা করিতে পারেন না, কেবল কাল্পনিক সন্দেহ ও আশঙ্কার বশে দিবারাত্র উদ্বিগ্ন হইয়া ঘোরতর অশান্তিতে কাল কাটান। রোগ গুরুতর আকার ধারণ করিলে, সন্দেহের বশে যেখানে সেখানে কাকের বিষ্ঠা, মাছের আঁস ও নানারূপ উচ্ছিষ্টাদির কণিকা বাড়ীময় আবিষ্কার করিয়া বেড়ান ও তাহাই পরিষ্কার করিতে বা করাইতেই সময় অতিবাহিত হইয়া যায়।

কোন দুর্ভাগ্য স্বামীর ভাগ্যে দৈবাৎ এইরূপ শুচিবায়ুগ্রস্তা স্ত্রী জুটিলে ইহা লইয়া স্ত্রীর সঙ্গে সর্ব্বদা বচসা করা বা ইহা পরিত্যাগ করিবার জন্য জেদ করা কর্ত্তব্য নহে। স্বামী নিজে শুচিতা ও পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিবেন। প্রকৃত শুচিতা কি এবং কি ভাবে তাহা প্রতিপালিত হইলে সর্ব্ববিষয়ে মঙ্গলকর হয়, তাহা স্ত্রীকে বুঝাইয়া ক্রমশঃ কৌশলের সহিত এই রোগমুক্ত করিবার চেষ্টা করিবেন।

বাক্‌সংযমী হওয়া স্বাস্থ্য রক্ষা, সত্য রক্ষা ও সকলের প্রতি সমদৃষ্টি রক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়। অতিরিক্ত কথা বলা ও অকারণে কথা বলা অনেকের অভ্যাস ও প্রকৃতিগত। যে অতিরিক্ত কথা বলে, সে অনেক মিথ্যা কথা বলে। রসনার উপর সংযমহীন হইয়া পড়িলে অনেক কটু, মিথ্যা ও তীক্ষ্ণ কথা অজ্ঞাতেও মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসে। অনেক সময়ে অনেকে বাহাদুরী

বাক্‌সংযম।

লইবার জন্য অথবা অপরের শ্রুতিমধুর ও মনোরঞ্জক করিবার জন্য একটী ছোট কথাকেও নানারূপে সাজাইয়া বলে। তাহারা ইহা ভাবিয়াও দেখেনা যে, একটী সত্যের সঙ্গে কতকগুলি মিথ্যা কহিয়া পাপ অর্জ্জন করিতে হইতেছে। লোকে কথায় বলে, বোবার শত্রু নাই, ইহা যে কত বড় সত্য তাহা একটু চিন্তা করিলেই বেশ বুঝা যায়। যে যত কম কথা বলে তাহাকে তত কম মিথ্যা ও রূঢ় কথা বলিতে হয়। কথার উপর যাঁহার সংযম আছে, তাঁহার কথায় কেহই কোনদিন রুষ্ট হয় না, কাজেই সংসারে কাহারও সঙ্গে তাঁহার অসদ্ভাবও বড় হয় না।

বোবার শত্রু নাই।

অনেক স্ত্রীলোকের এরূপ স্বভাব দেখা যায় যে, অপর কেহ একটা কথা কহিতে থাকিলে তিনি হাতের কাজ ফেলিয়া নিতান্ত অযাচিত ভাবে উড়িয়া আসিয়া তাহার মধ্যে কথা না বলিয়া পারেন না। অতিরিক্ত কথা কহেন বলিয়া বাঁকা কথা কহিয়া অপরকে খোঁটা দেওয়ার স্বভাবটা তাঁহাদের হইয়া পড়ে এবং প্রায়ই তাঁহাদের সঙ্গে গৃহের বা পাড়াপ্রতিবেশীর কাহারও সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়াই থাকে। ঝগড়া করা ক্রমশঃ অভ্যাসে পরিণত হইয়া তাহা এরূপ চরম সীমায় গিয়া পৌছায় যে, শেষে আর লোকনিন্দা, লাজলজ্জা, মান-সম্ভ্রমের প্রতি লক্ষ্যও থাকে না। অসংযত জিহ্বা অনর্গল অকথ্য, কুকথ্য বর্ষণ করিতে থাকে।

যাচিয়া কথা বলা।

অপ্রয়োজনে কদাপি অপরের কথায় কথা কহিতে নাই। অপরের প্রসঙ্গে অযাচিত ভাবে কখনও যোগ দিতে নাই এবং চিন্তা না করিয়া কোন গুরুতর প্রশ্নের উত্তর দিতে নাই। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা

করিলে বিনয় ও নম্রতা সহকারে সুমিষ্ট, সঙ্গত, সত্য ও সংক্ষিপ্ত কথায় তাহার জবাব দেওয়াই উচিত। নিজের জেদ বজায় রাখিবার জন্য, আধিপত্য দেখাইবার জন্য বা ক্রোধের বশে উচ্চকণ্ঠে রূঢ় ভাষায় কাহাকেও আক্রমণ করিতে নাই। বহুভাষী লোক মিথ্যাবাদী, রূঢ়ভাষী, পরের ছিদ্রান্বেষী ও কলহপ্রিয় হইয়া থাকে। পরিবারের গৃহী বা গৃহিণীর এইরূপ দোষ থাকিলে সে পরিবারে শান্তির আশা করা বৃথা।

বহুভাষী লোক।

অনেকে ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া পরিবারে নানারূপ অশান্তির কারণ ঘটাইয়া থাকেন। শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত একত্র বাস করিবার অভিলাষ থাকিলে ক্রোধ পরিহার করিয়া চলা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। ক্রোধ মহারিপুর ন্যায় অকস্মাৎ গর্জ্জিয়া উঠিয়া বহু কালের সাধনা, বহু কালের সুখশান্তিকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া যায়। ইহা ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইতে পারে কিন্তু অসাধ্য নহে। ক্রোধের সময় নীরবে কিছু কাল বসিয়া ভগবানের নাম করিলেই ক্রোধ জল হইয়া যায়।

ক্রোধ মহা রিপু।

কোন কারণেই উচ্চকণ্ঠে কথা বলা বা বচসা করা সুগৃহিণীর কর্ত্তব্য নহে। লজ্জা রমণীর ভূষণ, কোন প্রকারেই সে ভূষণহারা হইতে নাই। লজ্জাহীনা নারী সংসারে অতিশয় মুখরা, কলহপ্রিয়া ও কটূভাষিণী হইয়া থাকেন। নারীর বুক-ভরা স্নেহসুধা-ভাণ্ড লজ্জার আবরণের নীচে লুক্কায়িত আছে বলিয়াই তাহা এত মধুর, এত মনমুগ্ধকর ও হৃদয়গ্রাহী। সেইজন্যই পুরুষ তাঁহাকে লাভ করিতে এত ব্যস্ত, এত লালায়িত। লজ্জাহীনা নারী সংসারে বহু

লজ্জা রমণীর ভূষণ।

অন্যায় ও গর্হিত কর্ম্ম অনায়াসে করিয়া থাকেন। নারী শিক্ষায়, সভ্যতায় যতই কেন অগ্রসর হৌন্ না, আপনার নারীসুলভ লজ্জা-শীলতায় সেই শিক্ষা সভ্যতাকে উজ্জ্বল ও মধুর করিয়া রাখিতে পারিলে তাহা বড়ই চিত্তহারী হইয়া থাকে। নিজের লজ্জাকে সসম্ভ্রমে নিজের মধ্যে রাখা নারী মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

পানদোক্তা চর্ব্বন না বিষপান।

বর্ত্তমানে পান, দোক্তা চর্ব্বণ স্ত্রীলোকের মধ্যে একটা সংক্রামক ব্যাধির মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিশয় অহিতকর এবং অতি কদর্য্য অভ্যাস। অবিরত পানদোক্তা চিবাইলে মুখের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য মুক্তার ন্যায় দন্তপংক্তি কুশ্রী ধারণ করে, অতি শীঘ্র দাঁতের নানারূপ পীড়া জন্মিয়া পাকস্থলীর সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি হইতে সহায়তা করে, অসময়ে দাঁত পড়িয়া গিয়া অকাল বার্দ্ধক্য আসিয়া ঘিরিয়া ধরে। মাথা ঘোরা, হৃৎকম্প, চোখের পীড়া, অনিদ্রা, অগ্নিমান্দ্য আসিয়া দেখা দেয়। স্বেচ্ছায় যাঁহারা এমন অন্যায় নেশা অভ্যাস করিয়া আপন স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যকে বিকৃত করেন, তাঁহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ ও অজ্ঞ বৈ আর কিছুই নহেন। স্বামী, স্ত্রীর কাহারও এইরূপ কু অভ্যাস থাকিলে অপরের সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। দুর্ব্বল ও ভগ্ন স্বাস্থ্য ব্যক্তিকে কেবলমাত্র পানদোক্তা চর্ব্বণ ত্যাগ করাইয়া স্বাস্থ্যের আশ্চর্য্য উন্নতি আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

সুগৃহী গৃহিণীর আর একটা কথা সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য, কদাপি কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশা না করা। উপকার করিয়াই তাহার প্রত্যুপকার, বড়দের নিকট স্নেহ, ছোটদের কাছে ভক্তি, দানের

প্রতিদান, সৎকার্য্যে প্রশংসা কিছু প্রত্যাশা করিতে নাই। প্রত্যাশা করিয়া প্রত্যাশিত বস্তু না পাইলে বড়ই মনোভঙ্গের কারণ উপস্থিত হয়। যাহা কর্ত্তব্য, তাহা নীরবে আপন আপন কর্ত্তব্য হিসাবে করিয়া যাওয়াই ভাল, কোন কিছু প্রত্যাশা করিয়া নহে। সংসার ক্রমশঃই নীচতার কুটীল পথে চলিয়াছে, উপকারের প্রত্যুপকার তো দূরের কথা, উপকার স্বীকার পর্য্যন্ত এখানে কেহ করিতে চাহে না। যাহা মানবোচিত কর্ত্তব্য, তাহা আপন আপন ধর্ম্মজ্ঞানে ভগবানের নাম লইয়া নিতান্ত নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার চিত্তে সমাপন করিয়া যাওয়াই উচিত, কোন কিছু প্রত্যাশা করিয়া নহে।

প্রত্যাশা না করা।

নির্লিপ্ত কর্ত্তব্য।

গৃহের দাসদাসী

গৃহের একটী প্রধান অঙ্গ যেমন গৃহের দাসদাসী, সেই দাসদাসী নির্ব্বাচন তেমনই এক মহা সমস্যার বিষয়। কর্ম্মঠ, স্বল্পভাষী, সচ্চরিত্র, স্বাস্থ্যবান, বাধ্য দাসদাসী রাখিতে পারিলেই গৃহের পক্ষে মঙ্গল কিন্তু এরূপ দাসদাসী আজকাল মেলা কঠিন এবং কাহার কি গুণ আছে, না আছে তাহা পূর্ব্বে বুঝা এক প্রকার অসম্ভব। সাধারণতঃ স্বাস্থ্যাদি

লক্ষ্য করিয়া এবং সম্ভব হইলে তাহাদের আগেকার চাকুরীস্থলে খোঁজ খবর লইয়া দাসদাসী নিযুক্ত করাই ভাল। প্রথম কিছুদিন তাহাদের গতিবিধি হাবভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য না করিয়া ও তাহাদের বাড়ী-ঘরের সঠিক খবর না জানিয়া কোন কারণেই তাহাদের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস স্থাপন করিতে নাই।

দাসদাসীর প্রতি ব্যবহার।

দাসদাসীর প্রতি সদয় ও সহৃদয় ব্যবহার করিলে এবং তাহাদের সুখ-দুঃখ ও শ্রান্তি-ক্লান্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে, শান্ত ও মিষ্টভাবে তাহাদের হুকুম করিলে, তাহাদের আহারাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিলে নিশ্চয়ই তাহারা বশ হইয়া পড়ে। দাসদাসী নিযুক্ত করিয়াই সর্ব্বপ্রথম সস্নেহে তাহাদের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিতে হইবে। এমন কাজের ভার তাহাদের উপর ন্যস্ত করা উচিত, যাহা তাহাদের ন্যায় অল্পবুদ্ধি লোকের পক্ষে সম্পন্ন করা অসম্ভব নয় এবং সারাদিনে অক্লেশে তাহারা তাহা সম্পন্ন করিতে পারে। তাহারা অনুন্নত, দরিদ্র ও বেতনভোগী ভৃত্য বলিয়া তাহাদের দৈহিক শ্রান্তি-ক্লান্তির প্রতি লক্ষ্য না রাখা গর্হিত কর্ম্ম। এক কাজ শেষ না হইতেই অন্য কাজের হুকুম করা এবং এক কাজ অর্দ্ধেক করা হইলে অন্য কাজে লাগাইয়া দেওয়া উচিত নহে। শৃঙ্খলার সহিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে কাজ করিতে তাহাদিগকে শিখাইয়া লইতে হইবে। একদিনে ঠিক মত না পারে, দশ দিনে পারিবে, দশ দিনে না পারে এক মাসে শিখিবে। প্রথম প্রথমই এক আধটু ভুল-ত্রুটীর জন্য রুষ্ট হইয়া রূঢ় ব্যবহার করা ও অবিরত ভৃত্যাদি পরিবর্ত্তন করা অন্যায়। নিজেরা একটু ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে শিখাইয়া

পরাইয়া অনুগত করিয়া লইলে ও তাহাদের প্রতি সদয় শান্ত ব্যবহার করিলে তাহারা হয়তো চির জীবনের কেনা হইয়া যাইবে, পরিবারের হিতৈষী বন্ধুরূপে চিরজীবন অম্লান বদনে খাটিয়া যাইবে। দাসদাসী ভিন্ন যাঁহাদের চলিবার উপায় নাই, এই পন্থা অবলম্বন করাই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ পথ।

অনুগত ভৃত্য গৃহের বন্ধু।

অনেকে দাসদাসীকে সর্ব্বদা হুকুমের উপর রাখিতে চান। অবিরত তাহাদিগকে একাজ হইতে ওকাজে ছুটাইয়া মারেন, তাহাদের আহার, নিদ্রার সময়ও এতটুকু বিবেচনা করিয়া হুকুম করেন না। তাঁহারা ভাবেন, এখন আর সে সত্যযুগ নাই, দাসদাসী মাত্রেই কেবল ফাঁকি দিয়া চলিতে চায়, বেতন যখন দিতেই হইবে, তখন আঠার আনা কাজ আদায় করিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। সত্য বটে, আজ আমাদের দেশের সে সুখের দিন নাই, যখন ভৃত্য একজন বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে পরিবারভুক্ত হইয়া থাকিত। সত্য বটে, এখন লোকে কেবল ফাঁকি দিয়া রোজগার করিতে চায় কিন্তু সে অপরাধ কি কেবল দাসদাসীর বেলায়ই চোখে পড়িবে? আমরাই কি তেমন আছি? আমাদেরই কি ভৃত্যাদির প্রতি সেই স্নেহ, ক্ষমা, সহৃদয়তা আছে? আমরাই তো তাহাদিগকে নষ্ট করিয়াছি। যে গৃহে গৃহী ও গৃহিণীর এখনও ভৃত্যদের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার আছে, সে গৃহে ভৃত্যও আগেকার মতই আছে। যে গৃহে তাহা নাই, প্রভুভৃত্যের সঙ্গে যেখানে কেবল তাড়নার সম্বন্ধ, সে গৃহে ভৃত্যও ফাঁকিবাজ, চোর, অবিশ্বাসী। সেও কোন প্রকারে সময় কাটাইতে চায়, এবং সুযোগ পাইলেই অন্যত্র চলিয়া যায়। মানুষের প্রতি মানুষের মত ব্যবহার করিলে, যত বড় পাষাণই সে হোক্ না কেন, সে অবনত হইতে বাধ্য।

অনেক গৃহের শিশুরাও বয়স্ক ভৃত্যাদির নাম ধরিয়া ডাকে, সর্ব্বদা তাহাদিগকে নানাপ্রকারে হুকুম করে ও তাহাদের কাজের ক্রটী ধরিবার চেষ্টা করে। পেটের দায়ে তাহারা হয়তো সকলই সহিয়া যায় কিন্তু বড় কষ্টে, বড় দুঃখে পড়িয়া তাহারা পুত্র-কন্যাস্থানীয় শিশুদের মুখেও তুই তোকারী শুনিয়া পড়িয়া থাকে। ইহা গৃহী ও গৃহিণীর শিশুদিগকে কুশিক্ষা দিবার পরিণাম। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে মানুষের প্রতি যাহারা পশুর ব্যবহার, ক্রীতদাসের ব্যবহার করে তাহারা ঘোরতর পাপী। ভৃত্য দরিদ্র, নিরক্ষর ও অনুন্নত বলিয়া, স্কুল-কলেজের শিক্ষা তাহার নাই বলিয়া সে হিতাহিত, ভালমন্দ, মানাপমানবোধ বর্জ্জিত নহে। আফিসে সাহেবের মুখে তিরস্কার শুনিয়া, মাড়োয়ারীর মুখ ঝাঁকানি খাইয়া শিক্ষিত বাবুদের যেরূপ দুঃখ, ক্ষোভ ও অপমান হয়, গৃহীগৃহিণীর অবিরত মুখ ঝাঁকানি শুনিয়া, সারাদিনমান গতর খাটাইয়া, অপর্য্যাপ্ত ও কদর্য্য আহার্য্য পাইয়া, গৃহের শিশুদের মুখে পাকা পাকা কথা শুনিয়া ভৃত্যের তদপেক্ষাও বেশী দুঃখ ও আত্মগ্লানি হয়।

ভৃত্যাদির প্রতি শিশুদের দুর্ব্যবহার।

দাসদাসীর আপদে, বিপদে সাধ্যমত সাহায্য করা এবং অসুখ-বিসুখে স্বামী-স্ত্রী মিলিত হইয়া পিতামাতার ন্যায় তাহাদের সকল প্রকার সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়া উচিত। নিজেদের আত্মীয়স্বগন, ছোটবড় ভেদাভেদ তাহাদিগকে জানাইয়া দিতে হইবে। আত্মীয়স্বজন, অতিথি, অভ্যাগত, প্রার্থী, মুখাপেক্ষী যে যত দরিদ্রই হোক না কেন, ভৃত্য যেন তাঁহাদের কাহারও প্রতি অবহেলা বা দুর্ব্যবহার করিতে প্রয়াস না পায়। অনেক

বড়লোকের বাড়ীর চাকর দারোয়ান প্রভৃতিকে এই দোষে দুষ্ট দেখা যায়, ইহা গৃহস্বামীরই নীচতার পরিচায়ক।

নিজেদের দোষত্রুটী ঢাকিবার জন্য কদাপি ভৃত্যাদির সম্মুখে মিথ্যা কথা বলিতে নাই, তাহাতে মনিবের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা কমিয়া যাইবে।

গৃহের দাসদাসী যদি দৈবাৎ কোন অন্যায় করিয়া ফেলিয়া সত্য গোপন না করে, তবে কিছুতেই তাহাদিগকে সে কার্য্যের জন্য তিরস্কার করা উচিত নহে। সস্নেহে ক্ষমা করিয়া ভবিষ্যতের জন্য তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অকপটে সত্য কথা বলিয়া অপরাধ স্বীকার করার পরও যদি তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হয়, তবে ভবিষ্যতে আর তাহারা কদাপিও সত্য কথা কহিবে না। ভুল, ত্রুটী, অন্যায়, অপরাধ মানুষের পক্ষে অসম্ভব নহে, সামান্য ভুলত্রুটী হইলেই তাই লইয়া অবিরত বকাঝকা করা অন্যায়।

ভৃত্যাদির ভুলত্রুটী।

স্বামী-স্ত্রীতে কোন সময় কোন কারণে কলহাদি হইলে, তাহা লইয়া দাসদাসীর সম্মুখে জটলা করা বা তাহাদিগকে মধ্যস্থ মানা অতিশয় অন্যায়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন কারণেই কলহ বা বচসা হওয়া উচিত নহে। উভয়ে উভয়ের মতসহিষ্ণু, গুণগ্রাহী, প্রেমমুগ্ধ ও সদিচ্ছানুগামী হইয়া চলিলে কলহ না হওয়ারই সম্ভাবনা। দৈবাৎ কোন কারণে কলহ, বচসা বা মতদ্বৈধ হইলেও পরিবারের কেহ, বিশেষতঃ ভৃত্যাদি যেন তাহা না জানে। স্বামী-স্ত্রীর কলহ প্রায়ই বেশীক্ষণ থাকে না, মিটিয়া যায়। ভৃত্যদিগকে তাহার মধ্যে টানিয়া আনিলে তাহারা প্রশ্রয় পায় এবং স্বামী-স্ত্রীর সকল কথায়ই তাহারা যোগ দিতে চেষ্টা করে।

ভৃত্যদিগকে মধ্যস্থ মানা।

ভৃত্যাদি যাহাতে বিলাসী, বহুভাষী ও প্রগল্‌ভ হইয়া না ওঠে, বাড়ীর ভিতরে বসিয়া শিস্ দিতে ও গৃহের কাহারও সঙ্গে ঠাট্টাচাতুরী করিতে অভ্যস্ত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

গৃহের দাসী অল্পবয়স্কা, বিলাসিনী, চপলা ও বহুভাষিণী না হওয়াই মঙ্গলকর। প্রৌঢ়া, চরিত্রবতী, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্না, স্নেহশীলা দাসী সর্ব্বথা রক্ষণীয়া। অনেক বিলাসী উশৃঙ্খল যুবক ভৃত্য ও চরিত্রহীনা চপলা যুবতী দাসী দ্বারা অনেক পরিবারের গুরুতর সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, এরূপ শুনা গিয়াছে। ভৃত্যাদির প্রকৃতি, আচার, আচরণ লক্ষ্য করা গৃহী ও গৃহিণীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। কাজকর্ম্ম করিতে যতই দক্ষতা প্রদর্শন করুক না কেন, দুষ্ট প্রকৃতির দাসদাসীকে কদাপি গৃহে স্থান দিতে নাই।

গৃহের দাসী।

অনেকে দাসদাসীর কোন অপরাধ পাইলে প্রতিদিনই একবার করিয়া জবাব দিয়া থাকেন। প্রথম দুই এক দিন হয়তো তাহারা এ জবাব দেওয়াকে ভয় পায় কিন্তু যখন তাহারা বুঝিতে পারে, ইহা গৃহী-গৃহিণীর একটা রোগ বিশেষ, রাগ পড়িয়া গেলেই আবার ইহা ভুলিয়া যাইবেন, তখন আর সে জবাব দেওয়ার কোন মুল্যই থাকে না।

জবাব দেওয়ার রোগ।

কাহারও কোন অপরাধ সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে শীতল মস্তিষ্কে অতিশয় বিবেচনার সহিত করা উচিত। বিশেষ চিন্তা করিয়া যাহা স্থির সাব্যস্ত হয় তাহা করাই উচিত। কোন কাজেরই মিথ্যা অভিনয় ভাল নয়, তাহাতে সত্যিকারের কাজের মুল্য অনেকটা কমিয়া যায়। ভৃত্যাদিকে জবাব দেওয়া স্থিরীকৃত হইলে জবাব দেওয়াই

উচিত, প্রতিদিনই একবার করিয়া জবাব দেওয়ার অভিনয় করা ভাল নয়।

অনেকে সময়ের অভাবে, কেহ কেহ বা আলস্য করিয়া বাজারে যান না, ভৃত্য বাজার লইয়া আসিলেই সন্দেহবশতঃ জিনিষের মূল্যাদি লইয়া তাহার সঙ্গে চটাচটি করেন। নিজে যখন বাজারে যাওয়া সম্ভব হইতেছে না এবং ভৃত্য সত্য সত্যই চুরি করিয়াছে কি, না, তাহা যখন নিশ্চিত জানিবার উপায় নাই, সে ক্ষেত্রে নীরব থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। যাহার চুরি করার স্বভাব, কারণে অকারণে ধমকাইলেই সে স্বভাব চট্ করিয়া সে ত্যাগ করিতে পারে না এবং যে ভৃত্য সত্যই চুরি করে না, তাহাকে অকারণে বকাঝকা করিলে তাহার মনে বড় ক্ষোভ হয়।

নিজেদের বাজারে যাওয়ার সুবিধা।

ভৃত্যাদির বাজারে সন্দেহ হইলে এবং সন্দেহ না হইলেও পরিবারের কাহারও না কাহারও প্রতিদিন না পারিলেও প্রায়ই বাজারে যাওয়া কর্ত্তব্য। তাহাতে দুইটী দিক্ রক্ষা পায়। প্রথমতঃ বাজারের জিনিষপত্রের মূল্যাদির খোঁজ-খবর রাখা চলে, দ্বিতীয়তঃ আপন রুচি অনুযায়ী ভাল তরিতরকারি, মাছ, ঘি, ময়দা, ফলমূল প্রভৃতি আনা যায়। প্রতিদিনই পরিবর্ত্তিত ও পুষ্টিকর আহার্য্যাদি আহার করাই কর্ত্তব্য। ভৃত্য হয়তো তাহার নানাপ্রকার সুবিধার জন্য অথবা অজ্ঞতার দোষে প্রতিদিন একই মাছ, তরিতরকারি আনিয়া উপস্থিত করিবে। বাজারে কোন নূতন ফলমূল, টাট্‌কা তরিতরকারি শাকসব্জীর খোঁজও হয়তো সে করিবে না।

গৃহধর্ম্ম

অনেক গৃহীকে দেখিয়াছি, ভৃত্যাদির কোন অপরাধ পাইলে তাহাকে কদর্য্য গালাগাল করেন ও মারধর করেন। কোন কারণেই আশ্রিত কাহারও অঙ্গে হস্তক্ষেপ করা উচিত কি, না, তাহা বিবেচনার বিষয়। যাহাকে 'দূর' করিয়া দিলেই চলিয়া যাইতে বাধ্য, তাহাকে বকিয়া ঝকিয়া, মারধর করিয়া রাখা অপেক্ষা, না রাখাই মঙ্গল।

ভৃত্যের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার।

যে যত বড় অপরাধই করুক না কেন, ক্রোধ বশে তাহার সাজা দিবার ভার নিজের হাতে না লওয়াই ভাল। সময় সময় ভয় প্রদর্শন প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন অনেক ক্ষেত্রেই হয় না। যে দুর্জ্জন, অপরাধী বা পাপী তাহার সঙ্গত্যাগ করাই শ্রেষ্ঠ পথ।

ভৃত্যাদি গৃহে থাকিলে নিজেদের সকল কাজেই তাহাদের বশীভূত হইয়া পড়া কর্ত্তব্য নহে। সুস্থ শরীরে আপন আপন কাজ যথাসাধ্য নিজেরা সম্পাদন করিয়া নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখা কর্ত্তব্য। ছোট বড় সকল কাজেই ভৃত্য মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা এক প্রকার স্বেচ্ছাবৃত পরাধীনতা। কদাপি এইরূপ পরাধীন হওয়া কর্ত্তব্য নহে। দৈবাৎ কোন সময় ভৃত্যাদির অভাব ঘটিলে অতি সামান্য কার্য্য করিতেও তখন বড় কষ্ট হয়।

স্বেচ্ছাবৃত পরাধীনতা।

অনেক ধনী গৃহে প্রয়োজনাতিরিক্ত ভৃত্যাদি দেখা যায়। ইহা বিলাসিতা ও অপব্যয় মাত্র। হাতে অর্থ থাকিলে কি ভাবে তাহার প্রকৃত সদ্ব্যবহার করা যায়, সেইদিকে দৃষ্টি রাখাই মানুষের কর্ত্তব্য। কেবল আপন চাল বা বড় মানুষী বজায়

প্রয়োজনাতিরিক্ত ভৃত্য।

রাখিবার জন্য অর্থব্যয় অপব্যয় মাত্র, অপব্যয় পাপ বৈ আর কিছুই নহে।

ভৃত্যাদির আহারাদি গৃহের কোন স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকার আহারের সময় এক স্থানে না হইয়া, পরে হইলে বা পৃথক স্থানে হইলেই ভাল হয়। তাহাদের বিশ্রাম ও শয়নঘর বাহিরের দিকে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এমন স্থানে তাহাদের ঘর হওয়া উচিত যে, ভিতর বাড়ী হইতে ডাকিলে তাহারা শুনিতে পায়, অথচ ভিতর বাড়ীর সঙ্গে সে ঘরের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না থাকে।

ভৃত্যাদির গৃহ নির্দ্দেশ।

গৃহপালিত পশু

আমাদের গৃহেরই আর একটী প্রধান অঙ্গ, গৃহপালিত পশু। তাহার মধ্যে গরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। গরুর প্রয়োজনীয়তা বলিয়া শেষ করা যায় না। গরু দুগ্ধ দ্বারা আমাদের শৈশবে জীবনধারণে সহায়তা করে, মাতৃহীন শিশুর জীবন রক্ষা করে, ধরণীর বুক চিরিয়া ভূমি কর্ষণ করিয়া আমাদের উদরান্নের সংস্থান করে, গোময় দ্বারা জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে, গৃহের দুর্গন্ধ ক্লেদাদি গোময় ব্যবহারে নষ্ট হয়, মৃত্যুর পর আপন চর্ম্মদ্বারা আমাদের

গরুর উপকারিতা।

পাদুকার সাহায্য করে, অস্থি দ্বারা নানাকার্য্যে সহায়তা হয়, তাই গরু আমাদের মাতৃস্থানীয়া, পূজনীয়া, গোপালন আমাদের ধর্ম্মের অঙ্গীভূত।

গোপালন ধর্ম্মের অঙ্গ।

প্রাচীনকালে প্রায় প্রতি গৃহেই গরু থাকিত, এবং গৃহীগৃহিণীরা নানাপ্রকারে তাহাদের পরিচর্য্যা করিয়া পূজা করিতেন। এতবড় আত্মত্যাগী এই মূক পশুকে তাঁহারা আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন। এখন অনেক স্থান হইতেই সে পাট উঠিয়া গিয়াছে। গোপালন এখন গোনির্য্যাতনে দাঁড়াইয়াছে। গরুর দুধের সঙ্গে এখন আমাদের সম্বন্ধ, তাহার স্বাস্থ্য সুখ-সুবিধার সঙ্গে নহে।

গোনির্য্যাতন।

দেশের গোপাল দেখিলে, আমাদের এই গোপালন কতবড় গোনির্য্যাতনে রূপান্তরিত হইয়া আছে, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়।

পূর্ব্বে দেশের সর্ব্বত্রই গোচারণ-ভূমি ছিল, এখন অধিকাংশক্ষেত্রেই তাহা আবাদী ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। গরুর স্নান ও পানের জন্য গ্রামে গ্রামে জলাশয় ছিল, এখন অধিকাংশ স্থানের জলাশয়ই মজিয়া হাজিয়া বুজিয়া গিয়াছে।

গোচারণ-ভূমি ও জলাভাব।

যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মানুষ ও পশ্বাদির জন্য জলাশয় প্রতিষ্ঠা করা ধর্ম্মকর্ম্ম মনে করিতেন, তাঁহারা অন্তর্হিত হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত সমস্ত জলাশয় সংস্কারের অভাবে ভরাট হইয়া যাইতেছে। তাঁহাদের পুত্রপৌত্রগণ এই সব পরার্থে ব্যয়কে অপব্যয় ও বাহুল্যজ্ঞানে তাহা সঙ্কোচ করিয়া স্বগ্রাম, সমাজ ও জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া বড় বড় সহরে বসিয়া বড় বড় খেতাবের আশায় নির্ব্বিচারে অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া আপনাদের বুদ্ধিমত্তা ও

জলাশয় প্রতিষ্ঠা ধর্ম্মকর্ম্ম।

পূর্ব্বপুরুষগণের নির্ব্বুদ্ধিতা ঘোষণা করিতেছেন। যে আয়ে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ স্বগ্রামে থাকিয়া দান, ধ্যান, নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ, পূজা-পার্ব্বনাদি করিয়া অকাতরে দরিদ্র নারায়ণের সেবা করিতেন, গ্রামের গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধি করিতেন, অঋণী, অপ্রবাসী থাকিয়া জীবনে স্বাস্থ্য, শান্তি ও দীর্ঘায়ু ভোগ করিয়া যাইতেন, এখন আয় তাহা অপেক্ষা অনেকগুণ বাড়িয়াও তাঁহাদের ব্যয় সঙ্কুলান হয় না। দান, ধ্যান, নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণাদির ব্যবস্থা অনেক স্থান হইতেই উঠিয়া গিয়াছে। সংস্কারের ব্যয়ের অভাবে পূর্ব্ব পুরুষ প্রতিষ্ঠিত অবাধ আলোবাতাস পরিপূর্ণ সাধের সুরম্য অট্টালিকা জীর্ণ কঙ্কালসার হইয়া যাইতেছে, তবুও কর্ত্তাদের ঋণ হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। দেশের ভূস্বামীকুলের অধিকাংশ দেশত্যাগী ও প্রজার দুঃখে অন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পল্লীর আনন্দ, শ্রী, শান্তি, স্বাস্থ্য অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। দেশের দীনদরিদ্র মধ্যবিত্ত আপামর সাধারণের দারুণ গ্রীষ্মের তৃষ্ণায় এক ফোঁটা বারিদানে কাহারও হাত ওঠে না, গৃহপালিত পশ্বাদি কর্দ্দমাক্ত জলদ্বারা কোন প্রকারে জীর্ণ কঙ্কালসার দেহের দাহ মিটায়, এমনই নিদারুণ আজ আমাদের অবস্থা।

আমরা একটা গোহত্যা দেখিলে শিহরিয়া উঠি, চিৎকার করিয়া গলা ফাটাইয়া মরি কিন্তু বাংলাদেশের প্রায় সর্ব্বত্র ঘরে ঘরে গোকুলের যে শোচনীয় দুর্দ্দশা তাহা হত্যারই নামান্তর মাত্র। আমরা গরু পুষিয়াই তাহার দুগ্ধের দাবী করি, তাহার আহার্য্য, পানীয়, সেবা-যত্নের ভাগী হইতে চাহি না। গরুর স্বাস্থ্য ও চেহারা যেরূপই হৌক্, তাহার বৎসকে নিতান্ত নির্ম্মমভাবে বঞ্চিত করিয়া দুগ্ধের শেষ ফোঁটা পর্য্যন্ত

দোহন করিয়া লইয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত আপন শিশুদিগকে ভোজন করাই ও আপনারা পান করিয়া আরামের উদ্গার ত্যাগ করি। আমরা জানি, বর্ণে, স্বাদে, উপকারিতায় দুগ্ধের ন্যায় খাদ্য আর কিছু নাই, তাই আমরা শৈশব হইতেই দুগ্ধ খাইতে বড়ই ভালবাসি; কিন্তু আমরা শিক্ষা করি না কি ভাবে এই আত্মত্যাগী পশুর পরিচর্য্যা করিতে হয়, দেবতার মত তাহার সেবা, যত্ন, পূজা করিতে হয়, তাহার আহার্য্য, পানীয় যোগাইয়া তাহার স্বাস্থ্য রক্ষার সহায়তা করিতে হয়। কোন কোন স্থলে বা বেতনভুক্ ভৃত্যাদির স্কন্ধে তাহাদের সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব চাপাইয়া দিয়া তাহাদের প্রতি আমাদের সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য সমাপন বোধ করি। আমরা দিন দিন এমনই নিমকহারামের জাত হইয়া উঠিয়াছি। দশ মাস জঠরে বহন করিয়া আপন দেহের রসরক্ত, মেদমজ্জা ভাগ করিয়া দিয়া, প্রসবের দুঃসহ ক্লেশ সহিয়া এবং শৈশবের শত প্রকার নির্য্যাতন সহিয়া যে মা আমাদিগকে বড়টী করিয়া জগতে ছাড়িয়া দেন, অনেক স্থলেই সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীকে অবহেলা করিয়া আপন স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া আমরা ব্যস্ত হইয়া পড়ি। আর যাহার দুগ্ধ জীবনব্যাপী পান করিয়া আমরা স্বাস্থ্য, বল, শক্তি, রক্ষা করি, যে নীরবে জলে ভিজিয়া, রৌদ্রে পুড়িয়া কঠিন ধরণীর বুক চিবিয়া আমাদের ক্ষুধার অন্ন সংস্থান করিয়া দেয়, আমাদেরই পুর্ব্বপুরুষগণ যাহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিয়া গিয়াছেন, সেই জননী-তুল্য পূজনীয়া গোমাতাকেও আমরা অনেক স্থলে অবজ্ঞা করিয়া থাকি। এইরূপ অবজ্ঞা, অবহেলা করাকেই আমরা সভ্যতা ও বাবুগিরির আদর্শ ধরিয়া রাখিয়াছি। অন্য কোন দেশে এইরূপ অবজ্ঞা, অবহেলা আছে কি না, তাহা আমরা চক্ষু

গোমাতার প্রতি অবজ্ঞা।

মেলিয়া চাহিয়াও দেখি না। একটা জাতি কত দিকে অধঃপতিত হইলে, কতপ্রকার পাপ, অন্যায়, অবিচারের পাষাণভারে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিলে, শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী তাহাকে কঠোর নিগড়ে আবদ্ধ থাকিতে হয়, তাহা আমরা চিন্তা করিয়া দেখি না। উত্তেজনার মোহে হৈ চৈ করিয়া পাপের শাস্তি হইতে মুক্ত হইতে চাই কিন্তু তাহার কারণ দূর করিবার কথা আমাদের মনেও পড়ে না।

কৃত্রিম উপায়ে গোদোহন।

সহরে গোপালন ও গোরক্ষা করা ব্যয় ও কষ্টসাধ্য। অবস্থাবান গৃহী ভিন্ন প্রায়ই তাহা সম্ভব হয় না। ব্যবসায়ীরাই সহরে গরু পুষিয়া থাকে এবং কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক উপায়ে গোদোহন করিয়া সেই দুগ্ধের সঙ্গে নানারূপ ভেজাল মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করে। অস্বাভাবিক উপায়ে দুগ্ধদোহন করায় গোকুল স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়ে। সে দুগ্ধপানেও অপকার বৈ উপকার হইতে চাহে না।

গরু যখন আমাদের এত উপকারী, দুগ্ধ, গোময় প্রভৃতি ভিন্ন যখন আমাদের চলিবার উপায় নাই, তখন গৃহে গৃহে গোপালন ও সেই পিতৃ-পিতামহের মত গৃহী গৃহীণীর নিজেদের হাতে তাহাদের সেবার ভার গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। পল্লীর প্রায় প্রতি গৃহেই দুই একটী গাভী রাখা চলে এবং গৃহী গৃহীণীরা তাহাদের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া দেখিয়া একটু শ্রম স্বীকার করিলেই তাহাদের পরিচর্য্যা করা চলে। যাঁহাদের সামান্য কিছু জমী জমাও আছে, তাঁহারা সেই জমীর খড় গরুর আহার্য্যরূপে ব্যবহার করিতে পারেন। নিজেরা দুই বেলা ঘণ্টা দুই করিয়া তাহাদিগকে

গরুর আহার্য্যের সহজ উপায়।

মাঠে চরাইয়া আনিলে অথবা ঘাস তুলিয়া আনিলেই তাহাদের পেট ভরার পক্ষে যথেষ্ট হয়। বাড়ীর ধানের কুড়া, কলাই, গম ও নানা প্রকার ডালের ভুষি, চালধোয়া জল, ভাতের ফেন, উদ্বৃত্ত ভাত প্রভৃতি যাহা কিছু থাকে, অপচয় না করিয়া কিছু লবণ সহযোগে তাহাদিগকে দিলেই পরিতোষ সহকারে তাহা ভোজন করে। নিজেরা যে কূপ বা ইঁদারা হইতে পানীয় জল সংগ্রহ করি সেইখান হইতে গরুর জন্য দুই তিন কলসী পরিষ্কার জল প্রতিদিন অতি অক্লেশে যোগাইয়া তাহার স্বাস্থ্য রক্ষার সহায়তা করিতে পারি। এই সব কর্ম্ম এখন আমরা হীন ও অপমানজনক বোধ করি, অনেকে আলস্যদোষে ইহা করিতে পারি না, অনেকে আবার ইহার প্রয়োজনীয়তাই উপলব্ধি করি না, এইভাবে পরিচর্য্যা, সেবা, যত্নের অভাবে আমাদের স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষার অন্যতম সহায়ক গোকুল বাংলা হইতে ধ্বংস হইতে বসিয়াছে।

ভাতের ফেন না ছাঁটাই উৎকৃষ্ট পন্থা। একমাত্র বাংলাদেশ ভিন্ন আর কোন দেশে ভাতের ফেন ছাঁটিয়া ফেলিবার প্রথা নাই। ভাতের খাদ্যপ্রাণ সমস্ত বস্তুই প্রায় ফেনের সঙ্গে চলিয়া যায়। আমরা ফেন না ছাঁটিয়া ভাত খাইতে নারাজ, কারণ সে ভাত যুঁই ফুলের মত সাদা ধব্‌ধবে হয় না। পদার্থ থাকুক আর না-ই থাকুক দেখিতে সুশ্রী হওয়া চাইই। যেমন আমরা অন্তঃসারশূন্য, অথচ বাহিরের বাবুয়ানা ষোল আনা বজায় রাখি। আমরা স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষায় কত অজ্ঞ, তাহাকে কত তুচ্ছ জ্ঞান করি, ইহা তাহারই পরিচায়ক। গৃহের মালক্ষ্মীরা এই অভ্যাসটা অবশ্যই পরিত্যাগ করিবেন। মনে রাখিবেন, স্বাস্থ্য ও জীবনের

ভাতের ফেন ছাঁটা।

জন্যই অন্ন গ্রহণ। ভাতের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা তাহার জীবনীশক্তি বর্দ্ধকতার প্রয়োজন অনেক বেশী। ফেনের সঙ্গে অন্নের সেই শক্তিটুকু ফেলিয়া দিয়া ঝুরঝুরে চারিটী ভাত স্বামীপুত্রকে পরিবেশন করার মধ্যে মনের শান্তি যতটুকুই থাকুক, আহারের উদ্দেশ্য তাহাতে অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। ফেন ছাঁটার অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া অন্নের শরীরপোষণকারী ক্ষমতাকে অক্ষুণ্ণ রাখা স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

আলোবাতাস পূর্ণ শুষ্ক উচ্চ গৃহে গরুর বাসস্থান নির্ণয় করিয়া দিতে হয়। গরু যেখানে রাত্রিতে থাকে, সে স্থান কদর্য্য করিয়া ফেলে। গৃহে যথেষ্ট আলোবাতাস না খেলিলে সারাদিনমানে ঘর শুষ্ক ও বাসোপযোগী হওয়া সম্ভব নহে। অন্ধকার, স্যাঁৎস্যাঁতে ও কদর্য্য স্থানে থাকিলে গরু রাত্রিতে ঘুমাইতে পারে না, তাহার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ খারাপ হইয়া পড়ে। মাতা রুগ্না হইলে স্তন্যপায়ী শিশু যেমন সহজেই সেই রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে, রুগ্না গাভীর দুগ্ধ পান করিলে সেইরূপ আমাদেরও নানা রোগোৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা।

গরুর বাসস্থান।

গৃহিণী নিজে বা গৃহের অপর কোন দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন সুস্থ ব্যক্তি গোদোহন করিবেন। গোদোহন করা অতি সহজ। ক্রমান্বয়ে কয়েক দিন চেষ্টা করিলেই ইহা অভ্যাস হইয়া যায়। পরিষ্কৃত স্থানে, পরিষ্কৃত পাত্রে গাভীর বাট পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া লইয়া গোদোহন করা কর্ত্তব্য। বাটে কিছু দুগ্ধ থাকিতেই তাহা বৎসের জন্য রাখিয়া দোহন ক্ষান্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পরিবারের আবালবৃদ্ধবণিতা

গোদোহন।

সকলের আহার্য্যে তৃপ্তি, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য রক্ষার সহায়ক দুগ্ধ, কাজেই তাহা দোহনের ভার অজ্ঞ ও নোংরা স্বভাব সম্পন্ন কোন সংক্রামক, স্পর্শাক্রমক, বা কুলজ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির উপর কদাপি দিতে নাই।

সম্ভব হইলে প্রতিদিনই প্রত্যূষে ও বৈকালে কিছু কালের জন্য গরু মাঠে মুক্ত বাতাসে লইয়া যাওয়া ভাল। ইহাতে গরুর স্বাস্থ্য ভাল থাকে ও অন্যান্য নানা প্রকার সুবিধা হয়। অন্ততঃ একবেলাও গরু মাঠে লইয়া যাওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

গোময়।

গোময় দ্বারা আমরা নানারূপে উপকার প্রাপ্ত হইতে পারি। অনেক গৃহে স্তূপীকৃত গোময় অনর্থক নষ্ট হইয়া যায়। গোময় জমীর পক্ষে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সার। গৃহের বেগুন, মরিচ, শাকসব্জী, লাউ, ঝিঙ্গা, ফলফুলের বাগানে গোময় সাররূপে ব্যবহার করিলে বৃক্ষাদি সতেজ ও বহুগুণে ফলবান হইয়া থাকে। গোমূত্রও অতিশয় তেজস্কর সার। গোময় দ্বারা ঘুটে প্রস্তুত করিয়া কয়লা ধরানের সহায়তা হয়, জ্বালানি কাষ্ঠের ন্যায়ও ইহা জ্বাল দেওয়া চলে এবং ইহা বিক্রীও করা চলে। তাজা গোবর দ্বারা কাঁচা ঘর প্রতিদিন লেপিলে ও গোবর গুলিয়া আনাচে কানাচে ছিটাইয়া দিলে দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া যায়।

গরুর ঋণ অপরিশোধ্য।

গরু নানাপ্রকারে আমাদের অশেষবিধ উপকার করিয়া থাকে, ইহার ঋণ অপরিশোধ্য। এ হেন উপকারী মূক জন্তুকে সংসার যাত্রায় অপরিহার্য্য ও অত্যাবশ্যকীয় এবং জীবনধারণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহায়ক জ্ঞানে সস্নেহে ও সযত্নে গৃহে স্থান দেওয়া ও যথাসাধ্য তাহার পরিচর্য্যা করা মানুষেরই কাজ।

কুকুর ও বিড়াল।

ভগবান আরও দুইটী জন্তুকে আমাদের নিরুপদ্রব জীবনযাপনে সহায়ক করিয়া আমাদের গৃহ কোণে তাহাদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তাহার একটী কুকুর, অপরটী বিড়াল। ইহারা উভয়েই গৃহের শোভা ও অকৃত্রিম্ বন্ধু। পল্লীগ্রামে প্রত্যেক গৃহে ইহাদের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। গৃহের কুকুরটীকে প্রতিদিন দুই বেলা দুই মুঠা ভাত দিলেই সে সন্তুষ্ট, সারারাত্রি জাগিয়া প্রভুর গৃহে পাহারা দিয়া থাকে। দুই জন বেতনভুক্ ভৃত্য দ্বারা যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়, একটী ভাল কুকুর সযত্নে পুষিলে সে একাকী সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম। দেশের কুকুরকুল ক্রমশঃ হীনস্বাস্থ্য, দুর্ব্বল ও খর্ব্বাকৃতি হইয়া আসিতেছে, ইহার জন্য আমরা অনেকাংশে দায়ী। সে গৃহের যে উপকার করে, তাহার প্রত্যুপকার স্বরূপ অনেক স্থলেই তাহাকে পেট ভরিয়া খাইতে দেই না, বা দিতে পারি না। আহার্য্য দিতে পারি, বা না পারি দিবানিশি তাহাদিগকে দুর্ দুর্ করিয়া তাড়না করিতে আমরা খুব অভ্যস্ত। কুকুর বড়ই প্রভুভক্ত। সে প্রভুর স্নেহ, রাগ, বিরক্তি অনায়াসে বুঝিতে পারে। শিক্ষা দিলে কুকুর দ্বারা অনেক কাজ সম্পন্ন করান যায়। দুই বেলা দুই মুঠা আহার্য্য সস্নেহে ফেলিয়া দিলেই যে পা-চাটা গোলামের মত দুয়ারে পড়িয়া থাকে, সেই বিশ্বাসী উপকারী জন্তুকে সমাদরে গৃহকোণে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য।

গৃহের এক কোণে একটী বিড়াল পড়িয়া থাকে বলিয়াই ইঁদুরে আমাদের গৃহের দ্রব্যাদি তেমন অপচয় করিতে পারে না যে গৃহে ইঁদুরে শস্য, বিছানা, আসবাবপত্র নষ্ট করিয়া ফেলে, সে গৃহে ভাল দুই

একটী বিড়াল পুষিলে বিড়ালের ভয়ে ইঁদুর পলায়ন করে। বিড়াল ইঁদুর খাইতেও ভালবাসে, কাজেই তাহাকে হত্যা করিবার একটা স্বাভাবিক বৃত্তি বিড়ালের আছে।

এই ভাবে কত প্রকার জীবজন্তু, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা কত ভাবে যে আমরা উপকৃত হই তাহার আদি অন্ত নাই। ভগবান সংসার সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহা রক্ষা করিবারও এমনই আশ্চর্য্য কৌশল প্রত্যেক জীব, জন্তু, বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্মে নিহিত রাখিয়াছেন যে, ভাবিলে আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়। তাহারা একদিকে যেমন সৃষ্টির অপরূপ সৌন্দর্য্য বাড়াইতেছে, তেমনই তাহাকে রক্ষা করিয়াও চলিতেছে। একটী ধূলিকণা, একখণ্ড তৃণও তিনি অকারণে সৃষ্টি করেন নাই। পৃথিবীতে এমন কোন পদার্থ বোধ করি বা কেহ আবিষ্কার করিতে পারিবেন না, যাহা কোন না কোন প্রয়োজনে না আসে।

নারীজাগরণ

আজকাল চারিদিকেই নারীজাগরণের কথা শুনা যায়। ইহার নামে অনেক পুরুষ আতঙ্কে শিহরিয়া ওঠেন। অনেক নারীও ভাবেন, ইহা আবার একটা কি বস্তু। কতকগুলি মন্ত্রমাত্র পাঠ করিয়া, সেই অতি

উচ্চ মন্ত্রাদির অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন হইয়াও তাহারই বলে পুরুষ আপনার ও গৃহের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনের জন্য নিজ গৃহে যে নারীকে আশ্রয় দেন, যে নারী আপনাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, ইচ্ছানুগামিনী, পরাধীনা দাসীমাত্র জ্ঞান করেন, যাঁহাকে পুরুষ আজ কত যুগ হইল সামাজিক বিধি, নিষেধ, আইন, কানুন অবগুণ্ঠনের নাগপাশে দৃঢ় বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার আবার স্বাধীনতা !

এরূপ ধারণাগ্রস্ত লোকেরও দেশে অভাব নাই, যাঁহারা মনে করেন, নারীজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে গৃহধর্ম্ম বুঝি অকালে ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে।

নারীজাগরণ দেশের পক্ষে মঙ্গলকর।

নারী যদি জাগরিতাই হ'ন, তাঁহার সকল প্রকার কর্ত্তব্য, দায়িত্ব ও মর্য্যাদা তিনি বুঝিয়া লইতে পারেন, তবে তাহা পুরুষ ও দেশের পক্ষে মহা মঙ্গলকর। নারী জাগরিতাই হৌন্, আর স্বাধীনাই হৌন্, নারীর ধর্ম্মকে বাদ দিয়া তিনি তাহা হইতে পারিবেন না, ইহা অতিবড় সত্যকথা। নারী নারীই থাকিবেন, পুরুষ হইতে পারিবেন না, ইহাও নিশ্চিত।

বর্ত্তমানে জ্ঞানবিজ্ঞানে, বাণিজ্যে, স্বাধীনতায় শ্রেষ্ঠ দেশসমূহের নারীজাতি স্বাধীনা, তাই বলিয়া কি তাঁহারা পুরুষকে বাদ দিয়া বা অগ্রাহ্য করিয়া নারীর ধর্ম্মকে নষ্ট করিয়া দিয়াছেন ? তাঁহারা কি বিবাহ করেন না, স্বামীকে, সংসারকে ভালবাসেন না, গর্ভে সন্তানধারণের দুর্ব্বহ ক্লেশ, প্রসবের দুঃসহ যাতনা অম্লানবদনে সহ্য করেন না ? তাঁহারা কি দুস্থ স্বামীর গৃহে রন্ধন হইতে সুরু করিয়া সংসারের যজ্জাবতীয় শৃঙ্খলা রক্ষা করেন না ? ইহা অপেক্ষাও বহু গুরুতর ও জটীল কার্য্য গৃহের জন্য,

স্বজাতি, স্বদেশের জন্য গত মহাযুদ্ধের সময় তাঁহারা অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছেন। সে দেশের পুরুষরা নারীকে গ্রহণ করেন আপনার জীবনের বন্ধুরূপে, আমরা নারীকে মনে করি আমাদের দাসীর মতো। গৃহে, সমাজে, পথে, ঘাটে সর্ব্বস্থানে নারীর সম্মান তাঁহারা দিতে জানেন, আমরা নারীর সম্মানকে গণনার মধ্যেই আনি না। অথচ আমাদেরই দেশের ঋষি কত যুগ আগে উদাত্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন, যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

নারী সংসার জীবনের বন্ধু।

নারী যদি আজ জাগরিতা হইয়া তাঁহার পূর্ণ অধিকার তিনি গ্রহণ করিতে চান, তাঁহার প্রতি অহেতুক অন্যায় অবিচার অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীনতা চান, তাহা অস্বীকার করিবার আমাদের উপায় নাই। এই আকাঙ্ক্ষাই মানবের জন্মগত আকাঙ্ক্ষা, এই অধিকারই তাঁহার জন্মগত অধিকার। সে অধিকার নারীকে সসম্মানে ছাড়িয়া দিলে পুরুষের ন্যায্য আধিপত্য পুরুষত্ব বা মনুষ্যত্ব ক্ষুণ্ণ হইবার কোন সঙ্গত হেতুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পুরুষত্ব ও মনুষ্যত্ব পুরুষেরই স্বেচ্ছায়ত্ত। পুরুষত্ব ও মনুষ্যত্বের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিবার শক্তি নারীর নাই। নারীর উপর পুরুষের অধিকার পুরুষত্বের, নৈতিক ও আত্মিক বলের, স্নেহ-মায়া-মমতার, এই অধিকারই চিরন্তন, অচ্ছেদ্য ও স্বাভাবিক। সামাজিক শারীরিক বা পাশবিক বলের অধিকার পরিবর্ত্তিত বা ক্ষুণ্ণ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। যিনি যত জাগরিতাই হৌন, যাহার নারীত্ব যত উচ্চই হৌক্‌, তিনি পুরুষের স্বাভাবিক অধিকারকে অস্বীকার কোন কালেই করিতে পারিবেন না, করিলে

পুরুষত্ব পুরুষেরই স্বেচ্ছায়ত্ত।

নারীর উপর পুরুষের অধিকার।

তাঁহার নারীত্বই অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। নারী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি সত্যিকারের কর্ত্তব্য ও অধিকার অস্বীকার করিবার উপায় নর-নারী কাহারই নাই। সেই অধিকারের বৈষম্য অসহনীয় ও অমানুষিক হইয়া উঠিলে বিদ্রোহ সেখানে স্বাভাবিক।

আমরা স্বাধীনতার সংগ্রাম করি কিন্তু আমাদেরই পাশে নারীকে আমরা অতি অনায়াসে নির্ব্বিচারে দাসীত্বের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। যিনি জীবনের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী, পরিবারে, সমাজে, স্বদেশে যিনি অর্দ্ধেক স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারই প্রতি অন্যায়, অসম্মান, অমর্য্যাদার সঙ্গে সঙ্গে জাতির অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে, ইহা আমরা ভাবিয়া দেখি না। অর্দ্ধাঙ্গকে বাদ দিয়া অপর অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষে পৃথিবীতে কি করা সম্ভব তাহা সহজেই বুঝা যায়।

নারী স্বদেশের অর্দ্ধাঙ্গ।

আমাদের পরিবারে, সমাজে আমরা কত ভাবেই না নারীর প্রতি অবিচার করিয়া থাকি। পুরুষ বিপত্নীক হইবার মাসাবধি কাল মধ্যে অনায়াসে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়া থাকে, এরূপ ঘটনার অন্ত দেশে নাই। কেবল নিজের ও নিজের পরিবারের সুখ-সুবিধার সঙ্গেই যেন নারীর সম্বন্ধ, প্রাণের সঙ্গে নহে, তাই অত্যন্ত অনায়াসে একটীর পর আর একটী স্ত্রী গ্রহণ করিতে প্রাণে এতটুকুও বাজে না। পক্ষান্তরে অল্পবয়স্কা বালবিধবা সংস্কার বশে ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় বোঁটা হইতে উত্তপ্ত মাটীতে ছিঁড়িয়া ফেলা ফুলটীর মতই দিনে দিনে শুষ্ক নিঃশেষ হইয়া যায়।

নারীর সঙ্গে পুরুষের সুখ-সুবিধার সম্বন্ধ।

চরিত্রহীন স্বামী নানা কুস্থানে দিবারাত্র অতিবাহিত করিয়া স্ত্রীকে অযথা অকথ্য অত্যাচার করিতেছে, অন্নবস্ত্রে কষ্ট দিতেছে, তাহা নারী নীরবে মুখ বুজিয়া সহিতেছেন, পক্ষান্তরে নারী দৈবাৎ পদস্খলিতা হইলে বা তাঁহার উপর সন্দেহমাত্র হইলে তিনি স্বামী ও সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইতেছেন। একই অপরাধে একই স্থানে এই দণ্ডবৈষম্য যদি নারী আজ সহিতে না চান, তবে পুরুষের বলিবার কি আছে? যে নিষ্ঠা নারীর জীবনে অপরিহার্য্য তাহা পুরুষের পক্ষে রক্ষণীয় নহে কেন?

স্বামী-স্ত্রীর দণ্ডবৈষম্য।

নারী উদয়াস্ত শ্রম করিয়া, কত কষ্ট সহিয়া সংসার রক্ষা, বংশ রক্ষা করিতেছেন, সন্তানপালন, স্বামী সেবা করিতেছেন কিন্তু যে সংসারের জন্য তিনি প্রাণান্ত করিতেছেন, সে সংসারে তাঁহার কোন অধিকারই নাই। কোন মতে দুই মুঠা সিদ্ধ বা আতপ তণ্ডুলভাগিণী মাত্র। পুরুষ যেহেতু পুরুষ হইয়া জন্মিয়াছে, সেই হেতু শত দোষে দুষ্ট হইলেও সে সর্ব্বস্বের অধিকারী। নারী পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী, আপনার দেহের রসরক্ত, মেদমজ্জা দিয়া তিনি স্বামীর বংশ রক্ষা করিয়া থাকেন, স্বামীর মতই স্বামীর গৃহে তাঁহার তুল্য অধিকার নাই কেন? কেন তিনি গৃহের বিষয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিতা হন? তাঁহার জীবনকাল পর্য্যন্ত স্বামীর সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ যদি তিনি দাবী করেন তাহা কি কোন প্রকারে অন্যায় হয়?

স্ত্রী দুই মুঠা তণ্ডুলের অধিকারিণী মাত্র।

চারি পাঁচটী উপযুক্ত পুত্রের ভদ্র ঘরের বিধবা জননীকেও সরল, অনাড়ম্বর অন্নবস্ত্রের জন্য কষ্ট পাইতে হইয়াছে, এরূপ ঘটনা স্বচক্ষে

দেখিয়াছি। কত সংসারে যে বিধবা জননী পুত্র, পুত্রবধূর নিকট বিষ হইয়া গলগ্রহের ন্যায় জীবনাতিপাত করেন, তাহার আদি অন্ত নাই। সংসারে নারীর কোন প্রকার অধিকার না থাকায় এবং আমরা তাঁহার মান-মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অনভ্যস্ত হওয়ায় তাঁহাকে এই মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা জীবনে ভোগ করিতে হয়।

এই সব অনিয়ম, অবিচার ও নির্দ্দয় পক্ষপাতিত্বে আমাদের দেশের বহু নারীই নিপীড়িতা হইয়া থাকেন। এই নির্য্যাতনের বিপক্ষে বিপ্লব স্বাভাবিক। কিন্তু সে বিপ্লব প্রতিহিংসামূলক বা বিদ্রোহাত্মক হওয়া উচিত নহে। নারীত্ব ও মাতৃত্বের পরিপূর্ণ জাগরণ এবং তাহার দায়িত্ব ও অধিকারের বিকাশ দ্বারা পুরুষের অন্ধতাকে বিদূরিত করাই সে বিপ্লবের মূলগত উদ্দেশ্য হওয়া কর্ত্তব্য। নারী তাঁহার নিজের অধিকার ও দায়িত্ব বুঝিয়া লইলে, নারীত্ব ও মাতৃত্বকে উন্নত ও জাগ্রত করিয়া তুলিলে, পুরুষের শঙ্কিত ও ব্যথিত হইবার কারণ নাই, তাহাতে সংসার, সমাজ ও স্বদেশের বহু সমস্যার সমাধান হইয়া যাওয়ারই সম্ভাবনা।

নারীত্ব ও মাতৃত্বের জাগরণ।

দেশের প্রত্যেক নারী যত স্বাধীনতাপ্রয়াসী, আত্মোন্নতিকামী, শিক্ষিতা, স্বাস্থ্যবতী, তেজস্বিনী হইবেন, তাঁহার সন্তানাদিও তদ্রূপ হওয়াই সম্ভব। নারীর শিক্ষা স্বাধীনতা ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রকার অজ্ঞতা দূর হইয়া নিজের দেহ, গর্ভাবস্থা, শিশুপালন ও গঠন ইত্যাদি নারীর অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান হওয়া অযৌক্তিক নহে। তাহার ফলে আমাদের বংশধরগণ সুস্থ, সবল, শিক্ষিত হইবে আশা করা যায়।

নারীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতব্য।

কোন পুরুষেরই নারীর কোন প্রকার সত্যিকারের উন্নতি ও মঙ্গল-প্রয়াসে বাধা দেওয়া উচিত নহে। তবে যদি সেই প্রয়াসে কোন প্রকার, ভুল, ত্রুটী, অন্যায় বা অধর্ম্মোচিত কিছু থাকে, তাহা সস্নেহে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া সংশোধন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

হুজুগের সুবিধা লওয়া।

নারীও উন্নতিপ্রয়াসী হইয়া হুজুগে পড়িয়া কিছু না করেন, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। উন্নতি, স্বাধীনতা বা জাগরণের স্পৃহা মানুষ মাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম কিন্তু একটা হুজুগের সুবিধা লইয়া কেহ যেন কাহারও কু-উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার চেষ্টা না করেন। নারীজাগরণ, মাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা, দেশের উন্নতির সহায়ক সন্দেহ নাই। নারীকে বাদ দিয়া কেবল পুরুষ একা কোন দিনই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারিবেন না, অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত নারীপ্রকৃতি চিরকালই তাঁহার উন্নতির পথে বাধা জন্মাইবে কিন্তু নারী তাঁহার জাগরণের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি ভুল করিলে কোন সুফলই ফলিবে না।

সকল পুরুষই নারীনির্য্যাতনকারী নহেন।

নারী সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবেন, দেশের সকল পুরুষই নারী নির্য্যাতনকারী বা খারাপ নহেন, বরং অধিকাংশ কন্যার পিতা কন্যার প্রতি এবং স্বামী সতী স্ত্রীর প্রতি স্বভাবতঃই সহানুভূতি সম্পন্ন, কাজেই কন্যা পিতার সহিত ও স্ত্রী স্বামীর সহিত এই বিষয় লইয়া অক্লেশে আলোচনা করিয়া সত্যপথ নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে পারেন।

নারী জাগরণের অর্থ, পুরুষের প্রতি বিদ্রোহ বা অবজ্ঞা নহে, নারীত্বের মহিমা, সম্মান ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, মাতৃত্বের

গৌরব অক্ষুণ্ণ ও পরিপূর্ণ করিয়া তোলা, শিশু পালন ও গঠন দ্বারা ঘরে ঘরে মানুষ তৈয়ারী করিয়া বংশ, স্বজাতি, স্বদেশ ও স্বধর্ম্মকে রক্ষা করার সহায়তা করা।

নারী জাগরণের উদ্দেশ্য।

পুরুষ যদি আজ আপনার পুরুষত্ব, বলবীর্য্য, মনুষ্যত্ব, সত্যধর্ম্ম, স্বাস্থ্য প্রভৃতি দ্বারা আপনাকে বিভূষিত করিয়া লইতে পারেন, আর নারী শিক্ষায়, দীক্ষায় নারীত্ব ও মাতৃত্বের অক্ষুণ্ণ গৌরবে গৌরবান্বিতা হইয়া ঘরে ও বাইরে সকল প্রকার সংগ্রামে উভয়ে হাত ধরাধরি চলিতে পারেন, তবে পরিবারে, সমাজে, স্বদেশে কত সমস্যার সমাধানই না চক্ষের পলকে হইয়া যায়।

মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব

জানি না, সৃষ্টির কোন্ আদিযুগে, কোন্ মাতৃবক্ষস্নেহরসধারাপায়ী মানবশিশুর অর্দ্ধোচ্চারিত কণ্ঠে, সৃষ্টির পুঞ্জীভূত সকল মাধুর্য্যমহিমামণ্ডিত, সহস্র নির্ঝরঝঙ্কৃত, সর্ব্বসন্তাপহারী, একাক্ষরবাণী 'মা' সম্বোধন উচ্চারিত হইয়াছিল। তাহার পর সৃষ্টির কত আবর্ত্তন বিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, কত জাতি উঠিয়াছে, কত জাতি অতীতের অন্ধকারে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে, কত মহামানবের ধারা মহাকালের গদাঘাতে রেণু রেণু হইয়া কালসাগরে মিলাইয়া গিয়াছে, সে বাণী আজও তেমনই মধুর, তেমনই উদাত্ত, তেমনই প্রাণভরা সর্ব্বশ্রান্তিহরা হইয়া মানব কণ্ঠে বিরাজ করিতেছে। রোগে, শোকে, দৈন্যে, দুর্দ্দিনে, দুঃখে, বিপদে, প্রবাসে মুখভরা বুকভরা মধুর 'মা' ডাক একইভাবে মানবহৃদয়ে শান্তির ধারা আনিয়া দিতেছে। শত অপরাধে অপরাধী হইয়া সন্তান একবার গদ্গদ্স্বরে মা বলিয়া ডাকিলে জননী তাহার শত অপরাধ মার্জ্জনা না করিয়া পারেন না। এই মধুর 'মা' ডাকের অন্তরালে কি সীমাহীন মাধুর্য্য, কি অমৃতের অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা নিহীত যে, মা একবার সন্তানের মুখে এই ডাক শুনিলে মুহূর্ত্তের তরেও আপনার শত দুঃখ-বিপদ ভুলিয়া যান। সন্তানের মুখে অর্দ্ধোচ্চারিত 'মা' ডাক বুঝি বা মায়ের নিকট কোন এক অমরাপুরীর চিরশান্তির বার্ত্তা বহিয়া লইয়া আসে। হৃদয় খুলিয়া প্রাণ ভরিয়া

'মা' ডাক।

অকপটে 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিতে পারিলে বোধকরি বা সৃষ্টিপ্রসবিনী জগন্মাতা জগদ্ধাত্রীর করুণাকেও সহজে আকর্ষণ করা সম্ভব হয়। এ ডাকে অরুচি নাই, অবসাদ নাই, সঙ্কোচ নাই, লজ্জা নাই।

বিবাহের পর চঞ্চল যৌবনতরঙ্গলীলান্বিত কয়টী বৎসর স্বামীর সঙ্গে সংসার পথে অগ্রসর হইয়া স্ত্রী আজ সেই মাতৃত্বের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। আসন্ন মাতৃত্বের গৌরব, আনন্দ, আশায় স্ত্রীর দেহমন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। নারীত্বের চরম বিকাশ মাতৃত্বের আভাসে নিজের দেহের প্রতি চাহিয়া স্ত্রী আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কঠিন ও বৃহত্তর কর্ত্তব্যের সম্মুখে তিনি অগ্রসর হইতেছেন। সেই কর্ত্তব্যকে সর্ব্বাঙ্গীনভাবে সুসম্পন্ন করিতে পারিলে তবেই মাতৃত্ব অক্ষুণ্ণ গৌরবে গৌরবমণ্ডিত হইয়া উঠিবে, আর না পারিলে জীবনে দুঃখের, অনুশোচনার অবধি থাকিবে না।

আসন্ন মাতৃত্ব।

মহাশক্তির অংশরূপিণী হইয়া যাঁহার ইঙ্গিতে যাঁহার সৃষ্টিরক্ষার্থে মুর্ত্তিমতী সন্তানবাৎসল্যরূপিণী নারী সংসারে আসিয়াছেন, যাঁহার মঙ্গলেচ্ছায় আজ নারী জীবনের চরম ও পরম আকাঙ্খিত মাতৃত্ব লাভ করিতে চলিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া লইবেন।

আর স্বামী নব যুবতী প্রেমময়ী ভার্য্যা লইয়া এতদিন সংসারপথে বিচরণ করিয়াছেন, আজ কি কঠোর কর্ত্তব্যের সম্মুখে তিনি অগ্রসর হইতেছেন, তাহা তিনিও বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। পুরুষ এতদিন স্নেহময় স্বামী ছিলেন, নিজের স্ত্রী, পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নী লইয়াই তাঁহার সংসার ছিল, আজ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দেহমনকে পুলকিত করিয়া

বংশের যে দুলাল তাহার আগমনবার্ত্তা পাঠাইয়াছে, স্বামী সাগ্রহে তাহার আগমনের সকল পথ সুগম করিয়া দিবেন। সম্মুখের সকল বাধা-বিঘ্ন দূর করিয়া যাহাতে তাহাকে সুশৃঙ্খলার সহিত সানন্দে আগাইয়া লইয়া আসিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। যদি সুস্থ, সবল, সুশ্রী, সুগঠিত সন্তানের আশা থাকে, তবে সর্ব্বাগ্রে সেই সন্তানের জননীর প্রতি তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি দিবেন, অন্যথায় সকল আশাই আকাশকুসুমে মিলাইয়া যাইবে।

গর্ভাবস্থায় স্ত্রী যাহাতে মানসিক শান্তি, পরিমিত বিশ্রাম ও সহজ পাচ্য পুষ্টিকর বলকারী আহার্য্য পান, স্বামী তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন। গর্ভবতীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপরই গর্ভস্থ শিশুর স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থা পূর্ণ মাত্রায় নির্ভর করে। এই সময় সর্ব্ব প্রকার গুরু শ্রমের কার্য্য হইতে স্ত্রীকে অব্যাহতি দিতে হইবে। স্বল্প শ্রম ও সানন্দ বিশ্রাম এ সময় বিশেষ হিতকর।

গর্ভাবস্থায় স্বাস্থ্য ও শান্তি।

স্ত্রী কদাচ সর্ব্বদা অলসভাবে বসিয়া বা শুইয়া থাকিবেন না, তাহাতে প্রসবকালে বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এই সময় আলস্য, অরুচি ও সকল কার্য্যে অনিচ্ছা অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। গর্ভস্থ শিশুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহা সর্ব্বথা পরিহার করিয়া চলিতে হইবে। মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিবেন, কোন কারণেই মনে ক্ষোভ, দুঃখ, ভয় বা অবসাদ আসিতে দিবেন না। লজ্জা বা সঙ্কোচে এ সময় নিজের স্বাস্থ্যকে কদাপি অবহেলা করিয়া রুগ্ন, দুর্ব্বল বা বিকলাঙ্গ শিশুর জননী হইয়া জীবনব্যাপী অনুতাপ ও দুঃখকে সঙ্গের সাথী করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য নহে।

গর্ভাবস্থায় যদি কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকে, প্রস্রাব কমিয়া যায়, সর্ব্বক্ষণ মাথাধরা বা মাথাঘোরা থাকে, উঠিতে বসিতে চক্ষে ঝাপ্‌সা দেখা যায়, পেটে কোনরূপ ব্যথা হয়, চলিতে ফিরিতে হাঁফ ধরে, সুনিদ্রা না হয়, অবসন্ন ভাব আসে, হাত, পা বা মুখ ফুলিয়া যায়, শরীর রক্তহীন ও অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, বা অন্য কোন কারণে শারীরিক বা মানসিক অবসাদ আসে, পেটে ভ্রূণের নড়াচড়া অনুভূত না হয়, তবে লজ্জা বা সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া তাহা তৎক্ষণাৎ স্বামীর নিকট বা স্বামী উপস্থিত না থাকিলে অপর কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ার নিকট সবিস্তারে বিবৃত করিয়া বলা কর্ত্তব্য। কদাচ লজ্জা বা সঙ্কোচে ইহার কোন একটী লক্ষণও গোপন করিয়া নিজের ও গর্ভস্থ শিশুর সমূহ বিপদ ডাকিয়া আনা উচিত নহে।

গর্ভাবস্থায় খারাপ লক্ষণ।

স্বামী সর্ব্বদা সস্নেহে গর্ভবতী স্ত্রীর সকল প্রকার তত্ত্বাবধান করিবেন। তাঁহার শারীরিক বা মানসিক কোন প্রকার অস্বাভাবিক লক্ষণ বুঝিতে পারিলে অবিলম্বে সাগ্রহে তাঁহার সকল তথ্য একে একে প্রশ্ন করিয়া নিজে অবগত হইবেন এবং প্রয়োজন বোধ করিলে তাহা চিকিৎসকের গোচর করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। কদাপি তাঁহার প্রতি উদাসীন থাকিবেন না এবং অবহেলায় তাঁহার কোন কথা অগ্রাহ্য করিবেন না। স্বামী নিজের সর্ব্ব প্রকার চঞ্চলতা ও উত্তেজনা সর্ব্বতোভাবে সংযত করিয়া স্ত্রীর যথাসাধ্য যত্ন লইবেন। উত্তেজনা বা কোনরূপ অতিরিক্ত লিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার দৈহিক বা মানসিক ক্লেশ উৎপাদন কিছুতেই করিবেন না। যাঁহার দেহ-মন একান্ত ভাবে স্বামীর ভোগের জন্যই

স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় স্বামীর কর্ত্তব্য।

তিনি নিবেদন করিয়া দিয়াছেন, স্বামীই জীবনব্যাপী যাহা ভোগ করিবার একমাত্র অবিসংবাদী অধিকারী, অসময়ে বা অনুপযুক্ত অবস্থায় ক্ষণিক সুখ বা উত্তেজনার মোহে কদাচ তাহা নষ্ট করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। সংযম ও বিবেচনার সহিত তাহা ভোগ করিলে আজীবন এক ভাবে চলা সম্ভব হইবে।

গর্ভাবস্থায় সর্ব্বদা স্ত্রীকে প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সৎ গ্রন্থাদি পাঠ, সদালাপ, নয়নানন্দদায়ক দৃশ্যাদি দর্শন, প্রত্যুষে ও দিনান্তে মুক্ত প্রান্তরে বা বিস্তৃত উদ্যানে অন্ততঃ উন্মুক্ত ছাদে ভ্রমণাদি দ্বারা তাঁহার মন ও দেহকে সবল ও সুস্থ রাখিতে সর্ব্বদা সহায়তা করিতে হইবে। স্বামী প্রতিদিন তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয়ক, ভগবান বিষয়ক আলোচনা করিবেন। তাঁহার মন যাহাতে কোন প্রকারেই কোনরূপ উত্তেজক, হীন বা জঘন্য কার্য্যের চিন্তায় মগ্ন না হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সম্ভব হইলে সংসারের সকল প্রকার অতিরিক্ত শ্রমসাধ্য কার্য্য করিবার জন্য পৃথক লোকের ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্বামী নিজে সংসারের সকল কাজে সাধ্যমত স্ত্রীকে সাহায্য করিয়া তাঁহার গুরু শ্রম লাঘব করিবার চেষ্টা করিবেন।

গর্ভাবস্থায় অনুকূল ব্যবস্থা।

প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় পবিত্র মনে শুদ্ধ বস্ত্রে বিরলে বসিয়া গর্ভবতী স্ত্রী একান্তে ভগবানের প্রার্থনা করিয়া বলিবেন, প্রভু, তোমার আদেশে সংসারে আসিয়াছি, তোমারই ইচ্ছায় স্বামী-স্ত্রী একত্র মিলিত হইয়াছি, তোমারই ইঙ্গিতে আজ আমি 'মা' হইতে চলিয়াছি। আমার আনন্দের গর্ব্ব অক্ষুণ্ণ রাখিও,

গর্ভাবস্থায় ভগবানের প্রার্থনা।

আমার মাতৃত্ব সাফল্য মণ্ডিত করিও, সুস্থ, বলিষ্ঠ সন্তান কোলে লইয়া আমার নারীজীবন সার্থক করিতে দিও, দয়াময়।

ভগবানের চরণে মতি রাখিয়া সৎপথে সংযত ভাবে চলিলে অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যে নির্ব্বিঘ্নে গর্ভাবস্থার সমস্ত বিপদ, আপদ বিদূরিত হইয়া যাইবে, সকল আশাই মুকুলিত হইয়া ফুলে ফলে সুশোভিত হইয়া উঠিবে।

গর্ভাবস্থায় স্ত্রী যাহাতে না চাহিতেই পুষ্টিকর ও রুচিকর সহজ পাচ্য সুখাদ্য পাইতে পারেন, সে ব্যবস্থা স্বামী অবশ্যই যথাসাধ্য করিয়া দিবেন।

গর্ভাবস্থায় খাদ্য।

ঐ খাদ্যের উপর গর্ভবতী স্ত্রী ও গর্ভস্থ সন্তানের জীবন ও স্বাস্থ্য অনেকাংশে নির্ভর করে। এই সময়ে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ, সুখাদ্য ফলমূল এবং সম্ভব হইলে প্রতিদিন পরিমাণ মত ছানা, মাখন, সন্দেশ, দধি ইত্যাদি স্ত্রীকে খাইতে দিয়া তাঁহার দেহে বলাধান হইবার ও গর্ভস্থ শিশুর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার সহায়তা করা একান্ত কর্ত্তব্য। যাঁহাদের সেরূপ সামর্থ্য নাই, তাঁহারা প্রতিদিন গর্ভবতী স্ত্রীর জন্য অঙ্কুরিত ছোলা ও কিছু দুগ্ধের ব্যবস্থা অবশ্যই করিবেন। অঙ্কুরিত ছোলা অল্প ব্যয়ে পুষ্টিকর খাদ্য, ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে। ইচ্ছা করিলে ইহা ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেই যোগাড় করিতে পারেন।

আমাদের সন্তানাদি দিন দিন হীনস্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছে ও শিশুমৃত্যু, প্রসূতিমৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে বলিয়া আমরা মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকি কিন্তু তাহার প্রতিকারের কোন উপায়ই করি না। চিন্তা ও চেষ্টা করিলে অতি অল্পব্যয়েও পুষ্টিকর খাদ্য অনেকাংশে আমরা যোগাড় করিতে পারি

কিন্তু স্ত্রীজাতির প্রতি আমাদের অবহেলা ও উদাসীনতার জন্য আমরা গর্ভাবস্থায়ও তাঁহার কোন যত্ন লই না। আমাদেরই সংসারের জন্য অতিরিক্ত শ্রম করিয়া ও পরিমিত আহার্য্যের অভাবে দুর্ব্বল, ভগ্নস্বাস্থ্য, ব্যাধিপীড়িতা হইয়া প্রতি বৎসর আমাদেরই কত বধূ যে গর্ভধারণ ও প্রসবের ক্লেশ সহিতে না পারিয়া, কেহ বা গর্ভস্থ শিশু গর্ভে লইয়া, কেহ বা প্রসবান্তে নানা কষ্ট ভোগ করিয়া অকালে নীরবে মানব-লীলা সাঙ্গ করিয়া চলিয়া যান তাহার ইয়ত্তা নাই। নারী আমাদের দেশে সুলভ, নারীর সুখ, দুঃখ, স্বাস্থ্য, সম্পদ আমাদের চিন্তা ও গণনার বহির্ভূত, তাই আমরা সে কথা ভাবিয়াও দেখি না। তাঁহারা স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা, কষ্টসহিষ্ণু, নিরীহ, তাই তাঁহারা সকল দুঃখ-কষ্টের বোঝা নীরবে বহিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যান, তাঁহাদের দুঃখের কথা, বেদনার কাহিনী, অভাব, অভিযোগ, ক্ষুধা, ব্যাধির তাড়না আমাদিগকে জানিতেও দেন না।

গর্ভবতী স্ত্রীর স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলার পরিণাম।

গর্ভাবস্থায় স্ত্রী কদাপি অখাদ্য বা অতিরিক্ত গুরু ভোজন করিবেন না। মাংস, ডিম ও অন্যান্য সকল প্রকার উত্তেজক আহার যথাসম্ভব বর্জ্জন করিয়া চলিবেন। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন, তাঁহার আহার্য্যের প্রয়োজনীয় অংশ শিশু তাঁহারই দেহ হইতে গ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব যে খাদ্য খাইলে কোনরূপ উত্তেজনা না হইয়া দেহের পুষ্টি বৃদ্ধি হয় সেইরূপ খাদ্য সর্ব্বদা খাইবেন। প্রতিদিন একই সময়ে স্নান ও আহার করিবেন, কদাচ তাহার অন্যথা করিয়া আপনার শিশুর দেহ পুষ্ট হইতে বাধা প্রদান করিবেন না। উচ্চৈঃস্বরে হাস্য বা রোদন করিবেন না।

গর্ভাবস্থায় অহিত ও হিত আচরণ।

দিবানিদ্রা কদাপি যাইবেন না। রাত্রিতে আহার করিয়াই নিদ্রা যাইবেন না, দুই এক ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া নিদ্রা যাইবেন। গৃহের সমস্ত দরজা, জানালা খুলিয়া রাখিয়া নিদ্রা যাইবেন, প্রয়োজন বোধ করিলে মোটা চাদরে গা ঢাকা দিয়া রাখিবেন। প্রতিদিন একই সময়ে নিদ্রা যাইবেন এবং প্রত্যূষে ভগবানের নাম লইয়া গাত্রোত্থান করিবেন। কোনরূপ কুকথা বা কুচিন্তা মনেও স্থান দিবেন না, সর্ব্বপ্রকার বিলাস-ব্যসন বিবর্জ্জিত অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিবেন। গর্ভাবস্থায় শরীর সর্ব্বদা কর্ম্মঠ রাখিবার চেষ্টা করিবেন কিন্তু গুরুশ্রমসাধ্য কোন কার্য্য করিবার চেষ্টা করিবেন না। কোন কারণে ক্রোধ, হিংসা বা উত্তেজনা প্রকাশ করিবেন না, কাহারো প্রতি মনেমনে আক্রোশ বা বিরক্তি পোষণ করিবেন না। দেবতা, স্বামী, গুরুর প্রতি ভক্তিমতী এবং স্নেহভাজন ও মুখাপেক্ষীদের প্রতি স্নেহবতী হইয়া নির্ব্বিরোধ অনুদ্বিগ্ন অবস্থায় সদা প্রফুল্লমনে কালাতিপাত করিবেন।

গর্ভবতীর মানসিক অবস্থা।

পেটে যাহাতে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বা অতিরিক্ত গরম না লাগে সেইরূপ বস্ত্র ব্যবহার করাই গর্ভবতীর কর্ত্তব্য। বিলাসিতাচ্ছলে কদাপি ফিন্‌ফিনে শাড়ী পরিয়া পেটে ঠাণ্ডা লাগাইবেন না। সৌন্দর্য্য রক্ষা বা অভ্যাসবশতঃ গর্ভাবস্থায় কখনো কোমরে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া কাপড় পরিবেন না। কাপড়, সায়া ইত্যাদি বেশ ঢিলাভাবে ব্যবহার করিবেন, যাহাতে গর্ভস্থ শিশু সহজভাবে নড়াচড়া করিতে পারে, খর্ব্ব, বিকলাঙ্গ না হয় বা প্রসবের সময় প্রসূতি কষ্ট না পান।

গর্ভাবস্থায় বস্ত্রাদি ব্যবহার।

গর্ভাবস্থায় কোন ভারী বস্তু তুলিতে চেষ্টা করিবেন না। উঁচু স্থান

হইতে সহসা সবেগে নীচে নামিবেন না। নীচু স্থান হইতে পুনঃ পুনঃ উপরে উঠিবার চেষ্টা করিবেন না, কোন উঁচু বস্তুর উপর দাঁড়াইয়া ঘরের ঝুল, মাকড়সা ঝাড়িতে চেষ্টা করিবেন না।

কাহারো উপর ক্রোধ বা অভিমান করিয়া অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে কদাপি থাকিবেন না। মনে রাখিবেন, গর্ভিণীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আদরের সোনার 'খোকন' বা 'খুকুও' অনাহারে রহিল। আমাদের দেশের

গর্ভাবস্থায় অনশন।

অনেক স্ত্রীলোকই পরিবারের কাহারো নিকট কটু কথা শুনিলে বা অন্য কোন কারণে মনঃকষ্টের কারণ হইলে মনের দুঃখে অনাহারে দিবা বা রাত্রি যাপন করেন। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত সংসারে তাঁহারাই রাঁধেন বাড়েন, সকলকে আহার করাইয়া লইয়া সকল কাজ সারিয়া তবে তাঁহাদের আহারের পালা। তাঁহারা আহার করিবার সময় পরিমিত আহার্য্য ছিল কি না, তাঁহারা আহার করিলেন কি না, এ খোঁজ-খবর কেহ বড় একটা করেন না, কাজেই তিনি যে মনের কষ্টে অনাহারে রহিলেন এ খবরও কেহ রাখিলেন না। যদি দৈবাৎ কোন দিন ধরা পড়িয়া যান, 'মাথাধরা', 'অক্ষুধা' বা এমনই একটা কোন ছুতা ধরিয়া আহার করিবার দায় হইতে মুক্তি পান এবং পরদিন আবার অলস, দুর্ব্বল, ভগ্ন, ক্লান্ত দেহমন লইয়া তাঁহাকে সংসারের কাজে ঢুকিতে হয়। তিনি খান বা না খান, কাজ তাঁহাকে করিতেই হইবে। তাঁহার কার্য্যের সঙ্গেই অধিকাংশস্থলে আমাদের সম্বন্ধ, তাঁহার আহার, বিহার বা স্বাস্থ্যের সঙ্গে নহে। ইহা কত বড় নির্ম্মম কৃতঘ্নতা ভাবিয়া দেখিতে হয়। স্বামী তাঁহাকে দুইটা মিষ্টি কথায় বুঝাইয়া দুই বার সাধিলেই হয়তো তিনি খাইতেন, আহার্য্যের প্রতি এইরূপ

অবহেলার অপকারিতা বুঝাইয়া বলিলেই তিনি এ কদভ্যাস ত্যাগ করিতেন, শ্বাশুড়ী, জা-ননদরা ভাল মুখে একটু পীড়াপীড়ি করিলেই হয়তো তিনি আহার করেন কিন্তু কে তাহার খোঁজ রাখে? কে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া মনের দুঃখ বুঝিবে, তাঁহার ক্ষুধার জ্বালা উপলব্ধি করিবে? আমি মালক্ষ্মীদের বলি, যে গৃহে সত্যই তাঁহাদের দুঃখ বুঝিবার কেহ নাই, উদয়াস্ত খাটিয়া প্রাণান্ত হইয়াও যেখানে তাঁহারা গঞ্জনা, লাঞ্ছনাভাগিনী, সেখানে তাঁহারা অনাহারে না থাকিয়া আপন দুঃখ, কষ্ট, বেদনার বোঝা যেন দয়াময় ভগবানের চরণে চক্ষের জলের সঙ্গে নিবেদন করিয়া দেন, কিছুতেই যেন অনাহারে না থাকেন। ভগবান তাঁহাকে নারী করিয়া নানারূপ কঠোর কর্ত্তব্যের ভার মাথায় দিয়া সংসারে পাঠাইয়াছেন, অনাহারে থাকিয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ করিলে তাঁহার আদেশ পালন করিবার শক্তি খর্ব্ব হইয়া যাইবে, কাজেই মানুষের উপর রাগ, অভিমান করিয়া আপনাকে ক্ষয় করিয়া ভগবানের আদেশপালনে অক্ষমতা জন্মান অন্যায়। তিনি বড় দয়াময়, সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে তিনি আমাদের সাথে সাথেই থাকেন, সংসারে পাঠাইয়াই তিনি আমাদিগকে ভুলিয়া নাই। যত দুঃখ, যত কষ্ট যতদিক হইতে আসুক না কেন, যদি প্রাণ খুলিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতে পারা যায়, ঠাকুর, তুমি কষ্ট দিয়া আমাকে পরীক্ষা করিতেছ আমি সহিতে পারি কিনা, আমি তোমার নাম লইয়া সকলই সহিব, দয়াময়, তুমি শুধু আমার সঙ্গে থাকিও। প্রাণের দেবতা, মানুষের দেওয়া দুঃখকে আমি ডরাই না, প্রভু, তোমাকে ভুলিয়া যেন আমি দুঃখ না পাই।

দুঃখ দিয়াই তাঁহার পরীক্ষা।

রাগ, অভিমান, দুঃখ চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইবে। তিনি তাঁহার অদৃশ্য হস্তে অন্তরের সকল বেদনা মুছিয়া লইয়া হৃদয়ে বল দিবেন।

গর্ভে সন্তানধারণ ভগবানের এক অতি নিগূঢ় সৃষ্টিরহস্য; ইহাতে লজ্জা বা ক্ষোভের কিছুই নাই। সেই সন্তান যাহাতে সুস্থ, বলিষ্ঠ হয় তাহা করাই কর্ত্তব্য। লজ্জা, সঙ্কোচ, অভ্যাস, উত্তেজনা, প্ররোচনা বা জেদের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা মহাপাপ। নিজের সর্ব্ব প্রকার দৈহিক ও মানসিক ব্যতিক্রম, পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন সম্বন্ধে অসঙ্কোচে স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করা কর্ত্তব্য, তাহাতে লাভ বৈ লোকসান হইবে না।

প্রসবকাল ক্রমশঃ আসন্ন হইয়া আসিলে, স্ত্রীর সাত বা আট মাস গর্ভসময়ে স্বামী আঁতুড় ঘরের ব্যবস্থা করিবেন। যদি পাকা বাড়ী থাকে, তবে স্বচ্ছন্দে আলোবাতাস খেলিতে পারে এমন একটী পরিসর, স্বাস্থ্যকর কক্ষ আঁতুড় ঘরের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া পূর্ব্বাহ্ণেই তাহাতে চুণকাম করাইয়া মেজে মাজিয়া, ঘসিয়া, ধোয়াইয়া, পরিষ্কার করাইয়া রাখিবেন। সে

আঁতুড়ের সুব্যবস্থা।

ঘরের আশেপাশে পায়খানা, নর্দ্দমা, জঙ্গল বা কোনপ্রকার দূষিত, গলিত আবর্জ্জনা যাহাতে না থাকে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। কোন পূজা উপলক্ষে গৃহমণ্ডপ যেমন করিয়া, ঝাড়িয়া মুছিয়া, ধুইয়া ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে করিয়া দেবদেবীর আগমনের প্রতীক্ষায় থাকিতে হয়, আঁতুড় ঘর খানিও তেমনই সুমার্জ্জিত ও সুপরিষ্কৃত করিয়া বংশের দুলালের আগমন প্রতীক্ষায় তেমনই প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন। যাঁহাদের পাকা গৃহ নাই, বা স্বাস্থ্যসম্মত স্থায়ী আঁতুড় ঘর নাই, তাঁহারা প্রসবের অন্ততঃ

তিনমাস পূর্ব্বে গৃহের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থানে উপযুক্ত পরিসর আঁতুড় ঘর তুলিবার ব্যবস্থা করিবেন। সে ঘরের মেজে যাহাতে বেশ উঁচু ও শুষ্ক হয়, ঘরে স্বচ্ছন্দে আলোবাতাস খেলিতে পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, জীবের জীবনধারণোপযোগী বিধাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান আলোবাতাস। কোন জীবই ইহা ব্যতিরেকে বাঁচিতে পারে না। বাতাসের অভাবে মানুষ সদ্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়। একদিন সূর্য্য মেঘে ঢাকা থাকিলে দৈহিক ও মানসিক অবস্থার কিরূপ ব্যতিক্রম হয় তাহাও সকলেরই জানা আছে। এই দুইটী বস্তু সকলের পক্ষেই সমান প্রয়োজনীয়। প্রসূতি নারী বলিয়া এবং সদ্যপ্রসূত সন্তান নিতান্ত শিশু বলিয়া আলোবাতাস তাহাদের পক্ষে এতটুকুও কম প্রয়োজনীয় নহে। বরঞ্চ প্রসূতি প্রসবান্তে পক্ষান্তরে রুগ্না বলিয়া ও নবজাত শিশু একজন যুবক বা যুবতী অপেক্ষা ক্ষীণপ্রাণ বলিয়া তাহাদের পক্ষে এ দুইটী বস্তুরই অত্যধিক প্রয়োজন। আমরা অজ্ঞতাবশতঃ তাহা ভুলিয়া গিয়া দেশাচার বা লোকাচার সম্মত আলোবাতাসস্পর্শলেশহীন একখানি স্যাঁৎস্যাতে কুঁড়ে ঘর তুলিয়া দিয়া শিশু ও প্রসূতি হত্যার মহাপাপে নিমগ্ন হই এবং ঘোরতর অদৃষ্টবাদী ও দুর্ব্বল বলিয়া আপন অদৃষ্ট ও দৈবের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া দিয়া পুনঃ পুনঃ একই অপরাধ করি।

আমরা সভ্যতার গর্ব্ব করি, স্বাধীনতার সংগ্রাম করি কিন্তু স্বাধীন ও সভ্য জাতিসমূহের সমস্ত সৎগুণ আমরা বিজাতীয়, অননুকরণীয় বা অপ্রয়োজনীয় বোধে উপেক্ষা করি এবং তাঁহাদের সমস্ত দোষ আমরা অতি অনায়াসে অভ্যাস করিয়া লই।

তাঁহারা প্রতিটী প্রসূতি ও প্রতিটী শিশুকে জাতীয় সম্পত্তি বিবেচনা করেন এবং তাঁহাদের সকল প্রকার রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা করিয়া থাকেন। একটী প্রসূতি বা একটী শিশুমৃত্যুকে তাঁহারা মস্ত বড় জাতীয় ক্ষতির কারণ মনে করেন। তাঁহারা স্বদেশ রক্ষার জন্য শিশু পালন ও গঠন করেন। আমরা প্রসূতিকে অস্পৃশ্যা মনে করি, আঁতুড়কে অপবিত্র জ্ঞানে স্পর্শ করি না, তাহার কোন খোঁজ-খবর রাখিনা, দূরে দূরে থাকি। পুত্রসন্তান জন্মিলে বার্দ্ধক্যে ডালভাতের সংস্থান করিয়া দিতে পারিবে আশায় উৎফুল্ল হইয়া থাকি এবং কন্যাসন্তান জন্মিলে তাহার বিবাহাদির কথা স্মরণ করিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি। আমরা স্বাধীনতা-কামী, অথচ দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ যাহারা তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের আশা ও ধারণা যেরূপ নীচ স্বার্থপ্রণোদিত, তাহাদের জননীদের প্রতি ব্যবহারও সেইরূপ জঘন্য। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় দুর্গতি আর আমাদের কি হইবে।

প্রতিটী শিশু জাতীয় সম্পত্তি।

যে সন্তানকে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসেন, যাহাকে প্রায় সুদীর্ঘ দশ মাস নিজের দেহের রসরক্ত, মেদমজ্জা ভাগ করিয়া দিয়া স্ত্রী জঠরে বহন করেন, প্রসবের দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করেন, স্বামীর ত্রুটী, অজ্ঞতা বা অসাবধানতা, লোকাচার অথবা দেশাচারের জন্য যদি অকালে তাহার প্রাণ বিয়োগ ঘটে, সেজন্য স্বামীর অদৃষ্ট দায়ী হইবে না, দায়ী হইবেন স্বামী নিজে। মনে করিতে হইবে, স্বামী নিজে নিজের ও প্রিয়তমা ভার্য্যার সোনার পুতুলকে স্বহস্তে মরণের বুকে তুলিয়া দিলেন। সর্ব্বপ্রকার স্বাস্থ্যসম্মত বিধিব্যবস্থা করা সত্ত্বেও যদি তাহার মৃত্যু হয়,

তবে সেজন্য দায়ী স্বামী নন, দায়ী দুরদৃষ্ট। আপন আপন কর্ম্ম দ্বারাই অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত। কর্ম্মে উদাসীন হইয়া অবহেলা করিয়া চলিতে থাকিলে অদৃষ্ট কোনদিনই প্রসন্ন হ'ননা, হইতে পারেন না। কর্ম্ম করিবার শক্তি আমাদিগকে দিতে ভগবান কার্পণ্য করেন নাই।

পল্লীগ্রামের আঁতুড় ঘর দেখিলে মনে আতঙ্কের উদ্রেক হয়। তাহার মধ্যে প্রসূতি বা শিশু বাঁচিয়া থাকাই এক মহা আশ্চর্য্য ব্যাপার।

আঁতুড়ের কুব্যবস্থা।

কোন কোন গৃহে হয়তো দুই তিনখানা টীনের ছোট্ট চালা তুলিয়া, খড়, বিচালী বা পাঁকাটির বেড়া দিয়া, কোন স্থানে বা চাটাই, দরমা, পাঁকাটিরই চালা ও বেড়া দিয়া, আলোবাতাস প্রবেশের সকল পথ রুদ্ধ করিয়া, প্রসূতি অস্পৃশ্যার ন্যায় নবজাত শিশু সহ তাহারই মধ্যে দিনাতিপাত করেন। গ্রীষ্মকালে প্রখর রৌদ্রতাপে তাহার মধ্যে অগ্নিবৃষ্টি হয়, আবার শীতকালে শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহারই মধ্যে আগুন জ্বালিয়া বায়ু প্রবেশের ও ধূম নির্গত হইবার একটীমাত্র পথ অপ্রশস্ত দরজা বন্ধ করিয়া প্রসূতি শিশু সহ জীবন্মৃতার ন্যায় তাহারই মধ্যে পড়িয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে বাড়ীর কর্ত্তাকে কিছু বলিলে তাঁহারা প্রায়ই জবাব দিয়া থাকেন, আমাদের চিরকাল এই ভাবে চলিতেছে। কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না, সে চিরকাল বহুকাল হইল দেশ হইতে বিদায় লইয়াছে। যেকালে মানুষ শতবর্ষ পরমায়ু লাভ করিয়াও ভগ্নস্বাস্থ্য

সেকাল ও একাল।

হইতেন না, যেকালে মানুষ সবল, সুস্থ, পরিশ্রমী, গৌর, দীর্ঘকায় ছিলেন, যেকালে মানুষের জীবনী শক্তি প্রবল ছিল, জরা, ব্যাধি সহসা আক্রমণ করিতে পারিত না, যেকালে

দেশে অকালমৃত্যু, রোগ, শোক, দুঃখ, দৈন্য, হাহাকার এত ছিল না, যেকালে মানুষের মুখে হাসি ছিল, দেহে স্বাস্থ্যবল ছিল, প্রাণে আনন্দ ছিল, গোলায় ধান ছিল, গোয়ালে দুগ্ধবতী সুস্থ গাভী ছিল, পুকুরে মাছ ছিল, যেকালে মানুষের ধর্ম্ম ছিল, ন্যায়, নিষ্ঠা, সততা, ক্ষমা, ত্যাগ, সৌজন্য, দান, দয়া, দাক্ষিণ্য ছিল, বহু পুরুষ চলিলেও যেকালে মানুষ স্বচ্ছন্দে একান্নবর্ত্তী পরিবারে বাস করিতেন, যেকালে মানুষ বিলাসী ছিলেন না, অন্যায়, অধর্ম্ম, অসত্যাশ্রয়ী ছিলেন না, বিদেশী বিলাস ব্যসনের পেছনে যেকালে ঘরের অর্থ স্রোতের ন্যায় যাইয়া বিদেশীর ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিত না, যেকালে মানুষ স্বাস্থ্যসবল, গর্ব্বিত দেহে ন্যায়, ধর্ম্ম ও সত্যপথে অকুতোভয়ে বিচরণ করিতেন, সেকাল বহুকাল হইল দেশ হইতে চির বিদায় লইয়াছে। এখন আমরা স্বাস্থ্য-হীন, খর্ব্বাকৃতি, অসংযমী, বিলাসী, দুর্ব্বল, রুগ্ন, অক্ষম, অশক্ত, দাসত্বপ্রিয়, সত্যহীন, ধর্ম্মহীন, ন্যায়, বিবেক, মনুষ্যত্বহীন, কাজেই সেকালের দোহাই দিলে তো আমাদের চলিবে না। বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া আমাদিগকে সকলই করিতে হইবে।

গর্ভবতীকে পিত্রালয়ে প্রেরণ।

আমাদের হিন্দু পরিবারে সেকাল হইতে একটী প্রথা আছে, গর্ভবতী স্ত্রীকে পিত্রালয়ে প্রেরণ। ইহা অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। যদি স্ত্রীর পিত্রালয়ে অবস্থা অতিশয় দরিদ্র না হয় এবং সেখানে প্রসূতির পরিচর্য্যার কোনরূপ বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা না থাকে, তবে গর্ভাবস্থায় পাঁচ হইতে সাত মাসের মধ্যে তাঁহাকে সেখানে পাঠানই ভাল। গর্ভাবস্থায় দূরবর্ত্তী স্থানে গমনাগমন অতিশয় আশঙ্কাজনক, সপ্তম মাসের পর কোন

ক্রমেই এরূপ করা উচিত নহে, তাহাতে যথেষ্ট বিপদপাতের ভয় থাকে। এইরূপ সময়ে রওনা হইয়া প্রসূতিকে লইয়া মধ্যপথে মহা বিপদে পড়িতে হইয়াছে, এরূপ ঘটনা আমি জানি। ইহাতে প্রসূতি ও প্রসূতের জীবনসংশয় হওয়া অসম্ভব নহে। পিতৃগৃহে প্রসূতি অবাধে চলাফেরা ও আহার বিহারের অনেকটা স্বাধীনতা পান, তাহাতে তাঁহার মানসিক ও শারীরিক অবস্থা ভাল থাকে। কিন্তু যদি পিত্রালয়ে স্ত্রীর যথোপযুক্ত ভরণপোষণ ও পরিচর্য্যার সম্ভাবনা না থাকে, তবে কিছুতেই তাঁহাকে সেখানে যাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, স্বামীর কাছে রাখাই উচিত এবং সংযতভাবে তাঁহার সঙ্গে ব্যবহার করা যুক্তিসম্মত।

গর্ভাবস্থায় যাতায়াতের বিপদ।

স্ত্রীর প্রসবকাল আসন্ন হইয়া আসিলে তাঁহার কাজকর্ম্ম প্রায় সকলই কমাইয়া দিয়া তাঁহাকে সানন্দ বিশ্রামে রাখা ও ভ্রমণ ইত্যাদি সুখকর ও অল্প শ্রমসাধ্য কার্য্যে ব্যাপৃত রাখা ভাল। এই সময় তাঁহার কোষ্ঠ ও প্রস্রাব রীতিমত পরিষ্কার থাকা উচিত। প্রয়োজন হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া চলা কর্ত্তব্য।

আসন্ন প্রসবকাল।

অনেকের ধারণা আছে যে, গর্ভাবস্থায় ঔষধপত্র ব্যবহার করা গর্ভিনীর পক্ষে অহিতকর। ইহা অতিশয় ভ্রমাত্মক। এই ভ্রমে পতিত হইয়া কদাচ স্ত্রীর উপযুক্ত চিকিৎসায় বিরত থাকা বা কু-চিকিৎসা করা অনুচিত। বিজ্ঞ চিকিৎসকের মতামত লইলে তিনিই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা দিবেন। যে শাস্ত্র বা বিদ্যায় নিজের অধিকার নাই, সেই শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ অপর কাহারো পরামর্শে সে শাস্ত্র বা বিদ্যার উপর অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়া

গর্ভাবস্থায় চিকিৎসা বিভ্রাট।

তাহার প্রতি উদাসীন থাকিতে নাই। প্রয়োজন হইলেই তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের সাহায্য লইতে হইবে।

বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে স্ত্রীর পূর্ণ গর্ভকালে স্বামী দূরবর্ত্তী কোন স্থানে যাইবেন না। কাজকর্ম্ম বা অন্য কোন কারণে কোথাও গেলে গন্তব্য স্থানের কথা বাড়ীতে বলিয়া যাইবেন, যাহাতে স্ত্রীর প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে বা কোন আকস্মিক বিপদপাত হইলে ছুটিয়া কেহ গিয়া খবর দিতে পারেন।

যদি প্রসববেদনা কোমর হইতে আরম্ভ হইয়া তলপেট বা তন্নিম্ন ভাগ পর্য্যন্ত যায়, সঙ্গে সঙ্গে পেট শক্ত হয়, কিছুকাল বেদনা থাকিয়া থামিয়া যায় ও সঙ্গে সঙ্গে পেট নরম হইয়া যায় ও পুনরায় বেদনা সুরু হয় এবং ক্রমশঃই বেদনা ঘন ঘন সজোরে বাড়িতে থাকে তবে প্রকৃত প্রসববেদনা সুরু হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সর্ব্বাগ্রে স্বামীর নিজের জানা সর্ব্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ দাই বা ধাত্রীর জন্য দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোক পাঠাইবেন। উদরাময় বা অন্য কোন গুরুতর উপসর্গ না থাকিলে এক আউন্স ক্যাষ্টর অয়েল ঈষদুষ্ণ জলের সহিত গর্ভিণীকে খাইতে দিতে হইবে। ইতিমধ্যে

প্রকৃত প্রসববেদনা।

ষ্টোভে বা উনুনে বড় এক প্যান বা গামলা পরিমিত জল গরম করিয়া বা করাইয়া ঢাকিয়া রাখিবেন। অপর একটী ছোট পাত্রে কিছু তুলা, শিশুর নাভি বাঁধিবার উপযুক্ত দুই গাছি মোটা ও নরম সূতা, কিছু পরিষ্কার ন্যাক্ড়া ও একখানি ধারাল কাঁচি তুলা জড়াইয়া আধ ঘণ্টা কাল ঢাকা অবস্থায় ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করিয়া সেই পাত্রে ঢাকা অবস্থায়ই নামাইয়া রাখিতে হইবে।

প্রসবের আয়োজন।

অনেক স্থলে বাঁশের চ্যাচ্ড়া দিয়া নাড়ী কাটার প্রথা ও যে সে সূতা দিয়া তাহা বাঁধিবার প্রথা আছে। ঐ সব চ্যাচ্ড়া বা সূতা শোধিত করিয়া না লওয়ায় তাহার সঙ্গে নানারূপ বিষাক্ত পদার্থ ও রোগের বীজাণু লাগিয়া থাকা সম্ভব। ইহার ফলে ধনুষ্টঙ্কার, নাভি পাকা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া বহু শিশু প্রাণত্যাগ করে। তথাপি আমরা রোগের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করি না, তাহার প্রতিকারের উপায় করি না, হিতাহিতবোধজ্ঞানহীন হইয়া গতানুগতিক প্রথানুসারে সকল কৰ্ম্ম সম্পন্ন করি এবং মন্দ ভাগ্যের উপর সকল দোষ চাপাইয়া দিয়া অজ্ঞানের ন্যায় হাহাকার করিয়া মরি।

অজ্ঞতায় শিশুমৃত্যু।

দাই বাড়ীতে আসিলেই তাহার মলিন বস্ত্র ত্যাগ করাইয়া একখানি পরিষ্কার বস্ত্র তাহাকে পরিতে দিবেন। নিজের হাতে তাহার দুই হাতের নখ কাটিয়া নখের ভিতরকার ময়লা বাহির করিয়া দিয়া গরম জল ও সাবান দিয়া তাহার দুইখানি হাত কনুই পৰ্য্যন্ত বেশ করিয়া ধোয়াইয়া দিতে হইবে। বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বেই তাহার ধূলা-কাদামাখা পা দু'খানিও যেন ধুইয়া লয়, তাহা দেখিতে হইবে।

দাইএর প্রতি কর্ত্তব্য।

প্রসবের উপযুক্ত সময়, অর্থাৎ প্রসববেদনা আরম্ভ হইবার সময় হইতে ২৪ ঘণ্টা বিনা প্রসবে উত্তীর্ণ না হইলে কদাচ দাইকে ব্যস্ত হইতে দিবেন না, বা স্বামী নিজে ব্যস্ত হইবেন না। অত্যন্ত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে বেদনার প্রকৃতি ও প্রসূতির শারীরিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

প্রসবকালে সহিষ্ণুতা।

প্রসবের কোনরূপ অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা দিলেও দাই যেন কদাপি তাহা প্রসূতি বা গৃহের অপর কোন স্ত্রীলোকের নিকট প্রকাশ না করে। সে বিষয়ে পূর্ব্বেই তাহাকে সতর্ক করিয়া দিতে হইবে। প্রসূতির নিকট বসিয়া কেহ কোন কথা লইয়া কদাপি যেন কানাকানি না করে, পরিচিতা বা অপরিচিতা কোন নারীর কষ্ট প্রসবের এবং শিশু ও প্রসূতির বিপদ বা মৃত্যু সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা ভ্রমেও না করে। সর্ব্বদা প্রসূতিকে সাহস দিতে হইবে এবং তাঁহার সম্মুখে সুখপ্রসবের গল্প করিতে হইবে।

জোলাপ লইয়া প্রসূতির দাস্ত হইবার খুব সম্ভব। আঁতুড় ঘরে মলমূত্র ত্যাগের পাত্রের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। প্রসূতি মলমূত্র ত্যাগ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা আঁতুড় ঘর হইতে বাহিরে ফেলিয়া দিতে হইবে এবং যে ফেলিবে সে সাবান দিয়া হাত বিশেষ পরিষ্কার করিয়া না ধুইয়া কদাপি আঁতুড় ঘরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। দাই পরিষ্কার হাতে কোন মলিন ও নোংরা বস্ত্র বা ন্যাক্ড়া অথবা অশুচি কোন দ্রব্য স্পর্শ করিলে পুনরায় তাহার হাত ধোয়াইয়া লইতে হইবে। অনেক স্থানে দেখিয়াছি, গৃহের যত ছেঁড়া, নোংরা ও ব্যহারের অনুপযুক্ত বস্ত্রাদি আঁতুড়ে ব্যবহারার্থ দেওয়া হয়। আঁতুড়ের বস্ত্রাদি যখন আর গৃহে ব্যবহার করা চলিবে না তখন অব্যবহার্য্য বস্ত্রাদি নষ্ট হোক, এই ধারণা হইতেই ঐরূপ করা হয়। ছেঁড়া কাপড় বা ন্যাক্ড়া দেওয়া দোষের নহে, মলিন ও নোংরা বহু পুরাতন জীর্ণ বা দুর্গন্ধযুক্ত বস্ত্রাদি দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়, তাহা কদাপি দিতে নাই। ঐ সব মলিন বস্ত্র

আঁতুড়ে ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদি।

আশ্রয় করিয়া নানা প্রকার ব্যাধির বীজাণু বংশ বৃদ্ধি করে, সুযোগ পাইয়া নানাসূত্রে তাহারা প্রসূতি ও শিশুকে আক্রমণ করিতে প্রবল চেষ্টা করে। ছেঁড়া বস্ত্রাদি দিলেও তাহা পূর্ব্বাহ্নে সোডার জলে সিদ্ধ করিয়া পরিষ্কার করিয়া আবৃত স্থানে রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, যাহাতে প্রয়োজন মত অনায়াসে তাহা আঁতুড়ে ব্যবহার করা চলে।

কোন কারণে কোন অবস্থাতেই অশিক্ষিতা গ্রাম্য দাইকে সন্তান বা জরায়ুর অবস্থা হাত দিয়া পরীক্ষা করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

অশিক্ষিতা গ্রাম্য দাই।

অশিক্ষিতা গ্রাম্য দাইরা আঁতুড়ে কিছুকাল থাকিয়াই অধৈর্য্য হইয়া পড়ে ও পুনঃ পুনঃ হাত দিয়া জরায়ু পরীক্ষা করে ও অসময়ে প্রসব করাইবার জন্য অকারণে প্রসূতিকে নানাভাবে চেষ্টা করিতে বলে, ইহা আমি বিশেষভাবে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। কদাপি ইহা করিতে দিতে নাই। সময় হইলে প্রসব আপনা হইতেই হয় এবং প্রসূতি নিজেই তখন প্রসব করিবার চেষ্ট করেন। অসময়ে শত চেষ্টা করিলেও তাহা হইবে না, অধিকন্তু অসময়ে চেষ্টা করার জন্য প্রসূতি হাঁপাইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেন এবং প্রসবের প্রকৃত সময়ে তিনি কোন প্রকার চেষ্টাই করিতে পারিবেন না।

প্রসববেদনায় প্রসূতি কাতর হইয়া পড়িলে মাঝে মাঝে তাঁহাকে গরম দুধ, ফলের রস বা রুচিকর সহজপাচ্য অন্য কোন খাদ্য নির্ব্বিবাদে খাইতে দেওয়া যায়। আবশ্যক মত দুই এক মাত্রা মকরধ্বজ দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু বিনা প্রয়োজনে কোন ঔষধ না দেওয়াই ভাল।

যদি ২৪ ঘণ্টা অতিক্রম হইয়া যাওয়ার পরও প্রসবের কোন লক্ষণ

বুঝা না যায়, প্রসূতি অতিরিক্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, বা প্রসবের কোন প্রকার অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পায়, তবে তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই স্বভাবতঃ সে কাঁদিয়া ওঠে, যদ্যপি শিশু না কাঁদে বা না নড়ে, তবে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের শরণ লইতে হইবে। স্ত্রীর প্রসববেদনা আরম্ভ হইলেই নিকটস্থ বিজ্ঞ চিকিৎসক গৃহে আছেন কি না, তাহার খোঁজ-খবর লইয়া রাখা ভাল কারণ যে কোন মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রয়োজন হইতে পারে।

ফুল পড়িতে বিলম্ব।

ফুল পড়িতে একটু বিলম্ব হইলে অধৈর্য্য হইয়া অনভিজ্ঞা দাইকে কোন মতেই তাহা লইয়া টানাটানি বা হাত দিয়া ফুল আনিতে চেষ্টা করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। ফুল পড়িবার জন্য দাইয়ের কথামত বমির বেগ দেওয়া কদাপি উচিত নহে, ইহাতে নানারূপ গুরুতর বিপদ ঘটিতে পারে। যদি ফুল পড়িতে অতিরিক্ত বিলম্ব হয়, তবে শিক্ষিতা ধাত্রী বা বিজ্ঞ চিকিৎসকের আশ্রয় লওয়াই কর্ত্তব্য। ফুল পড়িলে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, তাহার কোন অংশ ছিঁড়িয়া পেটের মধ্যে আছে কি না, তাহা থাকা বিপদজনক।

শিশুর নাড়ী কাটা।

শিশুর নাভিনাড়ীর স্পন্দন থামিলে সিদ্ধ করা সুতা দ্বারা শিশুর নাভি হইতে ৩।৪ আঙ্গুল দূরে নাড়ীতে শক্ত করিয়া দুইটী গেরো বাঁধিয়া মাঝখানে সিদ্ধ করা কাঁচি দিয়া কাটিয়া শিশুর দেহ হইতে ফুল পৃথক করিয়া লইতে হইবে। সিদ্ধ তুলা দ্বারা পৃথক পৃথক ভাবে শিশুর চক্ষু, মুখগহ্বর, নাসিকা, কর্ণ ইত্যাদি মুছিয়া ক্লেদমুক্ত করিতে হইবে। তৎপর মিঠা তেল দ্বারা শিশুর সর্ব্বাঙ্গের ক্লেদ

দূর করিয়া, ঈষদুষ্ণ জলে তাহাকে স্নান করাইয়া, শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা দেহ উত্তমরূপে মুছাইয়া, উপযুক্ত আচ্ছাদনে রাখিতে হইবে। স্নানের সময় শিশুর নাকে, চোখে, কানে যেন জল প্রবেশ করিতে না পারে।

প্রসূতিকে শায়িত অবস্থায় রাখিয়াই তাঁহার ক্লেদাদি পরিষ্কার করাইয়া দিতে হইবে। তাঁহার পরিধানের বস্ত্র ও ব্যবহার্য্য ন্যাকড়া ইত্যাদি সমস্তই পরিষ্কৃত ও শোধিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। প্রসবের পর প্রসূতির পেট ঘিরিয়া সহ্যমত শক্ত করিয়া যে পেট বাঁধার প্রথা আছে, তাহা অতীব উত্তম, প্রসূতির পক্ষে সবিশেষ হিতকর প্রথা। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বা ধাত্রীর উপদেশ মত পেট বাঁধা কর্ত্তব্য।

অনেক স্থলে প্রসূতিকে উপুড় করাইয়া বসাইয়া প্রসব করাইবার রীতি আছে, ইহা অনুচিত। ইহাতে প্রসূতির অনেক প্রকার বিপদ হইবার সম্ভাবনা। সহজভাবে শোয়াইয়া প্রসব করানই শ্রেষ্ঠ উপায় ও বিজ্ঞান সম্মত, তাহাতে প্রসূতির শারীরিক ক্লেশও বিশেষ হইতে পারে না। প্রায় ক্ষেত্রেই প্রসূতি অতিরিক্ত দুর্ব্বলা থাকেন, কদাচ তাঁহাকে শয়ন করাইয়া ভিন্ন, অন্য কোন উপায়ে প্রসব করাইবার চেষ্টা করিতে দিতে নাই।

প্রসবকালে কোন কারণেই উতালা, অধৈর্য্য বা অসহিষ্ণু হইতে নাই। ভগবানের এমনই বিচিত্র কৌশল যে, যথাসময়ে সন্তান আপনই ভূমিষ্ঠ হইবে, জোর-জবরদস্তি করিয়া কেহ তাহা করিতে পারিবে না। এইরূপ ব্যস্ত হইয়া জোর করিয়া প্রসব করাইতে যাওয়ার সমূহ বিপদের সঙ্গে লেখকের পরিচয় আছে, সেরূপ বিপদে কেহ না পড়েন, ইহাই প্রার্থনা। প্রসূতি যতই অস্থির উতলা হইয়া পড়ুন না কেন, স্বামী নিজে

কোন কারণেই ব্যস্ত হইবেন না, ভগবানের নাম হৃদয়ে লইয়া সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য সহকারে আপন কর্ত্তব্য করিয়া যাইবেন, তাহা হইলে কোনরূপ বাধা-বিঘ্ন আসিতে পারিবে না। তাঁহারই আশীর্ব্বাদে গৃহে গৃহে সুখপ্রসব হইবে, স্বামী-স্ত্রীও সুস্থ বলিষ্ঠ সন্তান কোলে লইয়া অপার আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন।

যাহারা সহরে বাস করেন, উপযুক্ত প্রসবাগার, হাঁসপাতাল, বিজ্ঞ চিকিৎসক ও অভিজ্ঞা ধাত্রীর ব্যবস্থা তাঁহাদের পক্ষে করা সম্ভব। সহরের লোকের পক্ষে গর্ভবতীকে প্রসবার্থে প্রসবাগার বা হাঁসপাতালে রাখাই বোধ হয় ভাল। যাঁহাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল তাঁহারা আপন গৃহেই অতি অনায়াসে সকল ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু অগণিত দুস্থ, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত গ্রাম্য পরিবারে ঐরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। আবার যতটা ব্যবস্থা নিজেরা করা সম্ভব অজ্ঞতা ও অবহেলা হেতু তাহাও আমরা করিনা, কাজেই দেশের শিশুমৃত্যু ও প্রসূতিমৃত্যু বাড়িয়া চলিয়াছে। আমরা সকলে এই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সময় থাকিতে সতর্ক হইলে অনেক দুঃখযন্ত্রণা ও দুর্ভোগের হাত এড়াইতে পারি সে বিষয়ে সংশয়ের লেশমাত্রও নাই।

সন্তানপালন

বিশ্বপিতা পরম মঙ্গলময় তাঁহার সৃষ্টিরক্ষার্থে মাতৃহৃদয়ে এমনই অনন্ত অফুরন্ত স্নেহের চিরসঞ্চিত ভাণ্ডার দিয়া সংসারে পাঠাইয়াছেন যে, ভূমিষ্ঠ সন্তানের মুখখানি দর্শনমাত্রই সুদীর্ঘ দশ মাস সন্তানবহনক্লেশ ও প্রসবের দুঃসহ বেদনা এক সঙ্গে ভুলিয়া গিয়া সন্তানের প্রতি এক অননুভূত অপার্থিব স্নেহে প্রসূতির দেহমন আপ্লুত হইয়া যায়। নবজাত শিশু যেন এক নূতন রাজ্যের আনন্দ কোলাহল সমারোহ লইয়া মাতাপিতার দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে এমন কতকগুলি গুরুতর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহা প্রতিপালন করিতে না পারিলে, পিতামাতার এই পরম স্নেহের ধন দিয়াই তাঁহাদের মাতৃত্ব লাঞ্ছিত হয়, পিতৃত্ব অপমানিত হয়, চোখের জলে দিনাতিপাত করিতে হয়।

একই মনুষ্যসন্তান, কেহ বা জীবনের সর্ব্বকাম্য শ্রেয়ঃ ও প্রেয় বস্তু হারা হইয়া পশুত্ব প্রাপ্ত হইয়া মানব জীবনের অপব্যবহার করিয়া চলিয়া যায়, কেহ বা ধর্ম্মে, সত্যে, মনুষ্যত্বে, সমুজ্জ্বল হইয়া আপন প্রভায় পরিবার, স্বজন, সমাজ, স্বদেশকে উদ্ভাসিত করিয়া দেবত্ব অর্জ্জন করিয়া অমর হইয়া থাকে।

সন্তান কেবল পিতামাতার সুখ-সুবিধার জন্যই নির্দ্দিষ্ট নহে। সন্তান পরিবার, সমাজ ও স্বদেশের সম্পত্তি। বংশরক্ষা, পিতামাতা, আত্মীয়, স্বজন, সমাজ, স্বদেশ রক্ষার জন্য সন্তানের উদ্ভব ও প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন সর্ব্বতোভাবে সন্তান দ্বারা যাহাতে মিটিতে পারে, সেইভাবে

তাহাকে গঠিত করাই আদর্শ পিতামাতার কর্ত্তব্য। সন্তানপালন জাতি গঠনেরই নামান্তর মাত্র, ইহা প্রত্যেক পিতামাতার ভাবিবার বিষয়। নারীজীবনের চরম বিকাশ যেমন মাতৃত্বে, তাহার পূর্ণদায়িত্বও তেমনি সন্তানগঠনে। এই গঠনকার্য্যে অবহেলা করি বলিয়াই আমরা দিন দিন দুর্ব্বল, রুগ্ন, হীনবীর্য্য, অলস, বাকসর্ব্বস্ব, অন্যায় অধর্ম্ম অসত্যাশ্রয়ী হইয়া জগতে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়া কোন প্রকারে বাঁচিয়া আছি। সন্তানকে আমরা একান্তভাবে আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি মনে করি। পুত্রসন্তান জন্মিলেই তাহা দ্বারা বার্দ্ধক্যের যৎকিঞ্চিৎ আর্থিক সাহায্য হইবে আশায় সেইভাবে তাহাকে গঠিত করিয়া থাকি, তাহাকে মানুষ করিবার কথা কল্পনাও করি না। মানুষ করা অর্থ যে মনুষ্যত্বমণ্ডিত করিয়া তোলা, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। ছেলে মানুষ করা অর্থ আমরা ধরিয়া লইয়াছি, যেমন তেমন করিয়া কিছু উপার্জ্জনের বিদ্যা বা ফন্দিমাত্র অর্জ্জন করা। গোড়ায়ই আমরা মস্ত ভুল করিয়া বসিয়া আছি, কাজেই আমাদের কপালে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিতেছে।

সন্তানপালন জাতিগঠনের সহায়ক।

মা, তুমি আজ সন্তানের জননী হইয়াছ, তুমিই তাহার প্রথম ও প্রধান শিক্ষয়িত্রী, তোমার শিক্ষাই তাহার মানবজীবনের সূত্রপাত করিবে। আজ তুমি তাহার মুখখানি দেখিয়া স্নেহে বিহ্বল হইয়া থাকিলে তো চলিবে না। সঙ্গে সঙ্গে এই মুহূর্ত্তেই ঠিক করিয়া লও, তোমার সন্তানকে তুমি মানুষ করিবে, সাধু, বিদ্বান্, ধার্ম্মিক, সত্যাশ্রয়ী, সবল, স্বাস্থ্যবান করিবে,

জননীই প্রধান শিক্ষয়িত্রী।

দেশের সুসন্তান করিবে, না আত্মস্বার্থবশবর্ত্তী হইয়া কেবল যেমন তেমন করিয়া কিছু উপার্জ্জন করিতে শিক্ষা দিবে? এই সন্তানেরই উৎপীড়নে তোমরা স্বামী-স্ত্রী দুইজন জরাগ্রস্ত, অথর্ব্ব অবস্থায় চক্ষের জলে মরণের দিন গণিবে, না ইহার সেবা, যত্ন, ভক্তি, বিনয়, বিদ্যাবুদ্ধিতে গৌরবান্বিত হইয়া মৃত্যুর তীরে দাঁড়াইয়াও ইহাকে ছাড়িয়া যাইতে চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া যাইবে? চিন্তা করিয়া দেখ কোন্‌টী শ্রেয়ঃ। যদি শ্রেয়ঃ ও উচিত পথে চলিতে চাও, তবে আজ প্রথম দিন হইতেই তুমি তাহাকে সেইভাবে গঠিত করিতে চেষ্টা কর।

কেবল সন্তানাদি সংসারে আনিলেই পিতামাতার কর্ত্তব্য শেষ হইল না। পিতামাতা ভবিষ্যৎ ভরণ-পোষণ ও সুখ-সুবিধার দাবী করিতে অধিকারী হইলেন না। তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা ও শক্তিতে শক্তিমান করিয়া লইলে তবেই না তাহারা সত্যপথে থাকিয়া মনুষ্যোচিত কর্ম্ম দ্বারা নির্ব্বিচারে জনক, জননী, আত্মীয়, স্বজন, সমাজ, স্বদেশের প্রতি আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারিবে। একথা প্রত্যেক জনক-জননী ভাবিয়া দেখিবেন যে, দশ সের ভার বহনে যে সংসারে সক্ষম হইবে, তাহার স্কন্ধে দশ মণ ভার চাপাইলে কুফল বৈ সুফলের সম্ভাবনা নাই।

আঁতুড়ে প্রসূতি ও শিশু।

প্রসব হইবামাত্রই প্রসূতির উঠা, বসা বা নড়াচড়া করা ও শিশুর পরিচর্য্যা করা সম্ভব নয়। সম্ভব হইলেও নিজের স্বাস্থ্যের জন্য প্রসূতিকে ২।৩ দিন একেবারে শয্যাশায়ী ও ৮।১০ দিন অধিকাংশ সময় শয্যাশায়ী থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। প্রসূতি শায়িত থাকিয়াই যথাসম্ভব শিশুর তত্ত্বাবধান করিবেন। শিক্ষিতা দাই বা অভিজ্ঞা পরিচর্য্যাকারিণী গৃহে থাকিলে প্রসূতি অনেকটা

নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, কিন্তু দায়িত্বজ্ঞানহীনা, অনভিজ্ঞা, নোংরাস্বভাব-সম্পন্না কোন গ্রাম্য দাই বা পরিচর্য্যাকারিণী প্রসূতি ও শিশুর সেবায় নিযুক্ত থাকিলে সর্ব্বদা তাহার প্রতিকার্য্যে প্রসূতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। অপরিষ্কৃত হাতে, নোংরা বস্ত্রে শিশুকে কদাপি লইতে দিবেন না। তাহার নাভিতে তৈলের বা অপরিষ্কৃত হাতের সেক দিতে দিবেন না। নাভির চারিদিকে বোরিক পাউডার দিয়া, বোরিক তুলার পাতলা নরম প্যাড করিয়া নাভি ঢাকিয়া, গরম জলে সিদ্ধ করা শুষ্ক পরিষ্কৃত বস্ত্রখণ্ডে তাহা বাঁধিয়া রাখাই উত্তম প্রথা। যেস্থানে ইহা সংগ্রহ করা সম্ভব না হয়, সেখানে শোধিত ও শুষ্ক বস্ত্রখণ্ডে ঢিলাভাবে নাভি বাঁধিয়া রাখা যাইতে পারে, যাহাতে নাভিতে বাহির হইতে কোন বিষাক্ত দ্রব্য না লাগিতে পারে, বা হঠাৎ কোন সময় টান না লাগিতে পারে। ঐ বস্ত্র প্রতিদিনই পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হইবে, অথবা প্রস্রাবাদি করিয়া শিশু উহা ভিজাইয়া ফেলিলে বা অন্য কোন কারণে উহা নষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হইবে। শিশুর বাহ্য, প্রস্রাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রসবের পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যদি শিশু একবারও প্রস্রাব না করে, তাহা তৎক্ষণাৎ স্বামীকে জানাইতে হইবে। নিজের ও শিশু সম্বন্ধে সকল কথা অসঙ্কোচে স্বামীকে বলিতে হইবে। স্ত্রীকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, এ সংসারে স্বামীই স্ত্রীর সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সহায়, আশ্রয়স্থল ও সুখদুঃখে সমভাগী এবং নবজাত শিশুর পিতা বলিয়া শিশুর প্রতি তাঁহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মমতা ও কর্ত্তব্যবোধ আছে, অপর কেহ হয়তো তাহার প্রতি ততদূর স্নেহবান্ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ না হওয়াই স্বাভাবিক। স্বামীকে সকল কথা

খুলিয়া বলিলে তিনিই সদ্যপ্রসূতি স্ত্রী ও সন্তানের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের ব্যবস্থাই সাধ্যমত করিবেন।

প্রথম দুই তিন দিন স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার না হইলেও শিশুকে মাঝে মাঝে স্তনপান করাইতে হইবে। স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার হওয়ার পূর্ব্বে যে রসের সঞ্চার হয়, তাহা শিশুর পক্ষে অপকারী নহে, অপকারী হইলে সর্ব্বমঙ্গলময় ভগবান এরূপ ব্যবস্থা করিতেন না। ঐ রস শিশুর কোষ্ঠ পরিষ্কারের সহায়তা করে।

শিশুকে স্তনদান।

শিশুকে স্তন দিবার পূর্ব্বে স্তন না ধুইয়া কদাচ শিশুর মুখে দিতে নাই। স্তনে নানারূপ বিষাক্ত বীজাণু বাহির হইতে লাগিতে পারে, শিশু তাহা উদরস্থ করিলে গুরুতর ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা। অবশ্য অনেক স্থলেই মাতাগণ স্তন না ধুইয়াই শিশুকে পান করান, তাহাতে তেমন গুরুতর কোন ব্যাধি হইতেও বড় একটা দেখা যায় না, কিন্তু ব্যাধি গুরুতর না হইয়া অল্প বিস্তর হইলে সে ব্যতিক্রম অনেক সময় বড় ধরাই যায় না এবং সর্ব্বোপরি কথা এই যে, ব্যাধি কখন যে কাহার হইবে এবং কি ব্যাধির বীজাণুতে কাহার দেহে ব্যাধির উদ্ভব হইবে, না হইবে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ব্যাধি হইয়া পড়িলে তখন হয়তো জীবন লইয়া টানাটানি পড়িবে। সুতরাং সাবধান থাকাই উৎকৃষ্ট পথ। এ সংসারে সর্ব্ববিষয়ে যে যত সাবধানী দুঃখভোগ তাহার তত কম। অমুকে স্তন না ধুইয়া শিশুকে পান করান, তাহাতে তাহার শিশুর কোন ব্যাধি হয় না, স্তন না ধুইয়া পান করাইবার পক্ষে ইহাই সন্তোষজনক কারণ নহে। যাহা অন্যায়, অযৌক্তিক,

তাহাতে কুফল হউক বা না হউক কদাচ তাহা করা কর্ত্তব্য নহে। তাহা ত্যাগ করিয়া চলাই উচিত।

প্রসূতি এ সময় আপন স্বাস্থ্যের প্রতিও অতিশয় যত্নবতী থাকিবেন। ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শিশু যতদিন স্তন পান করিবে, ততদিন সে জননীর ব্যাধি পীড়ার অংশভাগী।

স্ত্রীকে স্বামী হইতে বিছিন্ন হইয়া আঁতুড়ে থাকিতে হয়। কাজেই স্ত্রী ও শিশুর সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বাবধান স্বামী করিতে পারেন না। এ সময় স্ত্রী যেন কোন কথা গোপন না করেন। শরীরের কোনরূপ ব্যতিক্রম দেখিলে, অতিরিক্ত তৃষ্ণা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, অবসন্ন বা আচ্ছন্নভাব, স্মৃতিভ্রংশতা, পেটে অসহ্য যন্ত্রণা, অনিদ্রা, হাতপাফোলা ইত্যাদি কোন অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহা তৎক্ষণাৎ স্বামীকে জানাইতে হইবে।

প্রসূতির খারাপ লক্ষণ।

পেট ও কোমর ব্যাপিয়া হ্যাদাল ব্যথা হইলে দেশাচার বা লোকাচারের ভয়ে বা অন্ধসংস্কারবশে সেক না দেওয়া ভুল। যথারীতি পেটবাঁধা ও রীতিমত সেক দিলেই এ ব্যথা দূর হইয়া থাকে। গরম জলের ব্যাগ বা বোতলে গরম জল ভরিয়া, বোতল নরম কাপড় দ্বারা জড়াইয়া লইয়া, সেক দেওয়া উত্তম প্রথা। স্বামী নিজে উদ্যোগী হইয়া সেকের সকল প্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। কাহারো কোনরূপ আপত্তি শুনিবেন না। ইহা চিকিৎসা বিদ্যা সম্মত, তাহা আপত্তিকারীদিগকে সবিনয়ে বুঝাইয়া দিবেন। ২।৩ দিনের মধ্যে যদি ব্যথা না কমিয়া ক্রমশঃ অসহ্য ও তীব্রতর হইতে থাকে, তবে চিকিৎসকের ব্যবস্থা করিবেন তাহাতে অন্যথা করিবেন না। দ্রুতনাড়ী,

হ্যাদাল ব্যথা।

ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস, ভুলবকা সম্বলিত জ্বর যদি প্রসূতির হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বিচক্ষণ চিকিৎসকের সাহায্য লইবেন। তাহাতে আলস্য বা অবহেলা করিয়া কদাপি প্রিয়তমা ও বংশধরের জীবন বিপন্ন করিবেন না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, স্বাস্থ্যহীন মানবের কোন প্রকার ধর্ম্মরক্ষা অসম্ভব। কাজেই শিশুর জন্মের দিন হইতেই তাহার স্বাস্থ্যের সঙ্গে বিশ্ব প্রকৃতির যোগ রাখিয়া উপযুক্ত সাবধানতার সহিত তাহাকে লালন করিতে হইবে। কদাচ তাহার গায়ে ঠাণ্ডা দম্‌কা হাওয়া লাগিতে দিবেন না, অথবা অতিরিক্ত সাবধানী হইয়া আলোবাতাসস্পর্শলেশহীন অন্ধকার স্থানেও রাখিবেন না। প্রয়োজন মত আলো-বাতাস জন্ম হইতেই যাহাতে শিশু পাইতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থা অবশ্য করিতে হইবে। শিশুর বিছানা বেশ নরম তুলা দিয়া পূর্ব্বেই কয়েক প্রস্থ তৈয়ারি করিয়া রাখিলে আবশ্যক মত তাহা পাইতে অসুবিধা হইবে না। প্রস্রাবাদি করিয়া এক প্রস্থ ভিজাইয়া ফেলিলে তখনই অপর এক প্রস্থ বদ্‌লাইয়া দেওয়া চলিবে। ঠাণ্ডা বাতাস লাগার ভয়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্ত্রে শিশুকে আবৃত রাখিতে নাই, অথবা অসাবধানতাহেতু খালি গায়েও ফেলিয়া রাখা কর্ত্তব্য নহে। এ দুই প্রথাই অহিতকরজ্ঞানে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। কোন ব্যবস্থাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত করিতে নাই, তাহাতে কুফল ফলিবার সম্ভাবনা।

শিশুর ভবিষ্যৎ গঠনের সূত্রপাত।

প্রথম প্রথম সহ্য মত ঈষদুষ্ণ জলে নিয়মিত নির্দ্দিষ্ট সময়ে শিশুকে স্নান করাইতে হইবে। স্নান করাইবার পূর্ব্বে শিশুর সর্ব্বাঙ্গে উত্তমরূপে তেল মাখিয়া কিছুকাল রৌদ্রের উত্তাপে রাখিতে হইবে। শিশুর ত্বক্‌ অতিশয়

কোমল ও শীতাতপ সহ্য করিতে অক্ষম, কাজেই রৌদ্রের উত্তাপ ক্রমশঃ তাহাকে সহ্য করাইয়া লইতে হইবে। তেলে-জলে বাঙ্গালীর শরীর, ইহা অতি সত্য কথা। তেল মাখাইয়া শিশুকে রৌদ্রের উত্তাপে রাখা উত্তম প্রথা। কিন্তু প্রথমই তাহাকে তীক্ষ্ণ রৌদ্রে রাখিতে নাই। অল্প নরম রৌদ্রে রাখিয়া ক্রমশঃ সহ্যমত প্রখরতর তাপে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিশুর চোখে, মুখে বা মাথায় যেন বেশী উত্তাপ না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অনেকে শিশুর রং মলিন হইবার ভয়ে তাহার অঙ্গে কখনও তেল স্পর্শ করান না, বা রৌদ্রের উত্তাপে রাখেন না। ফ্যাকাসে রংএর দুর্ব্বল ও রুগ্ন শিশু অপেক্ষা রৌদ্রের উত্তাপে কৃষ্ণ, স্বাস্থ্যবান, সুগঠিত শিশুর প্রয়োজন সংসারে অনেক বেশী। দুর্ব্বল সুশ্রী শিশু মেয়েলীভাবাপন্ন, রুগ্ন ও অক্ষম হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে সূর্য্যের উত্তাপে বর্দ্ধিত শিশু অপেক্ষাকৃত মলিন হইলেও শীতাতপ সহিষ্ণু, বলিষ্ঠ, পুরুষোচিত বলবীর্য্যে বীর্য্যবান হইয়া থাকে। পশ্চিম ভারতে শিশুকে তেল মাখিয়া রৌদ্রে ফেলিয়া রাখার প্রথা অনেক স্থানে বর্ত্তমান। সেই সব প্রদেশের লোক স্বাস্থ্য-সম্পদে আমাদের অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ, বহুগুণে কর্ম্মঠ ও দীর্ঘায়ু। ভগবানের অবারিত দান আলো, বাতাস, সূর্য্যোত্তাপ প্রভৃতি হইতে শিশুকে বঞ্চিত করিয়া তাহার রং ফরসা রাখিবার জন্য সাবান, পাউডার, স্নো ও জামা কাপড় লইয়া কদাপি ব্যস্ত হইতে নাই। তাহাতে শিশুর সমস্ত জীবন স্বাস্থ্যহীন ও দুঃখময় হইয়া অশেষবিধ অকল্যাণ ও অনুতাপের লীলাক্ষেত্র হইবে। শীতগ্রীষ্মনির্ব্বিশেষে সর্ব্বদা জামা গায়ে রাখা সভ্যতার অঙ্গ হইয়া দাড়াইয়াছে। যাঁহাদের দেখিয়া এই ‘সভ্যতা’ আমরা অনুকরণ

তেলে জলে বাঙ্গালীর শরীর।

করিয়াছি, তাঁহাদের জন্মভূমি শীত প্রধান, কাজেই ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় তাঁহারা সর্ব্বদা দেহ আবৃত রাখিতে বাধ্য হ'ন। তাঁহাদের দেশে শীতের প্রকোপে ও সময় সময় বরফপাতের ফলে নগ্নপদে চলাফেরা অসম্ভব। কাজেই জুতা-মুজা তাঁহাদের অঙ্গের ভূষণ হইয়া দাঁড়ায়। তাহাতে তাঁহাদের স্বাস্থ্য খারাপ না হইয়া ভাল থাকিবারই সহায়তা করে; কিন্তু আমরা নিতান্ত অজ্ঞের ন্যায় তাহাই অনুকরণ করিয়া এই গ্রীষ্মের দেশেও দিবানিশি জামা-জুতা লইয়া ব্যস্ত থাকিয়া আপন আপন স্বাস্থ্য নষ্ট করি এবং অতিরিক্ত জামা-জুতার পেছনে উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশ ব্যয় করিয়া দুঃখ, দারিদ্র্য বাড়াইয়া হাহাকার করিয়া মরি। এই জামা-জুতায় 'সভ্যতা' সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় দেশের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। পল্লীর নিভৃত অঞ্চলে নিষ্কর্ম্মভাবে যাহার দিন কাটিতেছে, যেখানে শীতকাল ব্যতীত জামা-জুতা ব্যবহারের কোন প্রয়োজনই হয় না, সেও সেখানে জামা-জুতায় 'ভদ্রলোক' ও 'সভ্য' সাজিয়া আপন স্বাস্থ্য ও আর্থিক স্বচ্ছলতার বিনিময়ে অভদ্রতা ও অসভ্যতার হাত হইতে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতেছে। আমাদের এই মোহ ও এই অজ্ঞতা কতদিনে কাটিবে এবং কাটিবে কি না; আর আমরা যে অভাবের জন্য নিরন্তর দগ্ধ হইয়া মরি তাহার কতখানি আমাদের স্বেচ্ছাকৃত ও স্বেচ্ছাবৃত, তাহা আমরা ত্যাগ করিতে পারিব কি না; অথবা এইভাবে স খাদ সলিলে ডুবিয়া আমাদের প্রাণ যাইবে, তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন। শৈশব হইতে শিশুকে যাহা অভ্যাস করান যাইবে তাহার দেহ সেইভাবে অভ্যস্ত ও ভবিষ্যতের জন্য সেইভাবে প্রস্তুত হইতে থাকিবে। প্রথম প্রথম সরিষার

জামাজুতায় সভ্যতা।

তৈল অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া, ঝাঁজ কমাইয়া লইয়া তাহাই শিশুর কোমল ত্বকে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

শীতকালে শিশু জন্মিলে তাহাকে উপযুক্ত গরম কাপড়ে আবৃত রাখাই কর্ত্তব্য। সকালে সন্ধ্যায় সহ্যমত তাহাকে তাপ দেওয়া ভাল। বোতলে গরম জল ভরিয়া মোটা নরম কাপড়ে বোতল জড়াইয়া শিশুর দুই পাশে ও পায়ের কাছে রাখিয়া দিলেই বেশ হয়।

শিশুকে তাপ দেওয়া।

কারণে অকারণে শিশুকে সর্ব্বদা ঔষধ ব্যবহার করাইতে নাই। সামান্য কারণে ও অকারণে ঔষধ সেবন অত্যন্ত অহিতকর। শিশুর অসুখ হইলে প্রসূতি নিজে খুব সাবধান হইবেন। সহজ পাচ্য পরিমিত পানাহার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বসনভূষণ ও ধর্ম্মপ্রবণ মন থাকিলে প্রায়ই অসুখ-বিসুখ করে না, করিলেও অধিকতর সাবধানী হইলে সারিয়া যায়। প্রসূতি সর্ব্বদা এই সব নিয়ম পালন করিয়া নিজে সাবধানী থাকিলে ও শিশুকে সাবধানে রাখিলে অসুখ-বিসুখ বড় একটা হইবে না। সামান্য এক আধটুকু জ্বর, সর্দ্দি, কাসি বা পেটের অসুখের জন্য ব্যস্ততা সহকারে শিশুকে সর্ব্বদা ঔষধ পত্র ব্যবহার করান গর্হিত কর্ম্ম।

শিশুর অসুখ-বিসুখ।

শিশুর আহার্য্য সর্ব্বদা পরিষ্কার পাত্রে পরিষ্কার ঢাকনা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। এমন ঢাকনা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে, যাহার মধ্য দিয়া অনায়াসে বায়ু চলাচল করিতে পারে, অথচ মাছি বা পোকা-মাকড় প্রবেশ করিতে না পারে। একবার জ্বাল দিয়া শীতকালে ৩।৪ ঘণ্টা ও গ্রীষ্মকালে ২।৩ ঘণ্টার পর সে খাদ্য বা সন্দেহজনক কোন খাদ্য কদাপি শিশুকে খাইতে

শিশুর খাদ্য।

দিতে নাই। স্তনে পরিমিত দুগ্ধ থাকিলে অকারণে তদতিরিক্ত অন্য দুগ্ধ শিশুকে না খাওয়ানই উত্তম। স্তনদুগ্ধই শিশুর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নির্দ্দোষ, শক্তিশালী, জীবনীশক্তিবর্দ্ধক ও পুষ্টিকর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য। ইহা কোন পাত্রে লইয়া অথবা বলক দিয়া খাওয়াইতে হয় না বলিয়া বাহিরের কোন প্রকার বিষাক্ত পদার্থ ইহার সহিত মিশিতে পারে না ও ইহার পুষ্টিকর গুণ কমিতে পারে না। যদি মাতৃস্তনে দুগ্ধের অভাব ঘটে, বা শৈশবে জননীর অভাব ঘটে তবে সম্ভব হইলে ধাত্রীর স্তনদুগ্ধ অথবা গরু, ছাগ প্রভৃতির দুধ ভিন্ন উপায় নাই। ইহার মধ্যে স্বল্পবয়স্কা নীরোগ ধাত্রীর স্তনদুগ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিন্তু তাহা ব্যয়সাপেক্ষ। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানের জন্য গোদুগ্ধ, ছাগদুগ্ধ ভিন্ন উপায় নাই। গোদুগ্ধ যাহাতে পরিষ্কৃত স্থানে পরিষ্কৃত হস্তে ও পাত্রে দোহন করা হয় এবং দুগ্ধবতী গাভী বা ছাগী রুগ্না না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। একবল্‌কা দুধ চিনি বা মিছ্‌রি সহযোগে পরিমাণ ও নির্দ্দিষ্ট সময়মত শিশুকে খাইতে দিতে হইবে। পরিমাণের অতিরিক্ত বা পরিমাণের কম দুগ্ধ অসময়ে কদাপি তাহাকে দিতে নাই। তাহাতে শিশুর উদরাময় হইতে পারে অথবা শিশু শুকাইয়া যাইতে পারে। শিশুর শারীরিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়াইতে হইবে। শিশুর দাঁত উঠিবার পূর্ব্বে অসুখ-বিসুখ ভিন্ন কদাপি দুগ্ধ ব্যতিরেকে তাহাকে অন্য কিছু খাইতে দিতে নাই। গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে ২।১ চামচ পরিষ্কৃত জল বা মিছ্‌রির জল শিশুকে দিতে হয়।

মাতৃদুগ্ধ, ধাত্রীদুগ্ধ, গোদুগ্ধ, ছাগদুগ্ধের অভাব না ঘটিলে অথবা চিকিৎসকের উপদেশ ব্যতিরেকে সখ করিয়া অপরের দেখাদেখি

অকারণে কোন প্রকার বোতল বা কৌটার খাদ্য শিশুকে কদাচ খাওয়ান কর্ত্তব্য নহে।

মাতৃস্তনে দুগ্ধের অভাব ঘটিলে যদি গোদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধ শিশুকে খাওয়ান প্রয়োজন হয় তবে পলিতা সহযোগে তাহা খাওয়ান মন্দ নহে। তাহাতে শিশু মাতৃস্তনের ন্যায় আপনার প্রয়োজন মত দুগ্ধ পান করিবার সুবিধা পায়। পলিতা উত্তমরূপে শোধিত বস্ত্রের হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং একবারের বেশী এক পলিতা কদাপি ব্যবহার করিতে নাই। সহজ স্বাভাবিক খাদ্য স্বাভাবিক উপায়ে অতিশয় পরিচ্ছন্নতার সহিত শিশুকে আহার করাইলে তাহাই তাহার জীবনধারণ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম হিতকর হইয়া থাকে। বোতলে করিয়া দুধ খাওয়ানো কিছুতেই উচিত নহে। প্রতিবার খাওয়াইবার পর বোতল গরম জলে সিদ্ধ করিয়া লইলে তবে তাহা পুনরায় ব্যবহারোপযোগী হয়। আলস্য, অজ্ঞতা বা অন্য কার্য্যগতিকে যদি তাহা উত্তমরূপে শোধিত করিয়া না লওয়া যায় তবে শিশুর গুরুতর উদরাময় হওয়া বিচিত্র নহে। শিশুর ব্যবহার্য্য বাটী, চামচ, ঝিনুক প্রভৃতি প্রতিবার আহারান্তে উত্তমরূপে ধুইয়া রাখিতে হইবে এবং পুনর্ব্বার ব্যবহারের পূর্ব্বে উত্তমরূপে ধুইয়া লইতে হইবে। কোন কারণেই ইহার অন্যথা করা উচিত নহে। ধূলা-বালুর সঙ্গে নানারূপ ব্যাধির বীজাণু অলক্ষ্যে ঐ সব চামচ, বাটীতে আশ্রয় লইয়া শিশুর উদরস্থ হওয়া বিচিত্র নহে। শিশুকে দিনে ২।১ বার দুই এক চামচ কমলা, বেদানা প্রভৃতির রস খাওয়ান তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম হিতকর।

শিশুকে খাওয়ানের উপায়।

শিশু হামাগুড়ি দিতে শিখিলে তাহাকে সর্ব্বদা কোলে রাখা

অন্যায়। ধনী গৃহের দুলাল হইলেও শিশুকে কেবল কোলে কোলে রাখা অতিশয় খারাপ অভ্যাস। নির্ম্মল বায়ুতে পরিষ্কৃত স্থানে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া পার্শ্বে বসিয়া থাকিলে তাহার রক্ষণাবেক্ষণও চলে, শিশুও মা ধরিত্রীর ক্রোড়ে অবাধে ও সানন্দে বিচরণ করিতে পারে। যে সমস্ত দ্রব্য পূর্ব্বে গৃহের মেঝেয় রাখা চলিত, এখন তাহা উঁচুতে উঠাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নতুবা শিশু তাহা অপচয় করিবে, অথবা যাহা সম্মুখে পাইবে নির্ব্বিচারে তাহাই উদরস্থ করিয়া উদরাময়ে আক্রান্ত হইবে। যে ঘরের মেঝেয় শিশুকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, তাহা পূর্ব্বাহ্নে ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ঘরে বা ঘরের বারান্দায় কাক বা কবুতরের বিষ্ঠার অন্ত নাই, তক্তপোষের নীচে হয় তো চাল, ডাল, তরিতরকারি ছড়ানো রহিয়াছে, চূণের পাত্র, শুপারি কাটিবার যাঁতি রহিয়াছে, এক কোণে একটা কেরোসিনের বোতল বা ডিবা রহিয়াছে, স্নেহময়ী জননী তাহারই মধ্যে তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শিশুকে নির্ব্বিচারে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে গৃহকার্য্যে চলিয়া গেলেন। শিশু এদিকে ঘরময় ছড়ানো সকল বস্তুই অবলীলাক্রমে মুখে তুলিয়া দিতেছে, হয়তো খানিকটা চূণ খাইয়া মুখ পুড়িয়া লইল, নয়তো বা কেরোসিন ঢালিয়া কালি মাখিয়া ভূত সাজিল, অথবা যাঁতি দিয়া হাত কাটিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল, নহে তো কাক বা কবুতরের বিষ্ঠা নীরবে উদরস্থ করিল, কেহ জানিতেও পারিল না। দুই এক দিন পরে শিশুর উদরাময় দেখা দিল, কোন ক্ষেত্রে বহু অর্থব্যয় করিয়া হয়তো শিশুর জীবন রক্ষা পাইল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা

হামাগুড়ির সময় শিশুর ব্যবস্থা।

পাইল না। পিতার গৃহ শূন্য করিয়া, মায়ের কোল খালি করিয়া সোনার দুলাল চলিয়া গেল, উদরাময়ের কারণ কিন্তু সংসারে সকলের নিকট অজ্ঞাতই রহিয়া গেল।

অস্বাস্থ্যকর অপরিষ্কৃত স্থানে ও রক্ষকহীন অবস্থায় কদাচ শিশুকে ছাড়িয়া দিয়া গৃহকর্ম্ম করিতে যাইতে নাই। সন্তানই পিতা, মাতা, বংশ, সমাজ, স্বদেশের ভবিষ্যৎ রক্ষক। নারীত্বের পরিপূর্ণতা সন্তানেই বিকশিত হইয়া ওঠে। যে নারী মাতৃত্ব হইতে বঞ্চিতা, তাঁহার জীবনই মরুভূমি তুল্য। সন্তানগঠনই নারীর গৃহজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম, এহেন সন্তানকে কদাচ কোন কারণেই নষ্ট হইতে দিতে নাই। তাহার সচ্ছন্দে বিচরণ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করিয়া তারপর অন্য কার্য্যে মন দিতে হইবে।

শিশুকে ঘরের মেঝেয় বসাইয়া কদাচ ঘর ঝাট দিতে নাই, তাহাতে ধুলা-বালুর সঙ্গে নানারূপ ব্যাধির বীজাণু শ্বাস-প্রশ্বাস আশ্রয় করিয়া তাহার উদরস্থ হওয়া সম্ভব।

অনেক স্থলে দেখা যায়, স্ত্রীর উপর শিশুপালন ও রক্ষণের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া স্বামী নিশ্চিন্ত থাকেন, তাহার বড় একটা খোঁজ খবর লন না, কেবল আদর করিবার ছলে দুই একবার কোলে লন মাত্র এবং রান্না বা অপর কোন গৃহকর্ম্মের একটু ব্যতিক্রম ঘটিলে স্ত্রীর প্রতি অযথা ক্রোধ প্রকাশ করেন। ইহা স্বামীর পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। সন্তান হইলেই স্ত্রীর ঘাড়ে কত বড় একটা দায়িত্ব আসিয়া পড়িল, তাঁহার গৃহকর্ম্মের সময় কত সংক্ষিপ্ত হইয়া গেল, তাহা স্বামীর বুঝিয়া তদনুরূপ ব্যবস্থা করা

শিশুপালনে পিতার দায়িত্ব।

একান্ত কর্ত্তব্য। সম্ভব হইলে এ সময় ২।১ জন সাহায্যকারী লোকজন রাখিয়া দিবেন এবং নিজে শিশুপালনবিষয়ে স্ত্রীকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। তাহা না করিয়া গৃহকর্ম্মের জন্য কেবল স্ত্রীকে তাড়না করিলে তিনি শিশুর উপযুক্ত যত্ন লইতে পারিবেন না। শিশুকে সংসারে আনা ও গঠনের জন্য মাতার ন্যায় পিতাও তুল্যভাবে দায়ী। ঐ শিশুই বংশরক্ষক, জরা-বার্দ্ধক্যের সম্বল, দেশের ও দশের সম্পদ এ কথা চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

আর প্রসবের সময় স্ত্রীর শরীরের যেরূপ অবস্থা হয়, তাহাকে পুনর্জন্ম বলিলেও চলে। তাহার পর অন্ততঃ ছয় মাস কাল তাঁহাকে যথাসাধ্য বিশ্রাম দিতে হইবে, গুরু শ্রমসাধ্য সকল প্রকার কর্ম্ম কমাইয়া দিতে হইবে এবং পুষ্টিকর সহজপাচ্য ও সুখাদ্য আহার্য্যাদি যোগাইয়া শীঘ্র শীঘ্র তাঁহার দেহে বলাধান ও শিশুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য যথেষ্ট স্তনদুগ্ধ সঞ্চারের সহায়তা করিতে হইবে। তাঁহার শরীর সুস্থ ও নীরোগ থাকিলে শিশুর স্বাস্থ্যও নীরোগ ও সুস্থ থাকিবে আশা করা যায়। যে শিশু ৭।৮ মাস বয়স পর্য্যন্ত যথেষ্ট মাতৃস্তনদুগ্ধমাত্র পান করিবার সুবিধা পায়, তাহার স্বাস্থ্যের ভিত্তি অতিশয় দৃঢ়রূপে গঠিত হইয়া ওঠে। সেই স্তনদুগ্ধ শিশুর পক্ষে যথেষ্ট পাইবার একমাত্র উপায়, প্রসূতিকে উপযুক্ত পরিমাণ আহার্য্য দেওয়া। প্রসূতিকে পুষ্টিকর আহার্য্য হইতে বঞ্চিত করা, শিশুকে তাহার স্বাভাবিক সহজপাচ্য বলকারী মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত করারই নামান্তর মাত্র।

প্রসবের পর প্রসূতির অবস্থা।

শিশুর যত্ন ও লালনপালন স্নেহাতুর ও কর্ত্তব্যপরায়ণ জনক-জননী

যে দরদ লইয়া করিবেন, বেতনভোগী ভৃত্যাদি দ্বারা কদাপি তাহা সম্ভব নহে। ভৃত্যাদি রাখিবার সঙ্গতি থাকিলেও তাহাদের উপর শিশুর সর্ব্বাঙ্গীন তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া জনক-জননী কদাপি নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। যে পিতামাতা আপন সন্তানকে কেবল মাত্র ভৃত্যাদির হেপাজতে রাখিয়া আত্মসুখে বিভোর হইয়া থাকেন, তাঁহাদের বার্দ্ধক্যে ও ব্যাধি-পীড়ায় ভৃত্যাদির উপর পিতামাতার ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হৃদয়ে নিজের ভার্য্যাদি লইয়া সুখভোগে মত্ত থাকা সেই শিশুর পক্ষে অন্যায় বা অসম্ভব নহে। সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য পিতামাতা পূর্ণভাবে পালন করিলে সেই সন্তানেরই পিতামাতার বার্দ্ধক্যে আপন কর্ত্তব্য পালনের যোগ্যতা অর্জ্জন করা সম্ভব। আগে সন্তানের যোগ্য পিতামাতা হইলে, তবেই যোগ্য সন্তানের সেবা শুশ্রূষা আশা করা যায়।

সন্তানাদি হইলে কোন কোন স্ত্রী কেবল নিজের শিশুটী লইয়াই এত ব্যস্ত থাকেন যে, স্বামী ও সংসারের প্রতি উদাসীন হইয়া পড়েন। ইহা অতিশয় অন্যায়। প্রত্যেক জননী আপন আপন শিশুকে ভালবাসেন। মায়ের এই বুকভরা ভালবাসাই শিশুর জন্ম হইতে তাহার আজীবন ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। মাকে স্নেহের কথা বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। পিতামাতা, ভাইভগ্নী লইয়া জীবনের স্নেহ ভালবাসার এক অঙ্ক শেষ না হইতেই স্বামীর সঙ্গে ভালবাসার বন্ধনে যাঁহাকে আবদ্ধ হইতে হয়, স্বেচ্ছায় সানন্দে স্নেহধারা দানে যাঁহাকে সন্তান পালন করিতে হয়, স্নেহের বশে যিনি আপন দেহের রস, মেদ, মজ্জাকে ভাগ করিয়া দিয়া সন্তান গর্ভে ধারণ করেন, তাঁহাকে স্নেহের কথা বলিবার কিছুই নাই কিন্তু স্নেহান্ধতা অতিশয় দোষাবহ ইহাই মাত্র বক্তব্য। স্নেহান্ধ জনক-

জননী কদাপি সন্তানের পরিমিত পানাহার ও শাসনের ব্যবস্থা করিতে পারেন না। কাজেই অনেক স্থানে চরিত্রহীন, স্বাস্থ্যহীন, বলবীর্য্য আয়ুহীন সন্তান জনক-জননী, আত্মীয়, স্বগন, সমাজ, স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া পিতামাতার সীমাহীন মনোবেদনার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। সন্তান বিপথগামী হওয়া যে কি নিদারুণ যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণা যে জনক-জননীর নিকট কি বিষম পীড়াদায়ক, সে পীড়ার দহন যে কত মর্ম্মান্তিক, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরের কল্পনা করাও অসম্ভব। সময় থাকিতে আমি জননীদিগকে এ বিষয়ে সাবধান হইতে বলি। অনেক স্নেহান্ধ জনক-জননী জীবনব্যাপী অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছেন, অবিরাম চক্ষের জল ঢালিয়াও সে অনল নিভাইতে পারেন নাই। স্নেহান্ধ হইয়া যে সন্তানকে কোন দিন শাসন করেন নাই, তাহার অন্যায় আব্দারে প্রশ্রয় দিয়াছেন, অপরে শাসন করিলেও মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, সেই সন্তান যৌবনে পিতামাতার সকল প্রকার শাসন, কাকুতি-মিনতি অবহেলায় দলিয়া সংসারকে উৎসন্ন দিয়াছে, এরূপ ঘটনা দেখা যায়। দুস্থ, বৃদ্ধ, নিরন্ন পিতা ঘরের কোণে পড়িয়া সতত নিজের মৃত্যু কামনা করিয়াছেন, দুঃখিনী বিধবা জননী এক হাতে চক্ষের জল মুছিয়াছেন, আর উশৃঙ্খল পুত্র বধূ সহ রঙ্গ-কৌতুকে মগ্ন হইয়া দিন যাপন করিয়াছে, পিতা বা মাতার কথায় কর্ণপাতও করে নাই, এরূপ ঘটনা এ দেশে বিরল হইলেও দুর্লভ নহে। স্নেহান্ধ জনক-জননী এই সব কথা স্মরণ করিয়া সময় থাকিতে সাবধান হইবেন। স্নেহবশে শিশুর কোন অন্যায় জেদ কখনও পূর্ণ করিবেন না। অবিরত এইরূপ জেদ পূর্ণ করিলে ক্রমশঃ ইহা তাহার

জননীর স্নেহান্ধতা।

প্রকৃতিগত হইয়া পড়িবে, আর তাহা ত্যাগ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না।

শিশুকে যখন তখন খাইতে দিতে নাই, আহারের সময় নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। স্নেহান্ধতা বশতঃ যখন চাহিবে বা যখন কাঁদিবে তখনই খাইতে দিতে নাই, তাহাতে পরিপাক শক্তি কমিয়া যায়। আহার্য্য সম্বন্ধে অতিরিক্ত সাবধানী হইয়া আবার শিশুকে শুকাইয়া মারাও উচিত নহে। সকল প্রকার পুষ্টিকর আহার্য্যই বয়স ও সময়োপযোগী মাত্রায় শিশুকে খাইতে দিয়া সকল প্রকার খাদ্যের সঙ্গেই অল্প বিস্তর তাহার পরিচয় রাখা ভাল। কেবল লঘুপাচ্য রোগীর আহার খাওয়াইয়া রাখিলে ভবিষ্যতে সে কিছুই পরিপাক করিতে পারিবে না।

শিশুকে খাদ্য দেওয়া।

অনেক পিতামাতার চাপানের অভ্যাস আছে। বিশেষজ্ঞগণের মতে চার সামান্য একটু উত্তেজনা শক্তি ভিন্ন আর কোন গুণতো নাই-ই, দোষ অনেকই আছে। চাপানের নামে বিষপানের কুফলের কথা আমি এখানে আর বিশেষ করিয়া লিখিবার প্রয়োজন দেখি না। এ সম্বন্ধে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রপ্রমুখ বহু মনীষী ব্যক্তিরা বহুকাল হইল বধির দেশবাসীর নিকট নানাভাবে নিষ্ফল চীৎকার করিয়া আসিতেছেন। বহুকষ্টে উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা এমন বিষ যদি পিতামাতার না খাইলেই নয়, তবে শিশুকে অন্ততঃ সে বিষপানে অভ্যস্ত করান কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। চাপান একটী গুরুতর নেশা। ইহা দীর্ঘ দিন ব্যবহারে অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ রোগ হইতেও দেখা যায়। জনক-জননীরা যখন প্রভাতে হাতমুখ ধুইয়া,

চাপান, না বিষপান।

কেহ কেহ বা না ধুইয়াই, খালিপেটে মহা আগ্রহ ও পরম পরিতৃপ্তির সহিত দুর্ব্বল ও ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়াও এই বিষ পান করেন, তখন শিশুটীর মুখে ঐ বিষপাত্র তুলিয়া দিয়া তাহার অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যের মূলে কুঠারাঘাত না করিয়া, এক বাটী বল্‌কা দুধ দিলে পরম উপকার দর্শিবে। যাঁহারা চাপানকে জীবনের এক অতি উপাদেয় ও অবশ্য পানীয় বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা অন্ততঃ পনরটা দিন চাপান বন্ধ রাখিয়া তৎপরিবর্ত্তে বল্‌কা দুধ ব্যবহার করিলেই উভয়ের গুরুতর ব্যবধান বুঝিতে পারিবেন।

পিতামাতার কদভ্যাস।

পিতামাতার কোনরূপ কদভ্যাসে শিশুকে অভ্যস্ত করাইতে নাই। যথাসাধ্য নিজেদের কদভ্যাসগুলি পরিহার করাই মানুষের কাজ। মানুষ আন্তরিক চেষ্টা করিলে সকল প্রকার অভ্যাসই ধরিতে ও ছাড়িতে পারে। কোন কু অভ্যাস যদি একান্ত না-ই পরিত্যাগ করা যায়, তবে পুত্রকন্যা যাহাতে সেই অভ্যাসে অভ্যস্ত হইয়া না পড়ে সে জন্য বিশেষ সতর্কতার সহিত চলিতে হইবে। মাতালের ছেলে মাতাল, চাখোরের ছেলে চা খোর, যে গৃহিণীরা দোক্তা খান তাঁহাদের কন্যারা দোক্তাখোর ইত্যাদি হওয়া অবাঞ্ছনীয়। শিশুদের কোমল হৃদয় অতিশয় অনুকরণপ্রিয়, তাহারা পিতামাতাকে যাহা করিতে দেখিবে স্বভাবতঃ তাহারও তাহাই করিতে চাহিবে, ইহা অতি বড় সত্যকথা। অতএব আপন আপন শিশুদের উচ্চাদর্শে গঠিত করিবার অভিলাষ থাকিলে, সকল প্রকার কু অভ্যাস বর্জ্জন করিয়া চলাই পিতামাতার একান্ত কর্ত্তব্য।

শিশুর যখন জ্ঞানের বিকাশ হইতে থাকে, তখন এই ধরিত্রীর সঙ্গে

পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার মনে প্রবল হইয়া জাগিয়া ওঠে। তাই সে তাহার দুই চক্ষে যাহা দেখিতে পায় তাহার সম্বন্ধেই নানারূপ প্রশ্ন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। এ সময় তাহার প্রতিপ্রশ্নের সন্তোষজনক সত্য উত্তর অতি সোজা কথায় তাহাকে দিতে হইবে, কদাচ বিরক্ত হইয়া একটা যা-তা জবাব দিয়া বা মিথ্যা জবাব দিয়া তাহার মনে কোন বিষয় সম্বন্ধেই ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইতে নাই, বা বিরক্ত হইয়া ধমক দিয়া থামাইয়া দিয়া তাহার জ্ঞানপিপাসাকে ক্ষুণ্ণ করিতে নাই। যে বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে পিতামাতা শিশুকে যেরূপ শিক্ষা দিবেন, সে তাহাই অভ্রান্ত ও সত্য বলিয়া অতি সরলভাবে গ্রহণ করিবে। শৈশবে শিশুর দৈহিক উন্নতি দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। সুতরাং তাহার জন্য পুষ্টিকর খাদ্যাদি অতিশয় প্রয়োজন, নতুবা দেহের পরিপূর্ণ গঠন কখনই সম্ভব নহে। তাহার চিত্তবৃত্তিও এ সময় তেমনই পরিস্ফুট হইতে থাকে। সেই সব বৃত্তি যাহাতে অবাধে সত্যপথে বিকসিত হইতে পারে পিতামাতার তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখাও একান্ত কর্ত্তব্য, নতুবা তাহার জ্ঞানাঙ্কুর অপরিপুষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে।

শিশুর জ্ঞানোন্মেষ কাল।

কদাচ শিশুকে অকারণে ভূত-প্রেতের ভয় দেখাইতে নাই। কোন স্থান, কাল, বৃক্ষ, ব্যক্তি বা জাতি সম্বন্ধে ভয়সূচক ভ্রান্ত ধারণা তাহার মনে প্রবেশ করিতে দিতে নাই। ইহাতে তাহার সাহসের বৃত্তি নষ্ট হইয়া যায়। আমরা স্বাস্থ্যে অতিশয় দুর্ব্বল ও একতাবিহীন জাতি বলিয়া স্বভাবতঃই আমরা ভীরু স্বভাব সম্পন্ন। এই ভীরুতা ও একতাহীনতার সুযোগ পাইয়া আমাদের

অমূলক ভীতি প্রদর্শন।

অপেক্ষাও দুর্ব্বল অনেকে আমাদের উপর কথায় অকথায় অত্যাচার করিয়া থাকে, আমরা তাহার প্রতিবিধান করিতে পারি না। আমাদের জননীগণও শৈশব হইতে সন্তানকে কেবল লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগী করিয়া আপনার অঞ্চলাশ্রয়ে আপনার শিশুটীকে রাখিয়া গৃহকোণে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে ভালবাসেন। কোন প্রকার সাহস, শক্তি বা তেজস্বিতার কার্য্যেই আমরা শিশুদিগকে উৎসাহিত করি না ও তাহার চর্চ্চা করিতেও বড় একটা জেদ করি না। লেখাপড়া কিছু কিছু করিলেই আমরা সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আশান্বিত ও নিশ্চিন্ত হইতে অভ্যস্ত। কোনপ্রকার মারামারি, দাঙ্গাহাঙ্গামার নামেও আমরা শিশুদিগকে আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তুলি। কাজেই আমরা যখন সেই বিপদে বিপদাপন্ন হই, তখন আমাদের দুরবস্থার আর সীমাপরিসীমা থাকে না। গুণ্ডামী, মারামারি, দাঙ্গাহাঙ্গামা যাচিয়া করিবার দুঃসাহস অর্জ্জন করিতে আমি কাহাকেও বলি না, কিন্তু গুণ্ডা ও দাঙ্গাহাঙ্গামাকারীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার শক্তি ও সৎসাহসই আমি অর্জ্জন করিতে বলি।

সৎসাহস অর্জ্জন কর্ত্তব্য।

একটু সাহস ও শক্তির অভাবে ভীরুস্বভাব বাঙ্গালীকে পথেঘাটে, রেলে ষ্টীমারে অনেক সময় নানাভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে দেখা যায়। যে শ্মশান বা গোরস্থানের পাশ দিয়া অথবা কোন বৃক্ষবিশেষের নিকট দিয়া যাইতে বাঙ্গালী ভিন্ন অন্য কোন জাতির কেহ এতটুকুও ইতস্ততঃ করে না, মিথ্যা ভূত-প্রেতের ভয়ে আমরা রাত্রিতে অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসিয়াও সে স্থান বা কালের কথা মনে করিয়া শিহরিয়া উঠি। ইহা স্নেহান্ধ জনক-জননীর শৈশব শিক্ষারই পরিণাম। মনুষ্যজীবনের সকল

প্রকার অপরিহার্য্য ও অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়া, কেবলমাত্র কয়েকখানি বই বা নোট মুখস্থ করিয়া ধরিত্রীর যে কোন প্রান্তে কোন প্রকারে বাঁচিয়া থাকিবার একটু সুবিধা করিবার জন্য দলে দলে ভিড় করিয়া চলিয়াছি। আমাদের সন্তানদিগকেও সেই পথে অন্ধের ন্যায় টানিয়া আনিতেছি, ইহা ধ্বংসেরই পূর্ব্ব লক্ষণমাত্র। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, মানুষের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঁচিতে হইবে, তাহার একটীকেও বাদ দিলে চলিবে না। সাহসের কার্য্যাদিকে যাঁহারা গুণ্ডামী আখ্যা দিয়া থাকেন, তাঁহারা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন, গুণ্ডার অত্যাচার হইতে আমাদের পুরস্ত্রীকে রক্ষা করিতেও অনেক স্থলে আমরা অক্ষম, দুর্ব্বৃত্তের লুণ্ঠনে বাধাদানে শক্তিশূন্য হইয়া আমরা বহুস্থানে ধন, প্রাণ, মান হারা হইতেছি। কথায় অকথায় আমরা অপরের ভীতিপ্রদর্শনে আপনাদের অধিকার ত্যাগ করিয়াও 'মান' লইয়া সন্তুষ্ট থাকি। দেহে বল, হৃদয়ে সাহস ও একতা থাকিলে এ দুর্গতি আমাদের ঘটিত না।

সৎসাহস গুণ্ডামী নহে।

শিশুর গায়ের জামাকাপড় খুব সাদাসিধে, অল্পদামী ও শীতাতপ নিবারণোপযোগী হওয়া প্রয়োজন। শিশুর জননী আবশ্যকীয় জামা নিজের হাতে সেলাই করিয়া দিলে খরচের অনেক সাশ্রয় হয়। শৈশব হইতে নিতান্ত সাদাসিধে অনাড়ম্বর অথচ পরিষ্কার জামা-কাপড়ের প্রতি যাহাতে শিশুর মন যায় ও তাহাতেই সে সন্তুষ্ট থাকে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। কোন পূজাপার্ব্বণ বা উৎসব উপলক্ষে সাধ্যমত দুই একখানি ভাল

শিশুর জামাকাপড়।

জামাকাপড় সকল পিতামাতাই তাঁহাদের শিশুদিগকে দিয়া থাকেন কিন্তু সাধ্যাতীত না হইলেও সর্ব্বদা মূল্যবান্ রংবেরং এর জামাকাপড় শিশুকে ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত করিলে তাহার বিলাসিতাকেই ভিতরে ভিতরে জাগ্রত ও লালিত করা হয় মাত্র। স্বাস্থ্যের সঙ্গে ঐ সব জামাকাপড়ের কোন যোগ নাই। বিলাসিতা ব্যসন ও পাপজ্ঞানে সর্ব্বদা পরিত্যজ্য। শিশুকে সে পাপে লিপ্ত করিলে জনক-জননী ভবিষ্যতে তাহার ফলভোগী অবশ্যই হইবেন। অর্থ থাকিলে তাহা দ্বারা বিলাসিতা ভিন্ন মানবোচিত বহু উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ কার্য্যে তাহা ব্যয় করিবার সময়াভাব জীবনে হয় না।

কোন ধনী গৃহের শিশুদের জামাকাপড় বা গহনাপত্র দেখিয়া স্ত্রী কদাচ আপনার শিশুর জন্য তদনুরূপ বস্ত্রালঙ্কার অক্ষম ও দরিদ্র স্বামীর নিকট চাহিবেন না। ছেলে-মেয়েকে জামাকাপড় ও অলঙ্কারাদি দিতে এক দুশ্চরিত্র পিতা ভিন্ন কাহার না সাধ হয়? দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত স্বামী সংসারের ব্যয় বাহুল্য সঙ্কুলান করিয়া আপন স্ত্রী ও শিশুদিগকে তাহা দিতে না পারিয়া এমনইতো মরমে মরিয়া থাকেন। তাহার উপর আপন স্ত্রী আবার তাহাকে সেই বিষয় লইয়া উত্যক্ত করিলে তাঁহার মনোবেদনার আর সীমা থাকিবে না। স্বামীর মনে অযথা কষ্ট দেওয়া স্ত্রীর অমার্জ্জনীয় অপরাধ। স্ত্রী নিজে সর্ব্বদা সাদাসিধে ভাবে থাকিবেন, সন্তানাদিকেও সেই ভাবে থাকিতে অভ্যস্ত করাইবেন। অপরের বিলাস-ব্যসন দেখিয়া কদাচ মনে ক্ষোভ আনিবেন না এবং নিজে তাহা আকাঙ্ক্ষা করিয়া দুঃখ বরণ করিয়া লইবেন না। সরল, অনাড়ম্বর ও নিরহঙ্কার জীবনযাপনই ধর্ম্ম ও সত্যপথের অন্যতম সহায়ক এবং গৃহধর্ম্মে মানবজীবনের অন্যতম তপস্যা।

পাঁচ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে এবং নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তৎপরেও পিতা-মাতা কেহই শিশুর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিবেন না। পিতামাতা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন, শিশুর দোষে অবোধ রোষে। সংসারে যাহার ভালমন্দ হিতাহিত কোন জ্ঞানই হয় নাই, যে এই পৃথিবীতে নূতন আসিয়াছে, অন্যায় দোষত্রুটী তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। দৈহিক শাসন অপেক্ষা স্নেহের শাসন অনেকগুণে কার্য্যকরী। স্নেহের শাসন দ্বারা সন্তানকে আজীবন শাসিত করা চলে, সে শাসনপাশে আজীবন সন্তানকে আবদ্ধ রাখা যায়, কিন্তু কারণে অকারণে দৈহিক শাসনের পরিণাম অতিশয় খারাপ। দৈহিক শাসনের মাত্রা শাসকও যেমন কোনদিন স্থির রাখিতে পারেন না, শাসিতও তেমনি ক্রমশঃ শাসনকে দলিয়া চলিতে চায়, আর কখনও তাহাকে শাসনের সীমার মধ্যে আনা চলে না।

দৈহিক শাসন।

শিশুদের নামকরণ বিষয়ে জনক-জননী বিশেষ সাবধান হইবেন। নাম যা' হয় একটা রাখিলেই হইল, এই ধারণা অনেকের আছে, ইহা অনুচিত। যে নামে পুত্র একদিন বিশ্ব বিশ্রুত হইতে পারেন, যে নাম কন্যার একটী অলঙ্কারের তুল্য, তাহা কদাচ হেলার চক্ষে দেখিতে নাই। যা'র তা'র উপর নাম রাখিবার ভারও দিতে নাই। ইহারই ফলে পেঁচো, কেলো, হুলো, খেঁদা, পুঁঠী, পটলী, খেঁদি প্রভৃতি নামের উদ্ভব হইয়াছে। যাহারা জনক-জননীর প্রিয়বস্তু, তাহারা যে নামে জগতে পরিচিত হইবে, সে নাম কখনই সামান্য বস্তু হইতে পারে না। পরিবারে সর্ব্বাপেক্ষা সদ্বিবেচক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি শিশুর আকৃতি, প্রকৃতি দেখিয়া যথাসম্ভব পূর্ব্বপুরুষগণের নামের সহিত

শিশুর নামকরণ।

সমতা রক্ষা করিয়া শিশুর নাম রাখিবেন। বিবেচনাপূর্ব্বক নাম রাখিলে সে নাম আজীবন অঙ্গের ভূষণ হইয়া থাকিতে পারে, অশোভন হয় না।

যে ছেলে কালো বা কুৎসিৎ তাহার নাম রবীন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্র ইত্যাদি রাখিলে এবং কালো কুশ্রী মেয়ের নাম সৌদামিনী, প্রভা প্রভৃতি রাখিলে যেরূপ বেমানান হয়, সুশ্রী ছেলের নাম খ্যাঁদা, হুলো আর সুশ্রী মেয়ের নাম খেঁদি পটলী প্রভৃতি রাখিলেও ঠিক তেমনি অবিচার করা হয়। আবার আধুনিক রুচি অনুসারে যে মেয়ের নাম রাখা হইল কণিকা, তিনি বয়স কালে পাঁচমণ ওজনের মাংসপিণ্ডে পরিণত হইলেন, যে ছেলের নাম রাখা হইল বীরেন্দ্র তিনি যৌবনেই রুগ্ন, ভগ্নস্বাস্থ্য, চশ্‌মা-ধারী হইয়া কোন প্রকারে লাঠি আশ্রয় করিয়া চলিতে লাগিলেন, ইহাও নামের অপব্যবহার মাত্র। এমন নাম রাখিতে হইবে, যাহা সকল বয়সে সকল অবস্থায়ই বেশ খাপ খাইয়া যায়। এখন একটী কথা উঠিতে পারে যে, কোন্ মেয়ে ভবিষ্যতে কতখানি ওজনের হইবেন্ এবং কোন্ ছেলে বীরত্বে শ্রেষ্ঠ হইবেন, শৈশবে তাহা কেমন করিয়া বুঝা যাইবে? তাহা ঠিক্, বাস্তবিকই তাহা বুঝিবার উপায় নাই; কাজেই এমন নাম রাখা উচিত, ক্ষেত্র বিশেষে বয়স, অবস্থা ও প্রকৃতির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না থাকিলেও তাহা বেশ মানান সই হয়। প্রাচীনকালে ভগবান ও ভগবতীর নামানুসারে প্রায় সকলেরই নাম করণ হইত, যেমন ঈশ্বরচন্দ্র, রামমোহন, মধুসূদন, আশুতোষ, গুরুদাস, কেশবচন্দ্র, দুর্গাবতী, নারায়ণী, দয়াময়ী, ভবানী ইত্যাদি। তৎপরবর্ত্তী যুগেও নাম ভাল ছিল, যেমন প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশ, সতীশ, যতীন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, বাসন্তী মৃণালিনী, উর্ম্মিলা ইত্যাদি।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে নাম লইয়া বড় গোলযোগ বাধিয়াছে। এখন অনেক নাম শুনিয়া বুঝিবার উপায় নাই, তাহা মেয়েছেলের, কি ব্যাটাছেলের নাম। আমরা পুরুষ জাতি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা পুরুষত্ব বলবীর্য্যহীন, তাই কথায় বার্ত্তায়, হাব ভাবে, চাল চলনে মেয়েলী ছাদ ধরিয়াছি, নিজেদের নামটীকে পর্য্যন্ত মেয়েলী ভাবাপন্ন করিয়া আপনাদিগকে এক হেঁয়ালীতে রূপান্তরিত করিয়া তুলিতেছি, পুরুষোচিত নামে আমাদের অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে।

মালক্ষ্মীরাও অনেক স্থলে আপনাদের নামের আদি, অন্ত, মধ্য ইচ্ছামত ছাঁটিয়া ফেলিয়া দিয়া নামের মেয়েলী প্রভাবটুকু পরিত্যাগ করিতেছেন।

কথাবার্ত্তা, হাব ভাব, চাল চলনে এক উল্টাবৃত্তি দেখা দিয়াছে। পুরুষ ও নারী উভয়ে উভয়ের ধর্ম্ম যথাযথ পালন করিবার শক্তিহারা আমরা হইয়াছি বলিয়াই বোধ হয় এই বিভ্রাট বাধিয়াছে।

উল্টাবৃত্তি।

পুরুষোচিত বলবীর্য্য, তেজ পূর্ণমাত্রায় পুরুষের মধ্যে থাকিলে এবং নারীত্ব ও মাতৃত্বের অক্ষুণ্ণ গৌরব ও নারীসুলভ লাজ লজ্জা নারীর মধ্যে ফুটিয়া উঠিলে বোধ করি এই উল্টাবৃত্তি জাগিতে পারিত না।

পুরুষত্ব, মনুষ্যত্ব, তেজস্বিতা, স্বাস্থ্যের অভাবে বাঙ্গালী আমরা আজ নির্ব্বীর্য্য, মরণোন্মুখ, আমাদের ঘরের লক্ষ্মীরাও স্বাস্থ্যহীনা, রুগ্না, কুশিক্ষার প্রতি আগ্রহান্বিতা, অনেক স্থলে যৌবন ও মাতৃত্ব হইতে বঞ্চিতা, তাই আমাদের জাতির পুষ্টির আশাও বৃথা।

আমরা পুরুষ জাতি যদি আজ মানুষের মত চলিতে পরাণ পণ করিতাম, বলবীর্য্য, তেজ, ক্ষমতা, সত্য, স্বাস্থ্য, ধর্ম্ম অর্জ্জনে ও রক্ষণে

উঠিয়া পড়িয়া লাগিতাম, আর আমাদের ঘরে ঘরে আমাদেরই গৃহলক্ষ্মীদের যদি স্বাস্থ্যে, শক্তিতে, তেজে, বীর্য্যে, নারীত্বে, মাতৃত্বে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিতাম, তাঁহাদের অবজ্ঞাত ভূলুণ্ঠিত মৃতপ্রায় নারীত্বকে আমরা আমাদের পুরুষোচিত ও মনুষ্যোচিত ব্যবহার দ্বারা জাগ্রত করিয়া লইতে পারিতাম, তবে এই সব উল্টা ও অন্যায় বৃত্তি আসিতে পারিত না।

জাতি আজ মুমূর্ষু।

ব্যায়ামের অভাবে, স্বাস্থ্যের অভাবে, সত্যধর্ম্ম মনুষ্যত্বের অভাবে, অন্ন-জল-বস্ত্রের অভাবে, জাতি আজ মুমূর্ষু। যাহাকে আশ্রয় করিয়া বংশ, সমাজ, স্বদেশ বাঁচিয়া থাকে সেই অক্ষুণ্ন নারীত্ব ও মাতৃত্ব হইতে জাতি আজ বঞ্চিত, তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার কথা, আপনাদের বাঁচিবার সমস্যা আমাদের চিন্তার বহির্ভূত! কত তুচ্ছ বিষয় লইয়াই না আমরা আজ মাথা ঘামাইয়া মরিতেছি।

শিশুর হাতে খড়ি দিবার আগে।

শিশুর জ্ঞানোন্মেষ হইতে থাকিলে হাতে খড়ি দিবার পূর্ব্বেও হাসি-গল্পচ্ছলে তাহাকে যুক্তাক্ষর বিবর্জ্জিত ভগবান বিষয়ক স্তোত্র ও নানারকম আমোদজনক ছড়া শিখান কর্ত্তব্য। ক্রমে ক্রমে পৌরাণিক উপাখ্যান, হিতোপদেশ পূর্ণ গল্প, ডন্‌গীর ব্যায়ামবীরদের অদ্ভুত শারীরিক বল ও বিচিত্র কৌশলাদির কথা অতি সহজ ভাষায় চিত্তাকর্ষক করিয়া গল্প করিলে তাহাতে শিশু আকৃষ্ট হইয়া প্রতিদিন সেই সব গল্পের জন্য ব্যগ্র হইবে। দুই চারিদিন ক্রমান্বয়ে শিশুদের নিকট তাহা বলিয়া শেষে সেই সব গল্প শিশুকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার মেধা ও স্মৃতিশক্তির

পরিচয় লওয়া কর্ত্তব্য। একবারে বলিতে না পারিলে নিজে দশ বার বলিয়া দিতে হইবে, তাহাতে রাগ করিয়া বা বিরক্ত হইয়া তাহার স্মৃতি-শক্তির বিকাশে বাধা দান করা অনুচিত। ধীরে ধীরে তাহাদিগকে ধ্রুব, প্রহ্লাদ, বৃষকেতু প্রভৃতির উপাখ্যান ও মেয়েদিগকে সীতা, সাবিত্রী, শৈব্যা প্রভৃতির কাহিনী শিখাইয়া প্রকারান্তরে তাহাদের মনে ধর্ম্মের বীজ বপন করিয়া দেওয়া এবং নানাভাবে তাহা লালন করা পিতামাতার অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, একমাত্র ধর্ম্মই মানুষকে পশু হইতে তফাৎ করিয়া রাখিয়াছে। কাজেই আমরা সাধারণতঃ যাহাকে ধর্ম্মকর্ম্ম বলিয়া বোধ করি, সেই কর্ম্মের প্রেরণা জ্ঞানোন্মেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিতে হইবে। উত্তরকালে সেই বীজ মহা মহীরূহে পরিণত হইয়া শান্তিচ্ছায়ায় চারিদিক ব্যাপ্ত করিয়া রহিবে। সেই প্রেরণা হয়তো একদিন তাহাকে বহু উচ্চে টানিয়া লইয়া যাইবে, সংসারের শত ঝড় ঝঞ্ঝাতেও সে অচল অটল হইয়া আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতে পারিবে।

শিশুর প্রাতঃকৃত্যাদি।

প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে যখন জনক-জননী শয্যা ত্যাগ করিবেন, শিশুকেও সেই সঙ্গে শয্যা ত্যাগ করিতে অভ্যস্ত করাইবেন। যে গৃহের গৃহী ও গৃহিণী সূর্য্যোদয়ের পর শয্যা ত্যাগ করেন, সে গৃহের সকল কার্য্যেই আলস্য, সময়ের অভাব ও বিশৃঙ্খলা লাগিয়াই থাকে। শয্যা ত্যাগ করিয়া বিছানায় বসিয়াই এবং প্রয়োজন হইলে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া নিজেরা সেই আধ আলো আধ অন্ধকারে নিশান্তের অচঞ্চল মনোহারী নিস্তব্ধতায় বসিয়া একান্ত মনে ভগবান বিষয়ক স্তোত্র পাঠ ও সঙ্গীতাদি করিবেন।

শিশুকেও তাহাই করিতে অভ্যস্ত করাইবেন। তারপর আরাধনা করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন না হইয়া থাকিলে তাহা করিবেন। শিশুকে নিয়মিত ভাবে তাহা করিতে শিক্ষা দিবেন। বাহ্যের বেগ হউক বা না হউক শিশু যাহাতে প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে পায়খানায় যায় এবং হাতমুখ ধোয়া, দাঁত মাজা, জিভ্ ছোলা প্রভৃতি রীতিমত করে জনক-জননী তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। এই অভ্যাস শিশুর জীবনে যাহাতে বদ্ধমূল হয় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে দন্তপংক্তি কেবল মুখেরই সৌন্দর্য্য নহে, ইহা পরিপাক ক্রিয়া ও স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহায়ক। অনেক পিতামাতা নিজেরাও দাঁত ও মুখের উপযুক্ত যত্ন ল'ন না এবং শিশুদিগকেও যত্ন লইতে শিক্ষা দেন না। সকালে উঠিয়া কোন মতে চোখে মুখে একটু জল দিতে পারিলেই যেন কর্ত্তব্য শেষ হয়, ইহা অতি কদভ্যাস। দাঁত, জিভ্ ও মুখ সর্ব্বদা পরিষ্কার না থাকিলে মুখে বড়ই দুর্গন্ধ হয়, দাঁতের পীড়া হয়, সেই পীড়া হইতে পাকস্থলীর পীড়াও আরম্ভ হয় এবং দাঁত শীঘ্রই নষ্ট হইয়া মানুষকে সৌন্দর্য্যহীন, ভগ্নস্বাস্থ্য ও অকাল বৃদ্ধ করিয়া ফেলে। অনেক তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্র যুবক ও বৃদ্ধকে দাঁত ও মুখের যত্ন লইতে উদাসীন দেখিয়াছি। দুর্গন্ধের ভয়ে তাহাদের নিকট গিয়া কথা কহিতেও অপরে সঙ্কোচ বোধ করে। মানুষের যত প্রকার ব্যাধি হয়, তাহার অধিকাংশের বীজাণুই মুখ দিয়া দেহে প্রবেশ করে। সর্ব্বদা অপরিষ্কৃত দুর্গন্ধ দাঁত ও মুখ লইয়া থাকিলে দেহ ব্যাধির লীলাভূমি হইবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন হইলে শিশুকে লইয়া প্রাতর্ভ্রমণ করা কর্ত্তব্য।

প্রাতর্ভ্রমণ আনন্দদায়ক, নয়নমনমুগ্ধকর, আয়ু, তেজ ও বলবর্দ্ধক। অম্ল, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, ফুসফুসের ব্যাধি ও অন্যান্য বহু ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রাতর্ভ্রমণে অশেষ উপকার লাভ করিতে পারিবেন, ইহা বহু পরীক্ষিত। প্রাতর্ভ্রমণে কর্ম্মক্ষমতা, উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তি অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। প্রথম ২।৪ দিন সকালে শয্যা ত্যাগ করিতে একটু কষ্ট বোধ হয়, শেষে অভ্যাসগত হইয়া আসিলে ইহার প্রয়োজনীয়তা ও অশেষ উপকারিতা উপলব্ধি করা যায়। আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেরই এই নির্ম্মল আনন্দদায়ক ও তেজবর্দ্ধক অভ্যাস সযত্নে রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

প্রাতর্ভ্রমণের উপকারিতা।

রৌদ্র উঠিবার পূর্ব্বে প্রাতর্ভ্রমণ শেষ করিয়া শিশু ঘরে ফিরিয়া আসিলে তাহাকে আবশ্যকীয় পাঠ্য পুস্তক লইয়া বসিতে অভ্যাস করাইতে হইবে। ভয় দেখাইয়া বা তাড়না করিয়া প্রথম হইতেই কদাপি শিশুকে পড়াইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে। অতিরিক্ত মারধর করিয়া ধমকাইয়া শিশুর ভয় ভাঙ্গিয়া দেওয়া এবং তাহাকে মার খাইতে অভ্যস্ত করা কোনক্রমেই উচিত নহে। প্রথম প্রথম অল্প সময় পড়াইয়া ক্রমশঃ তাহার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠের সময় বৃদ্ধি করিতে হইবে, কদাপি অতিরিক্ত পড়াইতে নাই বা যখন তখন পড়াইতে নাই। পড়ার আতঙ্ক যেন কোন প্রকারেই না জন্মে। যেটুকু পড়িবে স্বেচ্ছায় ও মনোযোগের সহিত পড়িলে জোর করিয়া ধরিয়া তাহার দশগুণ পড়ার সমান ফলদায়ক হইবে। শৈশব হইতেই শিশুদের হাতের লেখার প্রতি তাহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করা উচিত। শিশুরা লেখাপড়ায় ক্রমশঃ উন্নতি

পড়ার আতঙ্ক।

লাভ করিতে থাকিলে ভাল ভাল খেলনা, ছবি ও গল্পের বই প্রভৃতি তাহাদিগকে পুরস্কার দিয়া তাহাদের লেখাপড়ায় প্রীতি বাড়াইয়া দিতে হইবে। লেখাপড়ায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারিলে, ভবিষ্যতে নানারূপ সুবিধা হইবার সম্ভাবনা, এ ধারণা শিশুদের মনে জন্মাইয়া দেওয়া মন্দ নহে।

প্রতিদিন যথাসময়ে স্নানের পূর্ব্বে শিশুর সর্ব্বাঙ্গে অন্ততঃ পনর মিনিটকালব্যাপী সরিষার তেল মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিশু নিজে সক্ষম হইলে সে যাহাতে নিজেই তেল মাখিতে অভ্যাস করে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং এই অভ্যাস বদ্ধমূল হইয়া আসিলে ইহার উপকারিতা তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। তৈল মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে ঘৃত অপেক্ষা বহুগুণে কার্য্যকরী হয়, যদি প্রতিদিন স্নানের পূর্ব্বে ইহা দেহে উত্তমরূপে মর্দ্দন করা যায়। ইহা চর্ম্মরোগ নাশক, চর্ম্মের দীপ্তি ও কোমলতা বর্দ্ধক, বীর্য্য ও আয়ুবর্দ্ধক। তেল রীতিমত ব্যবহারে স্নানের সময় ঠাণ্ডা লাগিতে পারে না। এ হেন অশেষবিধ উপকারী সুলভ সহজলভ্য সরিষার তৈল আমাদের হাতের কাছে থাকিতে, দারিদ্র্যপীড়িত জাতি আমরা নানারূপ মূল্যবান সাবানের বিজ্ঞাপনে ও গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া কতপ্রকার চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছি, আবার তাহাই সারাইবার জন্য নানারূপ স্নো, পমেটম ব্যবহার করিয়া স্বাস্থ্য, অর্থ ও আয়ু নষ্ট করিয়া দেশের দারিদ্র্য নির্ব্বিচারে বাড়াইয়া হায় হায় করিয়া মরিতেছি।

তেল মাখার উপকারিতা।

স্নান মানুষের পক্ষে শ্রান্তিহারী, শান্তি ও আনন্দদায়ক, স্বাস্থ্য রক্ষার

সহায়ক। শরীর অসুস্থ না হইলে কদাপি শিশুকে অস্নাত রাখিতে নাই, বা থাকিতে দিতে নাই। গামোছা বা কড়্কড়ে তোয়ালে দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে মার্জ্জনা করিয়া ত্বকের উপরকার তেল উত্তমরূপে উঠাইয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

স্নান শ্রান্তিহারী।

শিশুকে ইহা করিতে অভ্যস্ত করিতে হইবে। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। দেহনির্গত ঘর্ম্মের সহিত বাহিরের ধূলাবালু জমিয়া আমাদের দেহস্থ অসংখ্য লোমকূপ বন্ধ হইয়া যায় ও দেহ হইতে ঘর্ম্মের সহিত শরীরের ক্লেদ বাহির হইয়া যাইতে পারে না, তাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষার বিঘ্ন উৎপাদন করে। নিয়মিত স্নানই ইহার প্রতিবিধান।

স্নানের পর স্বামী ও শিশুকে পরিষ্কৃত স্থানে সুন্দর আসনে বসাইয়া জলছড়া দিয়া মুছিয়া ঠাঁই করিয়া পরিষ্কার ঝক্ঝকে বাসনপত্রে অন্নব্যঞ্জন পরিচ্ছন্নভাবে পরিবেশন করিয়া পরম পরিতোষ সহকারে গৃহিণী তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবেন। আহারে বসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে হাত ও মুখ উত্তমরূপে প্রক্ষালন করিবার অভ্যাস করান অবশ্য কর্ত্তব্য। মুখের মধ্যে সর্ব্বদা নানাপ্রকার ব্যাধির বীজাণু থাকা সম্ভব। হাতমুখ পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া আহারে না বসিলে খাদ্যের সঙ্গে সেই সব বীজাণু উদরস্থ হওয়া অসম্ভব নহে। আহারের স্থান জলছড়া দিয়া মুছিয়া ঠাঁই করিবার প্রথা অতীব উত্তম, ইহাতে ধূলাবালু উড়িয়া খাদ্যের সঙ্গে মিশিতে পারে না। ধূলাবালুর সঙ্গে কতপ্রকার অপবিত্র ও অস্বাস্থ্যকর রোগোৎপাদক দ্রব্য মিশ্রিত থাকে তাহার ঠিকানা নাই। বর্ত্তমানে এই প্রথা অনেক স্থানে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমাদের প্রাচীন প্রথাগুলি একেবারে বাজে

ঠাঁই করার প্রয়োজন।

ও উদ্দেশ্যহীন নহে। তাহার প্রত্যেকটীর সঙ্গে স্বাস্থ্যের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে, ইহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই উপলব্ধি করা যায়। স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিলে মানব নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হইয়া সকল প্রকার রিপু জয় করিতে সক্ষম হইবে এবং মনুষ্যোচিত সকল ধর্ম্মই তাহা দ্বারা সাধিত হওয়া সম্ভব হইবে। এইজন্যই আমাদের বহুদর্শী ঋষি ও পূর্ব্বপুরুষগণ প্রতিপদক্ষেপে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেন এবং জীবনের প্রতিকার্য্যে নানারূপ আইন কানুন, বিধি নিষেধ দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মগুলি প্রতিপালন করিয়া ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য তাহা প্রচলিত করিয়া গিয়াছিলেন।

শিশু যাহাতে আহার্য্যের প্রতিটী গ্রাস উত্তমরূপে চিবাইয়া গলাধঃকরণ করে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আহার্য্য দ্রব্য চিবাইয়া দিবার জন্য পেটের ভিতর কেহ বসিয়া নাই, একথা জনক-জননীও হৃদয়ঙ্গম করিয়া বুঝিবেন এবং শিশুকেও তাহা বুঝাইয়া দিবেন। উত্তমরূপে চর্ব্বণ না করিয়া খাইলে, পৃথিবীর সমস্ত ঔষধ গুলিয়া খাইলেও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আহারের সময় জলপান না করিয়া থাকিতে পারিলেই ভাল, আহারের ২।১ ঘণ্টা পরে জল খাওয়া উত্তম প্রথা। শিশু যাহাতে লোভী, পেটুক ও গুরুভোজনে অভ্যস্ত না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বামী ও সন্তানাদির আহারের সময় তাহাদের আহার্য্য বাড়িয়া দিয়া গৃহিণী কদাপি অন্যত্র যাইবেন না। তাঁহাদের কাহার কি লাগে, না লাগে নিজে উপস্থিত থাকিয়া তাহা দেখিবেন ও প্রয়োজনীয় আহার্য্য আনিয়া দিবেন। অতিরিক্ত

চিবাইয়া খাওয়ার উপকারিতা।

স্নেহাতুর হইয়া উদরপূর্ণ হইবার পর পীড়াপীড়ি করিয়া শিশুকে কিছুই খাওয়ান উচিত নহে। ভূরিভোজনের পরও আদর করিয়া আরও কিছু আহার করার জন্য পীড়াপীড়ি করা বাঙ্গালী জাতির স্বধর্ম্ম, ইহা কদাপি করিতে নাই। যার যার আহার তার তার প্রয়োজন ও পরিমাণ মত হওয়াই কর্ত্তব্য। এ সব বিষয়ে আমরা বিদেশীর অনুকরণ করি না, কারণ এ অভ্যাস হিতকারী। তাঁহাদের সকল প্রকার কু অভ্যাসই আমাদের আদর্শ ও অনুকরণীয় জ্ঞান করি। স্বামী, পুত্রাদি ও গৃহের অন্যান্য গুরুজন, স্নেহভাজনদের আহার সমাপ্ত হইলে, গৃহিণী নিজে আহার সমাধা করিবেন, কদাচ তাহাতে অন্যথা করিবেন না।

গুরুভোজন অহিতকর।

আহারান্তে খুকুকে দুই একটী সেলাই শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করিবেন। তাহার পুতুলের ছোট ছোট জামা, ছোট রুমাল, বালিশের ওসাড় ইত্যাদি তাহাকে দিয়াই তাহার পুতুলের জন্য করাইতে চেষ্টা করিবেন। বেলা পড়িয়া আসিলে শিশুকে কিছু ফলমূল খাওয়াইয়া বেড়াইতে বা খেলিতে পাঠাইবেন। কদাপি এসময় গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন না। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা খেলিয়া বা বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিলে, কি কি খেলা তাহারা খেলিল, কাহার সঙ্গে খেলিল, কে হারিল, কে জিতিল, কোন্ খেলা সর্ব্বাপেক্ষা তাহাদের ভাল লাগে তাহা সস্নেহে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন।

জনক-জননীর কাহারো গান করার অভ্যাস থাকিলে, সন্ধ্যাকালে কিছুক্ষণ শিশুদিগকে গান শিখাইবেন। জনক-জননীর অভ্যাস না থাকিলেও সম্ভব হইলে গানের শিক্ষক রাখিয়া তাহাদিগকে গান

শিখাইবেন। প্রথম প্রথম ঈশ্বর বিষয়ক অতি সোজা ও সহজ সুরের গান তাহাদিগকে শিক্ষা দিলেই বোধ হয় ভাল হয়। দুই এক দিনে ঠিক সুর না ধরিতে পারিলে, পুনঃ পুনঃ দেখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, কদাচ রাগ করিয়া হাল ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে।

সঙ্গীত মানবের দুঃখসন্তাপহারী, মনমুগ্ধকারী এক অতি উচ্চদরের কলাবিদ্যা। ইহা অভ্যাস থাকিলে অনেক সময় সংসারের জ্বালা ভুলিয়া থাকা যায়। সঙ্গীত ভগবানকে ডাকিবার একটী অতি সহজ ও উৎকৃষ্ট উপায়। রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষদের কথা কে না জানেন? তাঁহারা মায়ের নাম গাহিতে গাহিতে আত্মহারা বিহ্বল হইয়া বাহ্যজ্ঞানহারা হইতেন। স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই এই বিদ্যা শিখিবার অধিকার আছে, তাহাতে লজ্জা বা সঙ্কোচের কিছুই নাই। বালক বালিকার কোমল কণ্ঠে ভগবানের নাম গান শুনিয়া কোন্ পাষাণ হৃদয় না দ্রব হয়? কদাচ ইহাকে লজ্জাকর বা হীনবিদ্যা মনে করিয়া ইহার প্রতি উদাসীন থাকিতে নাই।

সঙ্গীত অতি উচ্চবিদ্যা।

আট দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদের নিজ নিজ গৃহে বিদ্যাভ্যাস করান মন্দ নহে। তৎপর পুত্রকে নিজের সাধ্যায়ত্ত সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে পাঠানই কর্ত্তব্য। মেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবার সঙ্গতি ও সুযোগ-সুবিধা না থাকিলে গৃহেই তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।

ছেলেকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া ও মাস মাস বেতন গণিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কোনক্রমেই উচিত নহে। সম্ভব হইলে নিজের গৃহে নিজের

তত্ত্বাবধানে রাখিয়া ছেলেকে বিদ্যালয়ে পড়াইবেন। নিজের গ্রামে বা গ্রামের নিকটে যদি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় না থাকে, তবে নিজের নিতান্ত অন্তরঙ্গ বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের নিকট ছেলেকে রাখিতে পারিলে ভাল হয়। যেখানে পরিমিত পানাহার, স্নেহ ও শাসন কোনটারই ব্যতিক্রম তাহার পক্ষে না ঘটে। নিজের প্রভূত অর্থ থাকিলে বা চাল বজায় রাখিবার জন্য উল্লিখিত সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তাহাকে কদাপি ছাত্রাবাসে পাঠান উচিত নহে। একান্ত পাঠাইতে হইলেও তাহাকে আদর্শ চরিত্র শিক্ষকের হেপাজতে রাখিবার চেষ্টা করা উচিত এবং সে যাহাতে অবাধে ও সাগ্রহে সৎসঙ্গে মেলামেশা করিতে পারে তৎপ্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

সহরে একস্থানে প্রায়ই একাধিক বিদ্যালয় থাকে। কেবল পরীক্ষায় পাশের সংখ্যা দেখিয়া কদাপি ছেলের জন্য বিদ্যালয় নির্ণয় করা উচিত নহে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণের আচার, ব্যবহার, চরিত্র, শিষ্টতা প্রভৃতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ছেলের জন্যে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সোপান বিদ্যালয় মনোনীত করা একান্ত কর্ত্তব্য। ছেলেকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া ও দুই এক জন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়াই পুত্রের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কর্ত্তব্য সম্পাদনবোধে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। শিক্ষকগণ অনেক স্থলে বর্ত্তমান শিক্ষার উদ্দেশ্য অনুযায়ী কেবল পরীক্ষায় পাশের উপযুক্ত কতগুলি নোট মুখস্ত করাইয়া ছাত্রকে বৎসর বৎসর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করান ও অভিভাবকের প্রীতি উৎপাদন করিবার প্রয়াস পান। ছেলের পাশের সঙ্গে শিক্ষকের স্বার্থের সম্বন্ধ

ছেলের বিদ্যালয় মনোনয়ন।

বিদ্যমান থাকায় ছাত্র ও তাহার অভিভাবকেরও পাশ করাই একমাত্র লক্ষ্যস্থল হওয়ায় শিক্ষক বাধ্য হইয়া কেবল তাহার পাশের পড়ার উপর জোর দেন। মনুষ্যত্বের দিক দিয়া ছেলে কতদূর গঠিত হইতেছে, না হইতেছে, অভিভাবক বা শিক্ষক সে খোঁজও কেহ বড় একটা রাখেন না। যেমন তেমন করিয়া বছর বছর পাশ দেওয়া মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। দুই চারিটা পাশ দিলেই মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হয় না, হইতে পারে না। পরীক্ষায় পাশ দিবার শিক্ষা ও মানুষ হইবার শিক্ষা দুইটী পৃথক বস্তু। দুইটী একসঙ্গে আয়ত্ত করা অসম্ভব নহে কিন্তু মুখ্যটী অপেক্ষা গৌণটীর প্রতিই আমাদের ষোল আনা লক্ষ্য, মুখ্যটী প্রায় সর্ব্বত্রই উপেক্ষিত।

শিক্ষার ভ্রান্ত উদ্দেশ্য।

জীবনে ও সংসারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় কতগুলি পুঁথি মুখস্থ করা ও মানবজীবনের প্রতিপদে অবশ্য প্রয়োজনীয় ন্যায়, ধর্ম্ম, সত্য, স্বাস্থ্য ও মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করা দুইটী পৃথক বস্তু, ইহা আমরা বুঝি না। একটী অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিকে কোন কোন ক্ষেত্রে আশানুরূপ অর্থোপার্জ্জনাদিতে সহায়তা করে, অপরটী মানুষকে সংসারে প্রতিপদে জয়যুক্ত করিয়া মুক্তিফলের সন্ধানে লইয়া যায়। লেখাপড়া শিখিলেই মানুষ খারাপ হয়, ইহা প্রমাণ করাই উদ্দেশ্য নহে। লেখাপড়া জানা বহু সৎ, ধার্ম্মিক ও মনীষী এই দেশে ছিলেন, এখনও আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকা সম্ভব। কিন্তু বন্যার জলস্রোতের ন্যায় বৎসর বৎসর পাশ করা ছাত্রের সংখ্যার তুলনায় তাহা কতই না নগণ্য, তাহাই আজ আমি ভাবিয়া দেখিতে বলি। অন্ধের মত, মন্ত্রমুগ্ধের মত, উদ্দেশ্যবিহীন স্বাস্থ্যসত্য-ধর্ম্মবিবর্জ্জিত পাশ করা ছেলে অপেক্ষা, স্বাস্থ্য ও ধর্ম্মবলে

বলীয়ান প্রকৃত মানুষের আজ ঘরে ঘরে বড়ই প্রয়োজন। আজ কেবলমাত্র পাশ করা বাঙ্গালী ছেলের মূল্য কি, তাহার প্রয়োজন কোথায়, আর তাহার অস্তিত্বই বা জগতের কোন্ স্তরে ভাবিয়া দেখিলে বুক ভাঙ্গিয়া যায়। হয়তো কোন মাড়োয়াড়ীর প্রাসাদোপম অট্টালিকার নিম্নতলে আলোবাতাসস্পর্শলেশহীন গদিতে বসিয়া ডিগ্রীহীন মাড়োয়াড়ীর শত প্রকার মুখ ঝাঁকানি শুনিয়া উদয়াস্ত কলম পিষিয়া আমাদের বড় সাধের পাশকরা বুকজোড়াধন কোন প্রকারে চাকুরী বজায় রাখিতেছে, নহে তো কোন সাহেব কোম্পানীতে প্রতিদিন চাকুরী যাওয়ার ভয়ে নাকে মুখে কোন মতে চারিটা ভাতেভাত গুঁজিয়া দিয়া গিয়া দিবারাত্র কলম পিষিতেছে। সহরে তাহাদের বাসস্থান দেখিলে ভাবুকের চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যায়। বাংলার মাটীতে বাঙ্গালী সন্তান সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, অন্ধকার, স্যাঁৎস্যাঁতে ঘর ভাড়া করিয়া অনাহারে, অর্দ্ধাহারে থাকিয়া কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মার বেদীমূলে বাৎসরিক বলি যোগান দিতেছে। নিজের দেশে নিজের গৃহে নিজে ভিক্ষুক সাজিয়া পরের অনুগ্রহদত্ত ভাতার উপর জীবিকা নির্ভর করিয়া চলিতেছে। নানা প্রদেশ প্রত্যাগত বিদেশীর দল পঙ্গপালের মত বাংলার অর্থ শোষণ করিবার জন্য আসিয়া বাঙ্গালীকে সকল প্রকার স্বাধীন উপার্জ্জনের পথ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া তাহারাই লক্ষপতি ক্রোড়পতি হইয়া বসিতেছে। যাহারা জীবনে কোনদিন বাঙ্গালার রুচি অনুযায়ী ও বাঙ্গালীর একান্ত নিজস্ব খাবার

ঘরে ঘরে মানুষের প্রয়োজন।

পাশকরা বাঙ্গালীছেলের পরিণাম।

নিজের গৃহে নিজে ভিক্ষুক।

চক্ষেও দেখে নাই, তাহারাই শত শত খাবারের দোকান, পানের দোকান, বিড়ির দোকান, মুদীখানা হইতে সুরু করিয়া সকল প্রকার ব্যবসা বাণিজ্য খুলিয়া আমাদের গণ্ডে চপেটাঘাত করিয়া আমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা অর্থ লুটিয়া লইয়া যাইতেছে। আমরা তাহাদেরই গদিতে 'বাবু' সাজিয়া বসিয়া, কলম পিষিয়া দোকানদারীরূপ অপমানের হাত হইতে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিতেছি। যে অর্থের আশায় শিশু হামাগুড়ি দিলেই তাহাকে শিক্ষা দেই, 'লেখাপড়া করে যেই গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই' সে অর্থও আমাদের মিলিতেছে না, স্বাস্থ্যও নষ্ট হইতেছে, কাজেই ধর্ম্মাচরণ জীবনে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থ উপার্জ্জনই যদি আমাদের বিদ্যার্জ্জনের লক্ষ্যস্থল, তবে কেন আমরা ভুলিয়া যাই, "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ।" যেদিন আমরা এই মহাজন বাক্য ভুলিয়া গিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি, সেই দিন হইতে লক্ষ্মী আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। পাশের নেশায় মত্ত হইয়া আমরা আমাদের ছেলেদিগকে দলে দলে স্কুল-কলেজে পাঠাইতেছি, চাকুরীর মোহে অন্ধ হইয়া পরের গোলামীর জন্য বংশের দুলাল, পরিবারের আশাভরসা, দেশের মেরুদণ্ডতুল্য সন্তানকে আপনাদের অন্ধতা ও অবিবেচনায় এমনই করিয়া সীমাহীন নিরাশা, মর্ম্মান্তিক দারিদ্র্য ও দুঃখের সাগরে ডুবাইয়া দিতেছি!

পাশের নেশা চাকরীর মোহ।

আজ আমাদের সম্মুখে জীবনসংগ্রামের যে সর্ব্বগ্রাসী বিভীষিকা জাগিয়া উঠিয়াছে, সন্তানকে মানুষ হইবার শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো তাহা রাতারাতি দেশ হইতে তিরোহিত হইয়া যাইবে না।

কিন্তু তাহারা মানুষ হইলে অনেক কল্পিত অভাব অভিযোগ দূর হইয়া যাইবে, মিথ্যা অভিমান, মানমর্য্যাদাবোধ সংযত হইয়া আসিবে, নিজের যে কোন প্রকার স্বাধীন ও ক্ষুদ্র কাজেও আসক্তি জন্মিবে সে বিষয়ে সংশয়ের লেশমাত্রও নাই। মানুষ হইতে পারিলে বিলাস, বাসনা, অভাব, অভিযোগ, মিথ্যা আভিজাত্য মানমর্য্যাদাবোধ নিজেদের মধ্যে সংযত ও সুসহ করিয়া লওয়া সম্ভব। অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যে, গর্ব্বোন্নত দেহে, ন্যায় সত্য ও ধর্ম্মপথে, নিরহঙ্কার অনাড়ম্বর সরল জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত হওয়াও স্বাভাবিক। কাজেই সন্তানাদি মনুষ্যত্বের গৌরবে গৌরবান্বিত হইলে আমাদের পরিবার, সমাজ ও স্বদেশের সমস্যা অনেক পরিমাণে যে সমাধান হইয়া আসিবে তাহাতে সংশয়ের লেশমাত্রও নাই।

বালকের চালচলন, বসনভূষণ, হাবভাব প্রভৃতি অতিশয় সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, সে কোন্ পথে যাইতেছে। অভিভাবকের অভিপ্রায়ানুযায়ী বেতনভোগী গৃহশিক্ষকদের অনেকে কেবল পাশের পড়া শিখাইয়া দিয়াই খালাস। কোনপ্রকারে ছেলে বছর বছর পাশ দিলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গেল। ছেলে ও তাহার অভিভাবকও তাহাই চান। এ জীবনে হয়তো বা সেই সব ছেলেদের সঙ্গে তাঁহাদের দেখাশুনা হইবে না, কোন সম্বন্ধই থাকিবে না। কিন্তু পিতামাতাকে সন্তান-সন্ততি লইয়া মরণের দিনটী পর্য্যন্ত একসঙ্গেই থাকিতে হইবে, তাহাদের ভালমন্দ, হিতাহিত, সুখদুঃখের ফলভোগী হইতে হইবে, বিদ্যালয়ের বা গৃহের শিক্ষক তাহার অংশ লইতে আসিবেন না। ইহা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া সন্তানের শৈশব হইতে প্রতিটী ঘটনার সঙ্গে পিতামাতার ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট থাকা কর্ত্তব্য।

সন্তানের প্রতি ব্যবহার।

সন্তানাদি কৈশোরে পদার্পণ করিলে এমন স্নেহময় বন্ধুর ব্যবহার তাহাদের সঙ্গে করিতে হইবে, কোন গুরুতর অন্যায় করিয়াও যেন তাহারা পিতামাতার শাসনের ভয়ে তাহা গোপন করিয়া রাখিবার প্রয়াস না পায়। তাহাদের সকল কথা প্রাণ খুলিয়া অকপটে পিতামাতার নিকট ব্যক্ত করিতে পারে। সন্তানাদি কোন গুরুতর অন্যায় অপরাধ করিলে জনক-জনকী মর্ম্মান্তিক দুঃখ পান ইহা তাহারা হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলে সহসা কোন অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারিবে না। কোন্ পিতৃমাতৃভক্ত সন্তান তাঁহাদের চক্ষের জল উপেক্ষা করিয়া যাইতে পারে? সন্তানকে এমন স্নেহমধুর ব্যবহারে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, যে কার্য্যে পিতামাতার চক্ষে জল আসে, এমন কোন কার্য্য কদাপি ভুলেও যেন তাহারা না করিতে পারে।

অনেক পিতামাতাকে দেখা যায়, সন্তানের কোন অপরাধের সংবাদ মাত্রেই তাহার অপরাধের কোন খোঁজ খবর না লইয়া অতি অনায়াসে নির্ম্মম ভাবে তাহাকে শাসন করেন। অনেক সময় ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া নির্দ্দয়ভাবে তাহাকে প্রহার করেন। ইহার কুফল আবার কেহ কেহ বৃদ্ধ বয়সে মর্ম্মে মর্ম্মে ভোগ করিয়া যান। আবার কেহ কেহ বা আপন সন্তানের অপরাধ সম্বন্ধে একেবারেই অন্ধ হইয়া থাকেন। চক্ষের সম্মুখে অপর কাহারো সঙ্গে কলহ করিতে দেখিয়াও নিজের সন্তানের প্রতি অন্ধ মমত্ববোধ থাকায় তাহার ত্রুটী ঢাকিয়া রাখিয়া অযথা অন্যের সন্তানকে আক্রমণ করেন। ইহার পরিণাম অতিশয় বিষময়। ইহাতে প্রকারান্তরে সন্তানকে ঐ অপরাধ করিতে প্রশ্রয়ই দেওয়া হয়।

কোন কোন জনক-জননী আবার সন্তান একের নিকট শাসিত হইলে অপরে তাহাকে প্রশ্রয় দেন ও শাসকের সঙ্গে কলহ করিতেও ছাড়েন না, ইহা অতিশয় অন্যায়। জনক-জননী যে কেহ সন্তানকে শাসন করিলে সে সম্বন্ধে অপরের কিছু বলিবার থাকিলে শিশুর অলক্ষ্যে তাহা বলাই উচিত। ভুল, ত্রুটী, অন্যায়, অপরাধ সম্বন্ধে সন্তানের বিবেক বুদ্ধিকে জাগ্রত রাখা পিতামাতা উভয়েরই অবশ্য কর্ত্তব্য, একা পিতা বা মাতার নহে।

সন্তানকে স্নেহ করিবার সময় যেমন স্নেহান্ধ হওয়া উচিত নয়, শাসন করিবার সময়ও তেমনি উত্তপ্ত মস্তিষ্কে করা কর্ত্তব্য নয়। ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া কোন মানুষই কোন উচিত কাজ করিতে পারে না। ক্রোধ অতি সাংঘাতিক রিপু, সে মানুষকে আয়ত্তাধীনে পাইলে, তাহাকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য পশু করিয়া তোলে এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে এমন মর্ম্মান্তিক কাজ করাইয়া লইতে পারে, যাহার জন্য জীবনব্যাপী হয় তো অনুতাপ করিতে হয়। ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া কেহ কোন দিন বিচারের মাত্রা ঠিক রাখিতে পারে না, লঘু পাপে গুরুদণ্ড হইয়া যায়। সন্তান পিতামাতার বক্ষঃ পঞ্জর অপেক্ষাও স্নেহের বস্তু, বংশের প্রদীপ, দেশের আশাভরসাস্থল, প্রতি নিয়ত তাড়না বা প্রহারের বস্তু নহে। মানুষের সন্তান যাহাতে সংসারে মানুষ হইয়া গঠিত হইয়া উঠিতে পারে জনক-জননীর তাহা করাই সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য।

ক্রোধীর শাসন।

কন্যা যাহাতে আদর্শ চরিত্রা, লজ্জাশীলা, নিষ্ঠাবতী, সুভাষিণী, স্নেহময়ী সেবা ও কর্ত্তব্য পরায়ণা হয়, সেদিকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

পুত্রের উপরই আপন বংশরক্ষা, বার্দ্ধক্যের ভরণপোষণ প্রভৃতি নির্ভর করে বলিয়া জনক-জননী কন্যার শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি তত মনোযোগী হন না, ইহা অতিশয় অন্যায়। পুত্রের মত কন্যারও জীবন গঠন করিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পিতামাতারই উপর একান্ত ভাবে নির্ভর করে। কন্যা অপর এক সংসারে যাইয়া অতি গুরুতর দায়িত্ব স্কন্ধে লইবে, সে দায়িত্ব যাহাতে তাহার জীবনে পীড়াদায়ক না হইয়া সহজ হইয়া আসে, তাহাকে সেইরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সেখানে যদি সে ঠিকমত চলিতে না পারে, তবে তাহার কষ্টের অবধি থাকিবে না।

কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য।

যদি সম্ভব হয় তবে কন্যার জন্য চরিত্রবতী গৃহশিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিতে পারিলে ভাল হয়। লেখাপড়া, সেলাই, সঙ্গীত ইত্যাদি তিনি শিক্ষা দিবেন, জননী আপন গৃহকর্ম্মব্যপদেশে কন্যাকে অতি নিষ্ঠার সহিত গৃহকর্ম্ম শিখাইবেন। উচ্চ শিক্ষা দিবার সামর্থ্য না থাকিলেও, তাহার হাতের লেখা যাহাতে ভাল হয়, বাজারের হিসাব, দোকানের হিসাব, ধোপার হিসাব, সংসারের জমা খরচ ইত্যাদি যাহাতে নির্ভুল ভাবে সে রাখিতে পারে, টেলিগ্রাম, চিঠির ঠিকানা প্রভৃতি লিখিতে ও পড়িতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শিক্ষয়িত্রী পড়াইতে আসিলে জনক বা জননী মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার শিক্ষাদানের পদ্ধতি লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন।

জননী সংসারের কাজকর্ম্ম করিবার সময় কন্যাকে ছোট ছোট কাজে লিপ্ত করিয়া দিবেন এবং তাহা সে সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে কি না, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। সংসারের প্রতিটী কাজ অতিশয়

যত্ন, মমতা ও নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিবার শিক্ষা কন্যাকে অবশ্য দিতে হইবে। সংসারের কোন দ্রব্যই তুচ্ছ, অপচয় ও অবহেলা করিবার অভ্যাস যেন তাহার কিছুতেই না হইতে পারে।

কন্যার অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়।

বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কৈশোর হইতেই কন্যাকে এমন ভাবে গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে সে পরের ঘরে গিয়া কোন কারণেই অপ্রস্তুত ও অশিক্ষিত প্রতিপন্ন না হয়। কি ভাবে স্বামী, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, দেবর, ভাসুর, জা, ননদ, দাস, দাসী, প্রতিবেশী, মুখাপেক্ষী, স্নেহভাজন, অতিথি, অভ্যাগত প্রভৃতির সঙ্গে ব্যবহার করিলে সকলের স্নেহ বা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা যায়, জননী অতি নিপুণতার সহিত কন্যাকে তাহা শিক্ষা দিবেন।

কাঁচা ঘর কি ভাবে লেপিতে হয়, পাকা ঘরের মেঝে কি ভাবে মাজিয়া ঘষিয়া প্রতিদিন পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে করিতে হয়, তৈজসপত্র প্রতিদিন কি দিয়া কি ভাবে মাজিলে দুর্গন্ধহীন ও পরিষ্কার হয়, তাহা কোন্ ঘরে কোথায় কি ভাবে সাজাইয়া রাখিলে সুন্দর দেখায়, ভাঁড়ার ঘর প্রতিদিন কি ভাবে ঝাড়িয়া গুছাইয়া রাখিতে হয়, গৃহের তরিতরকারি কোন্‌টা নষ্ট হইতেছে, না হইতেছে, কোন্‌টা পচিতেছে, কোন্‌টা আরও কিছু দিন টিকিবে, তাহা প্রতিদিন রান্নার পূর্ব্বে কি ভাবে পরীক্ষা করিতে হয়, ঘি, তেল, ময়দা কি ভাবে রাখিলে বেশী দিন টাট্‌কা অবস্থায় থাকে, ঘরের কোথায় চালের হাঁড়ি, কোথায় ডালের হাঁড়ি, কোথায় আচারের পাত্র রাখিলে কাজের সময় সহজেই তাহা পাওয়া যায়, কোন্ সময় কোন্ ফলের আচার, মোরব্বা, চাট্‌নী কোন্ মসলা সহযোগে

কি ভাবে তৈয়ারী করিতে হয়, তাহা দীর্ঘদিন কি ভাবে ঘরে রাখা যায়, রান্না কি ভাবে সুরু করিতে হয়, সহজে ও অল্পব্যয়ে কোন্ সুখাদ্য অল্প সময়ে রান্না করা যায়, কোনটা আগে ও কোন্টা পরে রাঁধিলে ভাল থাকে এবং আহারের পক্ষেও ভাল হয়, পোলাও, কারি, কোর্ম্মা, চপ, কাটলেট, ডাল, তরকারি, শাক, চচ্চরী, ভাজা, টক, চাটনী কি ভাবে রাঁধিতে হয়, কোন্ পিষ্টক, মিষ্টান্ন ইত্যাদি কোন্ দিনে তৈয়ারী করিতে হয় ও খাইতে সুস্বাদু হয়, ঘোল, বেল, আম, পেঁপে, প্রভৃতির সুপেয় সরবৎ কি ভাবে তৈয়ারী করিতে হয়, গৃহে কোন অতিথি অভ্যাগত আসিলে চট্ করিয়া অতি সংক্ষেপে ও স্বল্প সময়ে কোন্ সুখাদ্য খাবার তৈয়ার করা যায়, কোন্ খাবার কি ভাবে তৈয়ার করিলে সুদৃশ্য ও সুখাদ্য হয়, তাহা রেকাবিতে কি ভাবে সাজাইয়া দিতে হয়, গুরুজন ও স্নেহভাজনদের কি ভাবে আহার্য্য পরিবেশন করিয়া দিয়া পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইতে হয়, কেমন করিয়া পান সাজিলে চূণ, খয়ের, সুপারি ঠিক মত হয়, আলমারী, চেয়ার, টেবিল, সোফা, আয়না, গালিচা ইত্যাদি দিয়া কি ভাবে ঘর সাজাইলে বেশ মানানসই হয়, কি ভাবে তাহা ব্যবহার করিতে হয়, কাপড়, শাড়ী, সেমিজ, ব্লাউজ, কোন্ বয়সে কি ভাবে পরিলে লজ্জা ও শ্লীলতা রক্ষা পায়, নিজের সেমিজ, ব্লাউজ, জামা, শিশুদের নানা রকম জামা, বালিসের ওয়াড়, পর্দ্দা, টেবিলের ঢাকনী ইত্যাদির ছাঁট্-কাট্ ও সহজ সেলাই অল্প সময়ে কি ভাবে করা যায়, কাপড়ের উপর নানারূপ সূচীশিল্পাদি কি ভাবে করিতে হয়, পূজাপার্ব্বণ উপলক্ষে কি ভাবে ঘরে আলপনা দিতে হয়, শুদ্ধবস্ত্রে চন্দন ঘষিয়া ফুল তুলিয়া নৈবেদ্য সাজাইয়া অতিশয় নিষ্ঠার সহিত কি ভাবে পূজাপার্ব্বণের আয়োজন করিয়া দিতে

হয়, কি ভাবে চুল বাঁধিলে বেশ পরিপাটী হয়, কি ভাবে শিশুদের ও বড়দের শয্যারচনা করিতে হয়, গৃহের সব্জীবাগানে কোন্ শাক, কোন্ তরিতরকারির বীজ ও গাছ কখন বপন ও রোপন করিতে হয়, কি উপায়ে বীজ সংগ্রহ ও রক্ষা করা চলে, ফুলবাগানে কি ভাবে লাইন দিয়া সময়োপযোগী ফুলগাছ বুনিয়া দিতে হয়, গরুর খড়, বিচালী কি ভাবে দিতে হয়, কি ভাবে গাই দোয়াইতে হয়, শটী, শাগু, বালি, এ্যারারুট প্রভৃতি কি ভাবে তৈয়ারি করিলে রোগীর পক্ষে সুবিধাজনক হয় ও রোগ সারিতে সহায়তা করে, আটা, ময়দা, সুজি, প্রভৃতির রুটী, খই, চিড়া, ভাত প্রভৃতির মণ্ড, মাংস, মাছ, ডাল, ফল, তরকারি, প্রভৃতির সুরুয়া কি ভাবে তৈয়ারি করিতে হয়, কি ভাবে নিজে সতর্ক থাকিয়া রোগীর সেবাশুশ্রূষা করিতে হয়, ঘড়ি কিভাবে দেখিতে হয়, থার্ম্মোমিটার দিয়া কি ভাবে জ্বর পরীক্ষা করিতে হয়, রোগীর মাথায় বরফ বা জল কি ভাবে দিতে হয়, ঠাণ্ডা বা উষ্ণজলে কি ভাবে দুর্ব্বল রোগীকে শায়িত অবস্থায়ই গা মুছাইয়া দিতে হয়, রোগীর জ্বর, পথ্য, জল, ঔষধ, বাহ্য, প্রস্রাব, নাড়ী, শ্বাসগতি, ঘুম প্রভৃতির তালিকা কি ভাবে রাখিতে হয় এবং সর্ব্বোপরি সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বাবস্থায় কি ভাবে আপন স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক থাকিয়া ও ভগবানে সরল বিশ্বাস ও নির্ভর রাখিয়া সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম করিতে হয়, কন্যার ভবিষ্যৎ গৃহধর্ম্মের এই সমস্ত অত্যাবশ্যকীয়, অবশ্য জ্ঞাতব্য ও একান্ত অপরিহার্য্য সকল তথ্য একে একে ধৈর্য্য সহকারে কন্যাকে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। ভাগ্যবলে সে রাজার ঘরে পড়িলেও যেন মানাইয়া যাইতে পারে, কর্ম্মদোষে দুস্থ পরিবারে পরিলেও কোন কার্য্যেই কষ্ট বা সঙ্কোচ না হয়।

যদি স্বামীর গৃহে যাইয়া কন্যা এই সব কাজ করিতে অপারগ হয়, তবে সেও লজ্জা পাইবে, সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতারও দুর্নাম হইবে। কন্যার জননী যদি এইরূপ কোন কার্য্য না জানেন, তবে কোন সচ্চরিত্রা শিক্ষিতা প্রতিবেশীনীর নিকট হইতে সে যাহাতে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত এই সব গৃহকর্ম্ম হাতে কলমে শিক্ষা করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এক জনের নিকট সকল কার্য্য শিক্ষা পাওয়া সম্ভব না হইলে যিনি যে বিদ্যা জানেন তাঁহার নিকট হইতে সহিষ্ণুতা ও বিনয়ের সহিত সেই বিদ্যা অর্জ্জন করাইয়া লইতে হইবে। সকল জনক-জননীর পক্ষে গৃহশিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী রাখা সম্ভবপর নহে এবং শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী না থাকিলে যে পুত্রকন্যা অশিক্ষিত ও অজ্ঞ থাকে না, ইহা অবিসংবাদী সত্য। জনক-জননী উভয়ে মিলিয়া যে ভাবে যাহা করিলে ও যে শিক্ষা দিলে পুত্রকন্যার আগাগোড়া জীবন এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয় সর্ব্বদা তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

শৈশব হইতে শিশুরা যাহাতে নিষ্ঠার সহিত শিষ্টাচার শিক্ষা করিতে পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা জনক-জননীর উচিত। ইহা অভ্যাস করাইতে বিশেষ কোনই বেগ পাইতে হয় না, পিতামাতার সামান্য চেষ্টাতেই হয় এবং ইহা দ্বারা লোকের শ্রদ্ধা, প্রীতি ও স্নেহ অতি অনায়াসে আকর্ষণ করা যায়। শিষ্টাচার জীবনের এক অতি শ্রেষ্ঠ গুণ।

শিষ্টাচার শিক্ষা।

পূর্ব্বে বাঙ্গালীমাত্রেরই শিষ্টাচার এক অমূল্য সম্পদ ছিল। বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে ইহা প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। এখন ছোটর

নিকট বড়র মান্যমাননা, শ্রদ্ধা, এমন কি ছোটর নিকট বড়র প্রাপ্য প্রণামটা পর্য্যন্ত অনেক স্থলে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

শিষ্টাচার মানুষের এক অতি উচ্চ ধর্ম্ম। ইহা দ্বারা অতি অনায়াসে সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করা চলে। গুরুজন বা বয়োজ্যেষ্ঠের পদধূলি গ্রহণ, সবিনয়ে তাঁহাদের সঙ্গে কথা বলিতে শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। অশিষ্ট লোক প্রায়ই আত্মম্ভরী, তার্কিক ও বহুভাষী হইয়া থাকে। ইহা মানবজীবনে প্রতিষ্ঠা ও উৎকর্ষ লাভের ঘোরতর অন্তরায়।

কোন বয়োজ্যেষ্ঠ অথবা পরিচিত বা অপরিচিত ব্যক্তি আজকালের শিশুকে কোন কাজের ফরমায়েস দিলে বা কিছু জিজ্ঞাসা করিলে প্রায়ই দেখা যায়, সে নিজ রুচি অনুসারে যা' তা' একটা জবাব বা কৈফিয়ৎ দিয়া সরিয়া পড়ে, ইহা অতিশয় অন্যায়। আজ যে শিশু অতি অনায়াসে অশিষ্টভাবে একজন গুরুজনকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেল, ক্রমশঃ ইহাই তাহার অভ্যাস ও প্রকৃতিগত হইয়া দাঁড়াইবে। আশ্চর্য্য কি যে জনক-জননীর বৃদ্ধ বয়সে সেই শিশু তাঁহাদের আদেশ, অনুরোধ বা কাকুতি, মিনতি অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া যাইবে।

সংসর্গ মানুষের জীবন গড়িয়া তুলিতে যেমন সহায়তা করে, আবার তাহা অধঃপতিত হইয়া যাইতেও তাহা অপেক্ষা অধিক সাহায্য করিতে ক্রটী করে না। সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ, ইহা অতি বড় সত্য কথা। সৎ সংসর্গের গুণে মানুষ বাস্তবিকই স্বর্গসুখের অধিকারী হইতে পারে, অসৎ সঙ্গের ফলে নরকের অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতে মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় না।

সংসর্গের দোষ-গুণ।

সৎ সংসর্গের গুণে কত পতিত উদ্ধার হইয়াছে, কত নির্ম্মম পাষাণের বুক বাহিয়া ভক্তির মন্দাকিনী ধারা বহিয়া গিয়াছে, আর অসৎ সঙ্গের ফলে কত মানুষ পশুত্বে পরিণত হইয়াছে, কত সোনার দুলাল বংশের প্রদীপ অকালে স্বাস্থ্য আয়ু, বল, শ্রী ভ্রষ্ট হইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে চির অন্ধকারে নিভিয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

স্বভাবতঃ বাল্যকালে শিশুর মন অতিশয় কোমল থাকে, সে স্বভাবতঃই আপন সঙ্গীদিগকে ভালবাসে, সঙ্গীরা যাহা করে সেও তাহাই করিতে ভালবাসে।

বাল্যের সীমা অতিক্রম করিয়া শিশু যখন কৈশোরে পদার্পণ করে, দেহের অস্থি, মেদ, মজ্জা কিঞ্চিৎ পরিপক্কতা লাভ করিয়া শরীরে নূতন বল, উদ্দীপনা ও ভাবের তরঙ্গ ধীরে ধীরে জাগিতে থাকে এবং নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন নিজের মনেই জাগিয়া ওঠে, সে তখন বড় সঙ্গপ্রিয় হইয়া পড়ে। এই সময় যদি তাহাকে সৎসঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহার গতি উচ্চপথে ধাবিত হয়, আর অভিভাবকের অগোচরে গোপনে সে যদি মনোমত অসৎসঙ্গ বাছিয়া লয়, তবে নানারূপ দেহ অপচয়কারী কু অভ্যাস শিক্ষা করিয়া পূর্ণবেগে অধঃপতনের পথে নামিয়া পড়ে। প্রত্যেক গ্রামে ও বিদ্যালয়ে এইরূপ সৎ ও অসৎ ছেলে আছে। এই সব অসৎ পথগামী শিশুর দল এমনই অকাল পরিপক্ক এবং সংসারের সকল প্রকার কু কাজে এমনই অভ্যস্ত যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাহারা নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি ফিরিয়াও চাহে না এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য স্বাস্থ্যসবল, মেধাবান, সুশ্রী ছেলেদিগকে নিজেদের দলে টানিয়া

কৈশোরে সঙ্গপ্রিয়তা।

আনিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে। শিশুরা বিদ্যালয়ে যাইয়া যাহাতে এইরূপ দলে না পড়ে, সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহারা কাহাদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করে, তন্ন তন্ন করিয়া তাহার খোঁজ লইতে হয়। বিদ্যালয়ে শিশুদের পাঠাইয়া কদাচ তাহাদের স্বাস্থ্য ও নৈতিক জীবন সম্বন্ধে উদাসীন থাকা কর্ত্তব্য নহে। শিশু অধিকাংশ সময়ই পিতামাতার নিকট থাকে, কাজেই সে সব শিক্ষা দিবার ভার জনক জননী নিজ হাতে লইবেন।

নষ্ট হইবার ভয়ে শিশুকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় কেবল ঘরের কোণে রাখিয়া পড়িতে দেওয়া উচিত নয়। মুক্ত প্রাঙ্গণে, নির্দোষ ক্রীড়াকৌতুকে তাহার মন যাহাতে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। সংসারে সুস্থ, সুগঠিত ও সবল দেহের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা তাহাকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে। কুস্তি, লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, ঘুষাঘুষি ইত্যাদি বীরত্বব্যঞ্জক ও অত্যাবশ্যকীয় ক্রীড়ায় যাহাতে সে বিশেষরূপে পারদর্শী হইতে পারে তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। সম্ভব হইলে শিশুর জনক-জননী ক্রীড়াক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া তাহার ক্রীড়ার কৌশল, বলবীর্য্য ও দৈহিক উন্নতির প্রশংসা করিয়া বিশেষভাবে তাহাকে উৎসাহিত করিবেন। মাঝে মাঝে তাহার বুকের ছাতির মাপ লইতে হইবে ও তাহার সন্তোষজনক উন্নতিতে লেখাপড়ায় ক্লাশে প্রথম স্থান অধিকার করার ন্যায় সমান উল্লাস ও আনন্দ দেখাইয়া এবং পৃথিবীর যোদ্ধা ও ব্যায়ামবীরদের কাহিনী সম্বলিত পুস্তকাদি তাহাকে উপহার দিয়া তাহার ব্যায়ামোদ্যম পূর্ণমাত্রায় বাড়াইয়া দিতে হইবে। এ সংসারে সর্ব্ব কর্ম্মে, সর্ব্ব

অবস্থায় শারীরিক বল ও অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যের প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে, তাহা জনক-জননী নিজেরা উপলব্ধি করিয়া দেখিবেন। আপনারা তদনুরূপে জীবন যাপন করিবেন এবং শিশুদিগকে সর্ব্বাগ্রে তাহা অর্জ্জন করিতে শিক্ষা দিবেন। আমাদের দেশের জনক-জননীরা অধিকাংশই শ্রমবিমুখ। শৈশবে কেহ কেহ বা ঝোঁকের মাথায় এক আধটু ব্যায়াম, খেলাধূলা করিয়া থাকে কিন্তু একটু বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা অতিরিক্ত গম্ভীর, ঘোরতর সংসারী ও অকালপক্ক হইয়া স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া স্বল্পায়ু, রোগজীর্ণ ও চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া অশেষ কষ্টে দিনাতিপাত করি। ব্যায়াম করিতে আমাদের লজ্জা হয়। আশী বছরের একজন বৃদ্ধ সাহেব অনায়াসে যে কোনরূপ শারীরিক ব্যায়াম করিয়া স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখেন, তাহাতে তাঁহার লজ্জা হয় না। বিশ বছরেই আমাদের ছুটাছুটি করা, ডন ফেলা, মুগুর ভাঁজা, কুস্তি, লাঠিখেলা প্রভৃতি সমস্ত বন্ধ হইয়া যায়। দিবারাত্রি সংসারের চিন্তায় হা হুতাশ করিয়া বসিয়া থাকিতেই আমরা ভালবাসি। আমরা ভাবপ্রবণ জাতি, ভাববশেই দিন চলিয়া যায়। সংসারে আসিয়া কোন কর্ম্মই আমরা করিতে পারি না। আমরা অনেকে আবার দেহের অনিত্যতার দোহাই দিয়া দেহের যত্ন লইতে অবহেলা করি। দেহ অনিত্য এ ধ্রুব জ্ঞান থাকা যেমন ভাল, তাহাতে দেহের বিলাস, ব্যসন কমিয়া যাওয়া সম্ভব, দেহরক্ষা বিষয়ে উদাসীন হইয়া তৎপ্রতি অবহেলা করা তেমনি মহাপাপ। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, দেহরক্ষা করিতে পারিলে অর্থাৎ দেহ সর্ব্বপ্রকারে সুস্থ থাকিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ হওয়া

অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যের প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে।

ভাবপ্রবণ জাতি।

সম্ভব, আর দেহ নষ্ট হইলে অর্থাৎ কোন প্রকারে দেহ অসুস্থ হইলে, সঙ্গে সঙ্গে সকলই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অতএব সংসারে থাকিতে হইলে স্বাস্থ্যরক্ষাই যে সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য সে বিষয়ে সংশয়ের লেশমাত্রও নাই। সুস্থ, সবল, পরিপূর্ণ দেহেই সুস্থ ও উচ্চ মনের বাস সম্ভব। সুস্থ দেহ ও সুস্থ মনের যোগ ঘটিলেই সংসারে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মরক্ষাই সহজ হয়। অসুস্থ দেহে সুস্থ মনের বাস অসম্ভব। অতএব কোন প্রকার ধর্ম্ম আচরণ করাই সহজ সাধ্য নহে। স্বাস্থ্যহীনের সকল আশা, সুখ, সম্পদই ব্যর্থ ও নিরর্থক হইয়া থাকে। ভগ্নস্বাস্থ্য, নুব্জদেহ, ক্ষীণদৃষ্টি বিদ্যার জাহাজ সন্তান অপেক্ষা স্বাস্থ্যবান, সুগঠিত, কর্ম্মঠ, ধার্ম্মিক সন্তান শ্রেষ্ঠতর। স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তি আত্মরক্ষায় অসমর্থ, অপরের রক্ষা তাহার কাছে প্রত্যাশা করাও বৃথা।

স্বাস্থ্যহীনের সবই বৃথা।

কৃশাঙ্গী, সাবান পমেটম পরিমার্জ্জিতা, খিটখিটে, ফ্যাকাশে রংএর শিক্ষিতা কন্যা অপেক্ষা স্বাস্থ্যসবলা, সুগঠিতা, সদাহাস্যময়ী, নীরোগ, অক্ষরজ্ঞানহীনা মেয়ের প্রয়োজন সংসারে অনেক বেশী। একে বংশ, সমাজ, জাতি ও দেশের জন্য রুগ্ন, দুর্ব্বল সন্তান প্রসব করিয়া অকালমৃত্যু, রোগশোক, দুঃখ, দৈন্য, দারিদ্র্য নিরন্তর বাড়াইয়া থাকেন, অপরে সুস্থ. সুগঠিত, সবল সন্তান প্রসব করিয়া জাতি রক্ষার সহায়তা করেন। স্বাস্থ্যই মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মূলধন, সম্পদ, সম্বল ও সৌন্দর্য্য। স্বাস্থ্যই জীবনে সর্ব্বসুখের মূলাধার।

স্বাস্থ্যবতী ও স্বাস্থ্যহীনার পার্থক্য।

যাঁহারা নিয়মিত শারীরিক চর্চ্চা ব্যায়াম প্রভৃতির দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষা

করিয়া থাকেন, তাঁহারা রিপুজয়ী, অনেকাংশে দুশ্চিন্তাহীন, ক্রোধহীন, আত্মরক্ষা, জাতিরক্ষায় সমর্থ হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করতঃ জীবনের সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মাচরণ দ্বারা আপন জীবন পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারেন। স্বাস্থ্যহীন সম্রাট্ স্বাস্থ্যবান দীনদরিদ্র চাষী, কুলী, মুজুর অপেক্ষা বহু অংশে দুঃখী। স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে খুব বেশী ব্যয় বাহুল্যেরও প্রয়োজন হয় না। অনেকে বলিয়া থাকেন, আমরা খাইতে পাই না, স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে কিরূপে। তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখেন না যে, তাঁহারা যাহা আহার করেন তাহাও জীর্ণ করিবার শক্তি তাঁহাদের নাই। সাধারণ ডালভাত, তরিতরকারি দুই মুঠা ছোলা চেষ্টা করিলে ইহা সকলেই প্রায় যোগাড় করিতে পারেন। ইচ্ছা থাকিলে সকলেই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ২।৩ মাইল ভ্রমণ করিতে পারেন, কুস্তি করিতে পারেন কিন্তু আমরা

কল্পনাপ্রিয় নিরুদ্যমজাতি।

এমনই কল্পনাপ্রবণ, নিরুদ্যম ও অলসতাপ্রিয় জাতি যে আমরা কল্পনা দ্বারা হাতে হাতে স্বর্গ রচনা করিতে পারি, বসিয়া বসিয়া রাজা উজির হত্যা করিতে পারি, দিবানিশি তাসপাশা পিটিয়া অমূল্য সময় বৃথা ব্যয় করিতে পারি কিন্তু এক পা হাটিতে হইলেই আমাদের কৈফিয়ৎ অজুহাতের আর অন্ত থাকে না। বসিয়া বসিয়া প্রতিদিন একই প্রকার ডালভাত নির্ব্বিচারে গলাধঃকরণ করিয়া নানাপ্রকারে আমাদের ভাগ্য ও অবস্থার নিন্দা করিতে পারি কিন্তু অবসর সময়ে বাড়ীর আশপাশে কোদাল মারিয়া শাকসব্জী, তরিতরকারি সহজলভ্য সুখাদ্য পুষ্টিকর ফলমূল জন্মাইয়া খাইতে আমরা নারাজ, কারণ আমরা অতিবড় আত্মাভিমানী স্বাস্থ্যহীন বাবু। আমরা আমাদের কর্ম্মের কথা ভুলিয়া গিয়া,

চর্চ্চার অভাবে কর্ম্মের শক্তিকে নষ্ট করিয়া দিয়া ভাগ্যের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া আছি। যদি ভাগ্যে মিলে তবে আহার জুটিবে, যদি পরমায়ু থাকে তবে বাঁচিব, যদি কপালে থাকে সুখ হইবে কিন্তু আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, সুখ, স্বাস্থ্য, সম্পদ অর্জ্জন করিবার সমস্ত শক্তি, প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা ভগবান আমাদিগকে দিতে এতটুকুও কার্পণ্য করেন নাই। পুরুষানুক্রমিক অপব্যবহারে আমরা সে শক্তিহারা হইয়াছি। যাঁহারা কর্ম্মবলে সেই শক্তি জাগ্রত রাখিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা সুখ, শান্তি, স্বাস্থ্য, স্বাধীনতা বিধাতার আশীর্ব্বাদরূপে ভোগ করিতেছেন। ইহা চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়। এই সব বিষয় বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিয়া জনক-জননী আপন আপন সন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষার পথ সুগম করিয়া দিলে বংশ, জাতি ও দেশের কল্যাণ হইবে, আশা করা যায়। ঘরে ঘরে আজ যদি আমরা স্বাস্থ্য, ধর্ম্ম ও সত্য বলে বলীয়ান মানুষ গঠন করিয়া তুলিতে পারি, তবে পরিবারে, সমাজে, স্বদেশে, পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক সকল সমস্যাইতো অনেকাংশে মিটিয়া যায়। আমরা সে গোড়ার কথা ভুলিয়া গিয়া আকাশমার্গে সৌধ রচনার প্রয়াস করি ও নিষ্ফল চিৎকার করিয়া গগনপবন মুখরিত করি। কাগজে, পত্রে বাহোবা লইয়া আপন কর্ত্তব্য সমাপনবোধে আরামের নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকি। মানুষ গঠন না করিতে পারিলে কোন আশাই ফলবতী হইবার সম্ভাবনা নাই। মানুষ গঠন করিতে হইলে তাহাকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান করিতে হইবে। মানবোচিত ধর্ম্ম অর্জ্জন ও পালন করিতে হইলে স্বাস্থ্যরক্ষা অপরিহার্য্য। অতএব

আমরা কর্ম্মহীন অদৃষ্টবাদী।

মানুষ গঠনই গোড়ার কথা।

মানব জীবনে স্বাস্থ্য কত গুরুতর স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখা প্রতি পরিবারের প্রত্যেক গৃহী গৃহিনীর সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য এবং আপন সন্তানকে সেই ভাবে গঠন করা বংশ, পরিবার, সমাজ, স্বজাতি ও স্বদেশের হিতকামী প্রত্যেক মানব দম্পতির উচিত।

মেয়েদের ব্যায়াম।

যে সব মেয়েদের দিবারাত্রি গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিতে হয়, ছোট ভাই ভগ্নীর বোঝা অবিরত বহন করিতে হয়, তাহাদের অন্য কোন প্রকার শ্রমের প্রয়োজন না হইলেও কিছু কিছু ছোরা খেলা ও কুস্তির দুই চারিটা প্যাঁচ উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়া রাখা বিপদে ধর্ম্মরক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে একান্ত মঙ্গলজনক। যাহাদের বিশেষ কোন গৃহ কর্ম্ম করিতে হয় না, তাহাদেরও সকল প্রকার গৃহকর্ম্মে অভ্যস্ত হওয়া উচিত। কর্ম্ম অনুযায়ী কে কিরূপ ঘরে যাইয়া পড়িবে, কাহার জীবনে কখন কোন্ বিপর্য্যয় কি ভাবে আসিয়া দেখা দিবে তাহা এক অন্তর্য্যামী ভিন্ন কেহ জেদ্ করিয়া বলিতে পারে না, ধনীও পারে না, দরিদ্রেও নয়। শ্রমসাধ্য গৃহকর্ম্মাদিতে অভ্যস্ত থাকিলে শরীর হাল্‌কা, বলপুষ্ট ও নিটোল হয়। আপন স্বাস্থ্যের জন্যও প্রত্যেকেরই গৃহকর্ম্মাদি নিয়মিতভাবে করা একান্ত প্রয়োজন।

অনেক ধনীর কন্যা নিশ্চিন্ত সুখবিলাসে দিবারাত্রি নভেল লইয়া পড়িয়া থাকিয়া ও পুষ্টিকর আহারাদি নিয়মিত উদরস্থ করিয়া প্রকাণ্ড মাংসপিণ্ডে পরিণত হইয়া থাকে। তাহারা বড়ই কুৎসিৎ দেখায়। ব্যায়াম ও শ্রমসাধ্য গৃহকর্ম্মাদি স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের পক্ষেই তুল্যভাবে অপরিহার্য্য। ব্যায়াম করিয়া লোকের বিদ্রূপভাজন হইয়াও সুস্থ নীরোগ দেহে সংসারে বাস করা ভাল। লোকলজ্জার ভয়ে বা দেশাচারের আতঙ্কে ব্যায়াম না

করিয়া রুগ্ন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া জীবন যাপন এক নিদারুণ অভিশাপমাত্র। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সংসারের কন্যার কুস্তির দুই চারিটা প্যাঁচ, ছোরা খেলা ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় দুই চারিটী খেলা অভ্যাস ভিন্ন স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অন্য ব্যায়ামের প্রয়োজন হয় না। মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহিণী যেমন একাধারে রাঁধুনী, চাকৃরাণী, ধাত্রী, সে সব ঘরের মেয়েরাও তেমনি ঘরলেপা, জলতোলা, মসলা বাটা, ধান ভানা, ভাই বোন্ রাখা প্রভৃতি কার্য্যে জননীকে সাহায্য করিতেই তাহাদের প্রাণান্ত হইয়া যায়।

সৌন্দর্য্য নারীর অন্যতম কাম্য বস্তু। প্রায় সকল নারীই নিজের সৌন্দর্য্য বাড়াইতে চেষ্টা করেন। অনেকে সৌন্দর্য্যের চর্চ্চা করিয়া থাকেন। পুরুষ এই সৌন্দর্য্যের পূজারী ও পক্ষপাতী। নারীর অসামান্য দৈহিক সৌন্দর্য্য যেখানে নারীসুলভ সকল প্রকার গুণের প্রভায় সমুজ্জ্বল হইয়া ওঠে সেখানে পুরুষ অতি অনায়াসে আপনাকে রিক্ত করিয়া সেই নারীর কাছে বিলাইয়া দিতে বাধ্য হয়। নরনারী উভয়েরই শারীরিক সৌন্দর্য্য রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য। সেই স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যায়ামের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। একমাত্র ব্যায়ামই মানবের দেহকে সুস্থ, সুগঠিত, বলপুষ্ট, হালকা ও কর্ম্মঠ করিতে সক্ষম। আমাদের দেশের অধিকাংশ নারী এই শরীর চর্চ্চাকে উপেক্ষা করিয়া মূল্যবান শাড়ী, অলঙ্কার, সাবান, স্নো, পাউডারের সাহায্যে আপন সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে বৃথা চেষ্টা করেন। তাঁহারাই দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জননী, তাঁহাদের স্বাস্থ্যের উপরই দেশের ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য-সম্পদ পূর্ণমাত্রায় নির্ভর করে। তাঁহারা এই ভুল পথ ত্যাগ করিয়া শরীর চর্চ্চায় ও স্বাস্থ্যরক্ষায়

সৌন্দর্য্যরক্ষার উপায়।

মনোযোগী হইলে দেহের প্রকৃত সৌন্দর্য্য অনেকাংশে বাড়াইতে পারেন, নীরোগ সুস্থদেহে দীর্ঘ জীবন ভোগ করিতে পারেন এবং জাতির ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারেন। সৌন্দর্য্য রক্ষার মিথ্যা চেষ্টা করিয়া নানারূপ প্রসাধন সামগ্রীর পেছনে অযথা অর্থব্যয়ও করিতে হয় না।

শিশুদের সম্মুখে কদাপি আপনাদের গুরুজন বা স্নেহভাজনদের নিন্দা করিতে নাই। কোন কারণেই তাঁহাদের সম্বন্ধে কোনরূপ অসম্মানজনক রূঢ় কথা বলিতে নাই ও অবিরত তাঁহাদের দোষোদ্‌ঘাটন করাও অন্যায়। অনেক পরিবারে এরূপ দেখা যায় যে, সামান্য স্বার্থের জন্যও শিশুদের সম্মুখে ভাই ভাই নিরন্তর কলহ করে, একে অপরকে অতি হীন ভাষায় আক্রমণ করে। সেই সব শিশুদের উত্তরকালে তাহাদের পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা সম্ভব। জনক-জননীকে যাহা করিতে দেখিবে ও বলিতে শুনিবে, শিশুরা তাহাই অতি অনায়াসে অনুকরণ করিবে, ইহাই স্বাভাবিক। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত, যে শিশু জনক-জননীর দেখাদেখি তাহার খুড়া জ্যাঠার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িল, একান্নভুক্ত পরিবারে বাস করিয়া সে শিশুর পক্ষে আপন ভাইয়ের প্রতি মমত্ব ও সম্প্রীতি রক্ষা করিয়া চলা প্রায় এক প্রকার অসম্ভব।

কন্যার বিবাহের জন্য সঞ্চয়।

কন্যা সন্তান জন্মিলেই তাহার বিবাহাদির জন্য মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনক-জননীর পৃথক ভাবে কিছু কিছু সঞ্চয় করা একান্ত কর্ত্তব্য। অতীত সভ্যতা গর্ব্বে গর্ব্বিত ও বর্ত্তমান সভ্যজগতের দোষাবলি অনুকরণকারী আমরা। আমাদের সমাজে বহু স্থানে এখনও কন্যার জন্য বর ক্রয় করিয়া দিতে হয়। পণরূপ

সেলামী, উৎকোচ বা নজর সঙ্গে দিয়া পিতামাতার বড় আদরের, বড় স্নেহে বর্দ্ধিত কন্যাকে পরের ঘরে তুলিয়া দিতে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। সে সময় যাহাতে ঋণগ্রস্ত হইতে না হয়, ভিটামাটি বন্ধক দিতে না হয়, কন্যাকে উপযুক্ত বস্ত্রালঙ্কার দেওয়া যায় এবং অর্থের অভাবে কোন উপযুক্ত বর হাত ছাড়া হইয়া না যায় সময় থাকিতে তাহার ব্যবস্থা করাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত সংসারের অধিকাংশের অবস্থা বর্ত্তমানে প্রায় অচল, ইচ্ছামাত্র কন্যার বিবাহের ব্যয় সঙ্কুলান করা অতিশয় কঠিন। অতএব সময় থাকিতে তাহার জন্যে সাবধান না হইলে যে কিরূপ বিপদগ্রস্ত হইতে হয়, কিরূপ কন্যাকে কত অযোগ্য পাত্রের হাতে সমর্পণ করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন।

কন্যা ১৪ বৎসর বয়সে পা দিলেই তাহার জন্য মনোমত পাত্রের সন্ধান আরম্ভ করা মন্দ নহে। বিবাহ সম্বন্ধে সকল প্রকার ভাল-মন্দের কথা, বরের সমালোচনা স্বামীস্ত্রীতে মিলিত হইয়া করিবেন।

কন্যার জন্য পাত্র মনোনয়ন।

বিবাহের সকল প্রকার কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য নিজেরা স্থির করিবেন, কদাপি কন্যার সম্মুখে তাহা লইয়া আলোচনা করিবেন না। সর্ব্ববিষয়ে জনক-জননীর মনোমত সাধ্যায়ত্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাত্রই কন্যার জন্য মনোনীত করিবেন। কুশ্রী, স্বাস্থ্যহীন, নীচকুলোদ্ভব, মূর্খ, পানাসক্ত, পাপাচারী, কুলজ ব্যাধিগ্রস্ত, বিলাসী, অশিষ্ট, ক্রোধী পাত্রের সহিত ও কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত জনক-জননীর পুত্রের সহিত, অপরের বৃদ্ধ বয়সের পুত্রের সহিত, বিদ্যা, বিত্ত, বিনয়, সম্পদবিহীন, বাচাল, কামান্ধ, বিপত্নীক, অকালপক্ক প্রগল্‌ভের সহিত

কন্যার বিবাহ দেওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে, দিলে তাহার ফল প্রায়ই শুভ হয় না। নিতান্ত বিষময় হইয়া থাকে।

কন্যা একটু বয়স্থা হইয়া উঠিলে অরক্ষণীয়া মনে করা অতি নিষ্ঠুর প্রথা। ভগবানের দান ও পিতামাতার একান্ত স্নেহের পাত্রী বোধে অতিশয় নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে পুত্রের ন্যায় সমভাবে কন্যাকে লালনপালন করাই ধর্ম্মসঙ্গত। মেয়ের বয়স বাড়িতে থাকিলে সে জন্য হা হুতাশ করা, বিমর্ষভাবে তাহার সম্মুখে থাকা, তাহাকে তিলমাত্র অবহেলা করিয়া রূঢ় কথা বলা ধর্ম্মবিগর্হিত। পুত্র যদি ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অতিবাহিত থাকিয়াও কোন প্রকারে জনক-জননী, পরিবার বা সমাজের চিন্তার কারণ না হয়, তবে ১৬।১৭ বৎসর মধ্যে কন্যার বিবাহ না হইলে চিন্তার কি কারণ থাকিতে পারে তাহা বুঝিয়া ওঠা দুরূহ। বয়স্থা কন্যা বিবাহ হওয়া পাপ বা অপরাধ নহে, তাহাকে অরক্ষণীয়া মনে করাই মহাপাপ।

কন্যাকে অরক্ষণীয়া মনে করা পাপ।

যে সমস্ত মহীয়সী ভারতনারী দেবীর ন্যায় আমাদের গৃহে গৃহে পূজিতা হ'ন তাঁহাদের অধিকাংশেরই স্বয়ম্বর বা স্বীয় মনোনয়ন অনুসারে বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহারা আপন দৈহিক, মানসিক ও স্বামীর সর্ব্বপ্রকার অবস্থা এবং বিবাহের গুরুত্ব ও দায়িত্ব পূর্ণভাবে হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই জীবনের সর্ব্বপ্রকার দুঃখবিপদকেই হাসিমুখে বহন করিয়া আজ ঘরে ঘরে পূজিতা হইতেছেন। আমরা কথায় অকথায় সাবিত্রী, শৈব্যা, দময়ন্তীর কথা বলি, কাজে অকাজে মেয়েদিগকে তাঁহাদের মত হইতে বলি কিন্তু তাহাদিগকে কি অবস্থায় কাহার হাতে সঁপিয়া দেই একথা তাহাদিগকে জানিতে বুঝিতেও বড়

দেই না। অনেক স্থানে বিবাহ, স্বামী ও সংসার সম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে, এমন কি নিজের দেহ সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিতেই কন্যার বিবাহ দিয়া থাকি। ইহার ফলে, দশ বৎসরের নিম্ন বয়স্কা হাজার হাজার বিধবা আজ দেশ ভরিয়া গিয়াছে। অপরিপক্ক দেহে গর্ভধারণের ফলে দেশের প্রসূতি ও শিশুমৃত্যু বন্যার জলস্রোতের ন্যায় বাড়িয়া চলিয়াছে, যাহারাও বা বাঁচিয়া আছেন অন্যান্য দেশের পরমায়ুর সঙ্গে তাঁহাদের পরমায়ুর তুলনা করিলে চক্ষু অন্ধকার হইয়া যায়। ইহা দেশের ও জাতির পক্ষে কত বড় ক্ষতি তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবার সময় বোধ হয় আসিয়াছে। কোন প্রকার প্রলোভনে, প্ররোচনায়, সাময়িক সুযোগ-সুবিধার আশায় কন্যাকে অপরিণত ও অপরিপক্ক বয়সে বিবাহ দিয়া সমাজ ও স্বদেশের অনিষ্ট করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যার বিবাহের শোচনীয় পরিণাম।

মাতা অতিশয় কৌশলের সহিত বিবাহিত জীবনের সকল প্রকার অভিজ্ঞতা কন্যাকে শিক্ষা দিবেন। কন্যা যদি স্বাস্থ্যহীনা ও কোনরূপ দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিগ্রস্তা হইয়া বিবাহে অনিচ্ছুক হয়, তবে সেই সব দোষ বর পক্ষের নিকট গোপন রাখিয়া তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দিয়া তাহার জীবনকে বিষাক্ত করা অযৌক্তিক। কন্যা যদি কোন বরের চরিত্র, আচার, ব্যবহার ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হয়, তবে সেই সব দোষ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া যদ্যপি তাহার মত খণ্ডন করিয়া তাহাকে সানন্দে সম্মত করান না যায়, তবে শত প্রলোভনে পড়িয়াও সে স্থানে বিবাহ স্থির করা কর্ত্তব্য

নহে। স্বাস্থ্যবান, সদ্বংশজ, বিদ্বান, বিনয়ী ও শিষ্টাচারী সৎপাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ স্থির করিবার সময় কন্যা, বর বা বরপক্ষকে যে দ্রব্যালঙ্কার দিতে প্রতিশ্রুত হওয়া যায়, যথাসময়ে তাহা দেওয়া কর্ত্তব্য। সাধ্যের অতীত কোন প্রতিশ্রুতি বরপক্ষকে দিতে নাই। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া কোন দ্রব্য সময়মত কম দিলে বা না দিতে পারিলে হয়তো সেজন্য কন্যাকে গঞ্জনা ভোগ করিতে হইবে। পূর্ব্বাহ্নেই এ বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া সাধ্যমত প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত, না পারিলে সময়মত ক্ষমা চাহিয়া লইয়া দায়মুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

কন্যাকে সাধ্যমত বস্ত্রালঙ্কার সকলেরই দেওয়া কর্ত্তব্য। কন্যা পরের ঘরে সব লইয়া যাইবে মনে করিয়া কদাপি সাধ্যমত দ্রব্যাদি তাহাকে দিতে কার্পণ্য করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। সে যেরূপ বস্ত্রালঙ্কার পছন্দ করে, সাধ্যাতীত না হইলে জনক-জননী তাহা অবশ্যই দিবেন। সাধ্য থাকিলে কন্যার সঙ্গে এমন দ্রব্যাদি দেওয়া উচিত, যাহাতে শ্বশুর গৃহে যাইয়া অল্পদিনের মধ্যে তাহাকে কাহারো নিকট কিছু চাহিতে না হয়।

জামাতার সঙ্গে পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কোন কারণেই শ্বশুরগৃহের প্রতি যাহাতে তাহার কোন প্রকার আক্রোশ বা অশ্রদ্ধার উদ্রেক না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কারণ সেই আক্রোশ কন্যার উপর অন্য আকারে যাইয়া বর্ত্তিতে পারে।

দুর্ভাগ্যক্রমে যদি কন্যা নিঃসন্তানা বালবিধবা হ'ন, তবে যথাসময়ে বিধবা বিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত, ইহা তাঁহাকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেওয়া

কর্ত্তব্য। যদি তিনি সকল দিক বুঝিয়া স্বেচ্ছায় পুনর্বিবাহে সম্মত হ'ন, তবে অসঙ্কোচে তাঁহার পুনর্বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য।

বালবিধবা কন্যা।

আর যদি তিনি বিবাহ করিতে অস্বীকৃতা হ'ন, ধর্ম্মপথে তাঁহার মতি থাকে, চরিত্রে খুব দৃঢ়তা থাকে, তবে তাঁহার অসম্মতিতে কদাপি জোর করিয়া তাঁহার পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করা উচিত নহে। জনক-জননী সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাকে সৎপথে থাকিতে সাহায্য করিবেন। সহজবোধ্য ধর্ম্মগ্রন্থাদি তাঁহাকে সরবরাহ করিতে হইবে, সাধ্যমত তাঁহার দুঃখের অংশ বহন করিয়া তাঁহার দুর্ভাগ্যকে লাঘব করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যতদিন জনক-জননী জীবিত থাকিবেন, সম্ভব হইলে তাঁহাকে নিকটে রাখিবেন, পারিলে তাঁহার ভবিষ্যৎ ভরণপোষণের জন্য কিছু সংস্থান অবশ্য করিবেন। পুত্র ও পুত্রবধূদিগকে তাঁহার প্রতি সদয় ও সহৃদয় ব্যবহার করিতে শিক্ষা দিবেন। জনক-জননীর অভাবে তিনি যেন অনাডম্বর অন্নবস্ত্রের জন্য ভাই ও ভাইবৌর মুখ ঝাঁকানি না খান এবং গৃহের দাসী বাঁদীর মত ব্যবহার না পান।

শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া পুত্র ব্যবসাবাণিজ্য, কৃষি অথবা অন্য কোনরূপ সদুপায়ে উপার্জ্জনক্ষম হইলে এবং সুস্থ, সচ্চরিত্র ও বিবাহেচ্ছু হইলে ন্যূনাধিক পঁচিশ বৎসরের সময় তাহাকে বিবাহ করান মন্দ নহে। অপরিপক্ক বয়সে ও শিক্ষার সময় কদাপি তাহার বিবাহ করান কোন কারণেই কর্ত্তব্য নহে।

পুত্রের বিবাহকাল।

কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত, চরিত্রহীন, মদ্যপায়ী, উশৃঙ্খল, স্বাস্থ্যহীন, দুর্ব্বল পুত্রকে কোন কারণেই বিবাহ করান উচিত নহে, বংশ রক্ষার জন্যেও নহে।

অনেক ঠাকুরদা, ঠাকুরমা নাতিবৌ দেখিবার জন্য ও অনেক বৃদ্ধ বয়সের পুত্রের জনক-জননী পুত্রবধূর মুখ দেখিয়া যাইবার জন্য অতি শৈশবে পৌত্র পুত্রাদির বিবাহ দিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, একটা খেয়াল বা সখমাত্র পূরণের জন্য সেই পৌত্র বা পুত্রের অপরিপক্ক স্কন্ধে কত বড় একটা গুরুভার চাপাইয়া দিয়া তাঁহারা সরিয়া পড়িতে চাহিতেছেন। ইহাতো প্রকৃত হিতৈষীর কাজ নয়। যদি উপযুক্ত ভাবে গঠিত করিয়া সুনির্ব্বাচিত পথে পুত্রকে ছাড়িয়া দিয়া যাইতে পারা যায়, তবে তাহার উপযুক্ত বিবাহের অভাব কোনকালেই ঘটিবে না, ইহা স্থির নিশ্চয়।

পুত্রের জন্য বধূ নির্ব্বাচন।

পুত্রের জন্য সদ্বংশজাত, স্বাস্থ্যবতী, সুলক্ষণা, সুশ্রী, শিক্ষিতা এবং সুস্থ নীরোগ পিতামাতার কন্যা নির্ব্বাচন করাই কর্ত্তব্য। জনক-জননীর যে বয়সের পুত্র, সম্ভব হইলে সেইরূপ বয়সের জনক-জননীর কন্যা নির্ণয় করিতে পারিলে ভাল হয়। কন্যাপক্ষকে কদাপি অর্থাদির জন্য পীড়ন করা কর্ত্তব্য নহে। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, বিবাহের উদ্দেশ্য বংশরক্ষার্থে বধূ সংগ্রহ, অর্থ সংগ্রহ নহে। অর্থ অপেক্ষা কন্যার শ্রেষ্ঠত্বের প্রয়োজন অনেক বেশী। অর্থের প্রলোভনে নীচবংশজা, স্বাস্থ্যহীনা, কুৎসিৎ বধূ কদাপি পুত্রের জন্য নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য নহে। বধূ নির্ব্বাচন অতিশয় বিবেচনা ও চিন্তার সহিত করা উচিত। নির্ব্বাচিত বধূর উপর পুত্রের সর্ব্বপ্রকার গৃহসুখ ও বংশের ভবিষ্যৎ পূর্ণমাত্রায় নির্ভর করে। বস্ত্রালঙ্কার বা অর্থের সঙ্গে ইহার কোনই সম্বন্ধ নাই। বধূই ভবিষ্যৎ বংশের জননী ও রক্ষয়িত্রী। পুত্রকে জীবনে সুখী

দেখিবার বাসনা থাকিলে নিজের বংশ স্বাস্থ্যবান, সবল, সুশ্রী বংশধরগণ দ্বারা রক্ষা করিবার অভিলাষ থাকিলে অন্য কিছু ভাবিবার আগে বধূ ও তাহার পিতামাতার স্বাস্থ্য ও বংশের খোঁজ-খবর বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা একান্ত কর্ত্তব্য। যদি স্বাস্থ্যবতী, সুশ্রী, সুলক্ষণা বধূ পাওয়া যায় তবে অর্থাদির প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সানন্দে ও সাগ্রহে সেই বধূ বরণ করিয়া গৃহে তুলিয়া লওয়া সর্ব্বতোভাবে সমীচীন। যদি কোন দীনদরিদ্রের ঘরে এইরূপ সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যা পাওয়া যায়, তবে সেই কন্যার জনক-জননীকে সাহায্য করিয়া কন্যাদায় মুক্ত করা বিবেক ও ধর্ম্মসম্মত।

বধূই ভবিষ্যৎ বংশের জননী।

না-ইবা হইল নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ, মিছিল, আলো, ফুলমালা, বাদ্যভাণ্ডের ঘটা, পরকে পীড়ন করিয়া আনিয়া সেই অর্থে অকারণে বাজি পোড়াইয়া না-ই হইল বিবাহের আমোদ প্রমোদ, না হয় শাঁক বাজাইয়া ছেলের বিবাহ হইবে, তবুও কদাপি পরের চক্ষের জলে ধোয়া টাকা গৃহে আনিতে নাই। পরপীড়ন মহাপাপ। কদাপি সে পাপে লিপ্ত হইতে নাই। যাহার সঙ্গে দুইদিন বাদে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা জন্মিবে, তাহাকে পীড়া দিয়া পরে আবার তাহাকে মুখ দেখানই বা সম্ভব হইবে কিরূপে? যদি কোন সক্ষম ব্যক্তি স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অর্থ, যৌতুক, অলঙ্কারবস্ত্রাদি দেন তবে তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে।

বিবাহে উৎসব।

কেবলমাত্র পুত্রের বা তাহার বন্ধুদের মতামতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া পুত্রের বিবাহ স্থির করা যুক্তিসঙ্গত নহে। তাহারা যুবক, সংসারে অনভিজ্ঞ। নানাকারণে তাহারা হয়তো কোন অকরণীয় কার্য্যেও

মত দিয়া ফেলিতে পারে। পুত্রের বিবাহের যতগুলি সম্বন্ধ উপস্থিত হইবে, তাহার মধ্য হইতে করণীয় কয়েকটী সম্বন্ধ বাছিয়া লইয়া, পুত্রের পিতা দুই এক জন সদ্বিবেচক বন্ধুসহ কন্যা দেখিতে যাইবেন। কন্যা সর্ব্ব বিষয়ে সুলক্ষণা হইলে নির্ব্বাচন করিয়া আসিয়া প্রয়োজন হইলে তাহার রূপ ও গুণের বিষয় প্রশংসার সহিত ব্যাখ্যা করিয়া নিজে অথবা স্ত্রীকে দিয়া পুত্রের মতামত চাহিবেন, অথবা উপযুক্ত সঙ্গী সহ তাহাকে সেই কন্যা দেখিতে পাঠাইবেন। সেখানে যাইয়া কিরূপ বিনয়, রীতিনীতি ও শিষ্টাচার দেখান কর্ত্তব্য, তাহা পুত্রকে বিশেষভাবে বলিয়া দিবেন। পুত্রের কোনরূপ অশিষ্ট বা অসঙ্গত ব্যবহারে ভাবী পুত্রবধূ বা কুটুম্বস্বগণের মনে যেন অসন্তোষ বা দ্বিধার উদ্রেক হইতে না পারে।

বর্ত্তমানে বন্ধুগণ অনুগামী পুত্রদ্বারা কন্যা দেখান ও নিরূপণ করার রীতি অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। বন্ধুদের মধ্যে নানারূপ লোকই থাকে। তাহাদের রুচিমত আহার-বিহার প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতেই দরিদ্র কন্যার পিতার প্রাণান্ত হয়। বিবাহযোগ্যা অনূঢ়া কন্যা ঘরে থাকিলে ঝাঁকে ঝাঁকে বর ও তাহাদের বন্ধুর দল স্রোতের মত আসিয়া কন্যার পিতার অন্ন ধ্বংস করিতে থাকে। সাধ্যমত ও কোন কোন ক্ষেত্রে সাধ্যাতীত আহার্য্য ও সৌজন্যের ব্যবস্থা তাঁহাকে করিতে হয়। আধুনিক বর ও তাহার বন্ধুদের প্রাভাতিক চাপান হইতে সুরু করিয়া রাত্রিতে তাহাদের শয্যাগ্রহণ পর্য্যন্ত কন্যার পিতামাতাকে তটস্থ থাকিতে হয়। তারপর জননীর অঞ্চলাশ্রয়ে বর্দ্ধিতা একান্ত লজ্জাশীলা, স্বল্পবয়স্কা, অপরিপক্কা কন্যা কম্পিত পদে হেটমুণ্ডে যখন আসিয়া বর ও তাহার বন্ধুদের সম্মুখে দাঁড়ায়, তখন বন্ধুবর্গের মধ্য হইতে অবিরত নানারূপ প্রশ্ন হইতে থাকে।

যে যত সম্ভব অসম্ভব প্রশ্ন করিয়া কন্যাকে ব্যতিব্যস্ত ও অপ্রস্তুত করিতে পারে, সে-ই যেন তত বাহাদুর। কন্যার বংশ, স্বাস্থ্য, গৃহকর্ম্মে নৈপুণ্য প্রভৃতির খোঁজ ইহারা বড় একটা করে না। কন্যা হারমোনিয়ম, পিয়ানো, সেতার, এস্‌রাজ বাজাইতে পারে কি না, গান গাইতে পারে কি না, এই সব প্রশ্নই ইহাদের নিকট অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া বোধ হয়। বলা বাহুল্য এই সব ধুরন্ধরদের হাতে যাঁহারা পড়েন, উদয়াস্ত সংসারের সকল প্রকার কাজ করিতেই তাঁহাদের প্রাণান্ত হইয়া যায়, গান গাওয়া, হারমোনিয়ম, সেতার, এস্‌রাজ বাজাইবার সময় মেলাতো দুরস্থান, সে সব ক্রয় করিবার সামর্থ্যও আর সেই সব মহারথীদের অনেকেরই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বিবাহের পূর্ব্বে যদি পুত্রকে নির্ব্বাচিত কন্যা দেখান প্রয়োজন বোধ হয়, তবে পুত্রের পিতা নিজে তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া দেখান মন্দ নহে। যে পুত্র পিতামাতার প্রতি ভক্তিমান, নির্ভরশীল ও আস্থাবান, তাহারা প্রায়ই কন্যা দেখার প্রস্তাবে সম্মত হয় না। জনক-জননীর সদ্বিবেচনার উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। কর্ত্তব্যশীল, স্নেহবান, সদ্বিবেচক পিতামাতার উপর নির্ভর করিলে এ বিষয়ে পুত্রকে প্রায়ই ঠকিতে হয় না, ইহা বহু স্থলের অভিজ্ঞতা হইতে দৃঢ়তার সহিত বলা যায়।

নির্ব্বাচিত পুত্রবধূকে জনক-জননী সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিয়া ঘরে তুলিয়া লইবেন। কন্যার মত তাহাকে ভালবাসিবেন, আদর, যত্ন ও স্নেহ করিবেন।

পুত্রবধূ অপরের কন্যা বলিয়া কদাপি কোন কারণেই তাহার প্রতি রূঢ় হইয়া দুর্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। নিজেদের কন্যা পরের ঘরে গিয়া কিরূপ ব্যবহার পাইলে মনে কিরূপ আনন্দ বা দুঃখ হয়, তাহা

অনুভব করিয়া দেখিয়া বধূর প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। যা'র যা'র বংশের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যেই বধূর প্রয়োজন। বধূরাই ভবিষ্যৎ বংশধারা, পরিবার, সমাজ ও স্বদেশের জননী। তাঁহারাই বংশ, পরিবার, দেশ ও দশের জন্য সন্তান প্রসব করিবেন। অতএব বংশকে সুস্থ, সুগঠিত, বলপুষ্ট, দীর্ঘায়ু বংশধর দ্বারা রক্ষা করিবার অভিলাষ থাকিলে, প্রকারন্তরে ঘরে ঘরে সুসন্তান দ্বারা সমাজ ও স্বদেশকে রক্ষা করিতে হইলে সেই সব ভবিষ্যৎ শিশুদের জননী বধূদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহাদের স্বাস্থ্য, শান্তি ও মঙ্গলকে আমরা উপেক্ষা করি বলিয়া আমাদের আজ দুর্গতির সীমা নাই। কত বড় গুরুতর জটীল সমস্যা আমাদের গতানুগতিক সংস্কার, দেশাচার ও লোকাচারের মধ্যে অতি অবহেলায় আমাদের মধ্যে সহজ হইয়া রহিয়াছে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখা প্রত্যেক গৃহী ও গৃহিনীর অবশ্য কর্ত্তব্য। হেলা খেলায়, সংস্কার-বশে, দশজনের দেখা দেখি, অন্ধ কর্ত্তব্যের অজুহাতে পুত্রকে কেবল বিবাহ করাইলেই কর্ত্তব্য সমাপন হইল না। বিবাহের প্রকৃত কারণ ও উদ্দেশ্য অতিশয় নিপুণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেখা একান্ত কর্ত্তব্য। প্রতিটী বধূর নিকট প্রতিটী পরিবার, সমাজ ও স্বদেশ কতখানি আশা করে ও দাবী রাখে, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। সে দাবী বধূরা মিটাইতে পারেন না বলিয়া আজ আমাদের বংশ ধ্বংসোন্মুখ, সমাজবন্ধন শিথিল, স্বদেশে আমরা স্বাস্থ্য, অন্ন, আয়ু, বলহীন পঙ্গু। বধূরা যাহাতে সেই দাবী মিটাইবার উপযুক্ত হন, সেজন্য যত্নবান হওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। তাঁহাদের স্বাস্থ্য

বধূর প্রয়োজন কেন?

বধূর নিকট দেশের দাবী।

অক্ষুণ্ণ রাখাই সেই দাবী মিটাইবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। তাঁহাদের আহার, বসন-ভূষণ, কাজ-কর্ম্ম যাহাতে পরিমিত ও নিয়মিত হয়, তাঁহাদের স্বাস্থ্য, বল, আয়ু যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তৎপ্রতি প্রত্যেকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। পুত্রের স্বাস্থ্য, বল, তেজ, বীর্য্যের ন্যায় বধূর প্রতিও তুল্য ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বধূরাই স্বামী, পরিবার, সমাজ ও স্বদেশের অর্দ্ধাঙ্গ, কাজেই তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া অপর অর্দ্ধাঙ্গ শত চেষ্টা করিয়াও কোন নিশ্চিত মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে না। তাহা লাভ করিতে হইলে, তাঁহাদিগকেও সকল প্রকারে উপযুক্ত করিয়া লইতে হইবে।

বধূরাই দেশের অর্দ্ধাঙ্গ।

অনেক পরিবারে দেখিয়াছি, প্রতিশ্রুত বস্ত্রালঙ্কার, যৌতুকাভরণ বধূর পিতামাতা দিতে না পারায় বা বধূ তেমন রূপবতী না হওয়ায়, তাঁহাকে অশেষ প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে। অনেক পরিবারে স্বল্পবয়স্কা বধূকে উদয়াস্ত নীরবে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়াও কারণে অকারণে গৃহিনীর নিকট তিরস্কৃতা হইতে দেখিয়াছি। সে সব পরিবারের কেহ বধূর আহারাদির খোঁজ খবরও লন না। তাঁহার ভাগ্যে উদ্বৃত্ত আহার্য্যাদি যাহা কিছু জুটীল তাহাই যেমন তেমন করিয়া অসময়ে আহার করিয়া দিনের পর দিন ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইয়াছে। বংশের, সমাজের, স্বদেশের ভবিষ্যৎ জননী যিনি, তাঁহার প্রতি এই নির্ম্মম ব্যবহার দেশের কত বড় দুর্গতির পরিচায়ক তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়।

বধূর প্রতি অযথা অত্যাচার।

সংসারে আনিয়া দাসী, বাঁদী, রাঁধুনী, ধাত্রীর মত কেবল দিবানিশি নীরবে খাটাইবার জন্য, সংসারের সকল প্রকার কাজ কর্ম্ম নির্ম্মম

নির্দ্দয়তার সঙ্গে করাইবার জন্য, একটু ভুল-ক্রটীতে সর্ব্বদা বকা ঝকা করিবার জন্য বা পুত্রের যৌবনের বিলাসের জন্য বধূর প্রয়োজন নহে। বধূর প্রয়োজন বংশরক্ষার জন্য ইহা চিন্তা করিয়া হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিয়া বধূর প্রতি ব্যবহার করিতে হইবে।

এমন অনেক পরিবার দেখিয়াছি, যাঁহারা বধূকে কন্যার মত ভালবাসেন, স্নেহ-যত্ন করেন। কিন্তু যাঁহারা তাহা করেন না, বস্তুতঃই কেবলমাত্র সর্ব্বপ্রকার গৃহকর্ম্ম করাইবার জন্য যাঁহারা পুত্রকে বিবাহ করান, তাঁহারা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন, নিজেদের কন্যার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার হইলে কিরূপ কষ্ট বোধ হয়। বধূ অপরের কন্যা বলিয়া, সমস্ত স্বজনগণ ছাড়িয়া নিতান্ত অসহায়ের মত অপর এক পরিবারে তাঁহাকে আসিতে হয় বলিয়া এবং সে পরিবারে তাঁহার স্বপক্ষে কথা বলিবার কেহ নাই বলিয়া শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর কন্যা অপেক্ষা তাঁহার সুখ দুঃখ বোধ এতটুকুও কম নহে।

গৃহে বধূ আসিলেই অনেক শ্বাশুড়ী বিশেষতঃ বিধবা শ্বাশুড়ী সর্ব্বদা শঙ্কিত হইয়া থাকেন, কখন বা তাঁহার পুত্রটী বধূর কথায় বিরূপ হইয়া পড়ে, কখন বা সংসারের কর্ত্তৃত্ব তাঁহার হইতে ছিনাইয়া বধূর হাতে দেওয়া হয়। বধূর প্রতি বেশী আকৃষ্ট হইলে ছেলে বা শেষে বিগড়াইয়া যায়, এইজন্য তাঁহারা অনেক সময়ই বধূর প্রতি অকারণে অসন্তোষ পোষণ করেন ও নিজের অজ্ঞাতেও অনেক সময়ই বধূর প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিয়া থাকেন। পুত্র সবিনয়ে মাতার ক্রটীর বিষয় কিছু কহিলে, তিনি আরও অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করেন এবং বধূর পক্ষ হইয়া পুত্র মাতার সহিত কলহ করিতে চায়,

শ্বাশুড়ীর অলীক শঙ্কা।

মাকে আর মানিতে চায় না, পুত্রের সংসারে পড়িয়া তাঁহার সকল প্রকার মান-সম্মান, প্রতিপত্তি নষ্ট হইয়া গেল, ইত্যাদি তারস্বরে সকলকে শুনাইয়া বলিতে থাকেন। আপনার বৈধব্যের কাহিনী উঠাইয়া রোদন করিয়া কোন নিরুদ্দিষ্ট পথে চলিয়া যাইবার সঙ্কল্প প্রচার করেন। পুত্র বেচারী হয়তো নীরবে সরিয়া যায়, জননীর সমস্ত আক্রোশ নিরপরাধা বধূর প্রতি পড়ে ও তাঁহাকে অযথা দুঃখ পাইতে হয়।

জননীগণের আপন আপন বিবাহিত জীবনের কথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। স্বামীর ভালবাসা না পাইলে তাঁহাদের মনে কত ব্যথা বাজিত। পুত্রবধূও যদি তেমনি স্বামীর ভালবাসা না পায়, পুত্র যদি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হয়, তবে তাঁহার দুঃখও তো ঠিক তেমনি হইবে। বধূর প্রতি পুত্র আকৃষ্ট হউক, বধূকে যথেষ্ট ভালবাসুক ইহাইতো জননীদের কামনা করা উচিত। জননীর প্রতি ভক্তি ও স্ত্রীর প্রতি স্নেহ দুইটা পৃথক জিনিষ। উভয়ই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। একটা থাকিলে অপরটা নষ্ট হইবার কোনই সঙ্গত হেতু নাই। যে পুত্র চিরকাল মাতৃভক্তিহীন, কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন অপদার্থ, সে মাতা পত্নী উভয়ের প্রতিই তুল্য ব্যবহার করিবে। সেজন্য বধূ দায়ী নহেন। আর যে সন্তান মাতৃভক্ত, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, সদ্বিবেচক, সত্যাগ্রহী, ধার্ম্মিক, সে চিরকালই মাতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য ও বধূর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য নিশ্চয়ই করিবে, বধূ তাহাকে নষ্ট করিতে পারিবে না। জননীগণ সেজন্য কাল্পনিক কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করিয়া পুত্র ও বধূর প্রতি অবিচার করিয়া সংসারে অশান্তি আনিবেন না। বিধবা জননীগণের সাধ্যমত সংসারের দায়িত্ব বধূর উপর ছাড়িয়া দিয়া ভগবানের চিন্তায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিবার চেষ্টা করাই

সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। শ্বাশুড়ী হইলেই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞা এবং বধূ হইলেই সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞা হওয়া সম্ভব নহে। আর যেহেতু বধূ ভিন্ন এক পরিবার হইতে অপর এক সংসারে প্রবেশ করেন, তাঁহার ভুল, ক্রটী, অন্যায়, অপরাধ হওয়াই স্বাভাবিক। আপনাদের ক্ষমা, স্নেহ, ভালবাসা ও সহিষ্ণুতা দ্বারা তাঁহার সকল অপরাধ ঢাকিয়া রাখিয়া সদয় ও প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে সকল বিষয় শিখাইয়া বুঝাইয়া লইয়া আপনাদের বংশরক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া গঠিত করিয়া লওয়াই সদ্বিবেচক ও আদর্শ গৃহী ও গৃহিণীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

আমি বলি না যে, বধূ সংসারে আনিয়া কেবল তাঁহাকে বসাইয়া রাখিয়া লোকজন রাখিয়া দিয়া সংসারের কাজ চালাইতে হইবে।

বধূর প্রতি ন্যায্য ব্যবহার।

কেবলমাত্র সংসারের কাজ চালাইবার উদ্দেশ্যেই বধূ আনা কর্ত্তব্য নহে, তাহাই বলিতে চাই। শ্বশুর-শ্বাশুড়ী স্নেহে, মমতায়, ভালবাসায় তাঁহার জনক-জননীর স্থান অধিকার করিয়া লইলে এবং তাঁহার স্বাস্থ্য, বল ও সামর্থ্যানুযায়ী কার্য্যের ভার তাঁহার প্রতি দিলে তিনি নিশ্চয়ই সানন্দে ও হাসিমুখে তাহা সমাপন করিবেন। স্বেচ্ছায় তিনি আপন সংসারের সকল কর্ম্মভার আপনার স্কন্ধে তুলিয়া লইবেন।

পুত্রবধূ যোগ্যা হইয়া উঠিলে, ধীরে ধীরে সাবধানতার সহিত গৃহের সকল কর্ত্তব্য তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

পুত্র সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করিলেও অল্প আয়ের ব্যবসা, কৃষি বা চাকুরী যাহাতে সে সততা ও সন্তুষ্টির সহিত করিতে পারে তদনুরূপ শিক্ষা, উপদেশ ও উৎসাহ তাহাকে দিতে হইবে। আজকাল অনেক

ক্ষেত্রে চাকুরী অপেক্ষা তাহার উপুরী পাওনার প্রতি চাকুরীজীবি ও তাহার অভিভাবকদের দৃষ্টি অনেক বেশী। উপুরী পাওনা, চুরি বা প্রবঞ্চনারই নামান্তর মাত্র! চুরি বলিতে মুখে বাধে ও আইনের কবলে পড়ে, তাই উপুরী পাওনারূপ সভ্য আবরণ দিয়া ভদ্র ঘরের ছেলেরা নির্ব্বিচারে তাহা গ্রহণ করে ও লোকের বাহোবা পাইয়া থাকে। পিতামাতা বা নিকট আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের নিকট এইরূপ অর্থ উপার্জ্জনের জন্য কাহাকেও তিরস্কৃত বা ঘৃণিত হইতে বড় একটা দেখা যায় না। বরঞ্চ উৎসাহ ও প্রশ্রয়ই পাইয়া থাকে। এইরূপ চুরি করিয়া বিশিষ্ট ঘরের লোককে জেল পর্য্যন্ত খাটিতে দেখিয়াছি। অনেক স্থলে পীড়ন করিয়া ফাঁকি দিয়া অক্ষম ও দরিদ্রের নিকট হইতে অতি জঘন্য উপায়ে এই উপুরী পাওনা গ্রহণ করা হয়। ইহা পাপ ও অতিশয় ঘৃণার বস্তু।

উপুরী পাওনা।

সংসারে বাঁচিয়া থাকিতে অর্থের প্রয়োজন সন্দেহ নাই, কিন্তু ততোধিক প্রয়োজন চিত্ত সংযমের। সংযম যাহার নাই, লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হইলেও সে সুখের সন্ধান পায় না। আর এই সংযম বস্তুটী যে হৃদয়ে লালন করিয়া রাখিতে পারে, ভগবানের করুণার দান বলিয়া আপন শ্রমলব্ধ শাকান্নেই সে পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকে।

চোর, লম্পট, দুশ্চরিত্র পুত্র-পৌত্রাদির জন্য অগণিত অর্থ রাখিয়া যেটুকু তৃপ্তি লইয়া মৃত্যু হয়, পুত্র পৌত্রাদিকে সংযমী, শিক্ষিত, সুস্থ ও ধার্ম্মিক করিয়া রাখিয়া যাইতে পারিলে তাহা অপেক্ষা অধিক নিশ্চিন্ত হইবার সম্ভাবনা। সন্তানাদি যদি অসংযমী হয়, তবে যক্ষের মত প্রহরা দিয়া যে অর্থ সঞ্চিত রাখা হয়, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতিকে নিতান্ত দুঃখের

দিনেও যে অর্থের মনুষ্যোচিত ব্যবহার হইতে বঞ্চিত করা হয়, যে অর্থ পরার্থে দান করিতে সৎকাজে ব্যয় করিতে এমন কি নিজের জন্য ব্যয় করিতেও বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া যায়, সে অর্থ নিজের মৃত্যুর পর কোথায় ব্যয়িত হইতে পারে, না পারে সে কথা বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যদি পুত্রকে স্বাস্থ্য, সত্য ও ধর্ম্মে দৃঢ় করিয়া গঠিত করিয়া তোলা যায়, তবে তাহাকে রিক্তহস্তে ফেলিয়া গেলেও তাহার কোন কষ্ট হইবে না, তাহার পথ চির উন্মুক্ত হইয়া দেখা দিবে।

পুত্রের প্রথম অর্থোপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই এই সব কথা তাহাকে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া মর্ম্মে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। অর্থ কোন দিনই কাহারো সঙ্গে যায় না। ইহা কেবল অনাড়ম্বর ও বিলাস বাসনা বিহীন সংযত জীবনযাত্রার জন্য, দান ও সৎকার্য্যে সাহায্যের জন্য, স্বাধ্বী স্ত্রী ও সৎ পুত্রের ভবিষ্যতের পরিমিত সঞ্চয়ের জন্য প্রয়োজন। অর্থের প্রতি মমতা থাকা ভাল কিন্তু অতিরিক্ত মমত্ববোধ মানুষকে পরের বিপদে অন্ধ ও স্বগণগণের মর্ম্মান্তিক প্রয়োজনে উদাসীন করিয়া থাকে, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। অর্থের সদ্ব্যবহারের জন্যই সঞ্চয়ের প্রয়োজন, অসদ্ব্যয় ও আত্মসুখের জন্য নহে। পুত্র এই সব শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়া আনিবে, তদ্দ্বারাই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার সুব্যবস্থা করিতে হইবে এবং ক্রমশঃ পুত্র ও বধূর উপর সংসারের সকল ভার ছাড়িয়া দিয়া স্বামী-স্ত্রী মিলিয়া গৃহধর্ম্মের চরম ও পরম লক্ষ্য ভগবানের চরণ দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিবেন। গৃহধর্ম্মের অবসানে এইবার সংসার হইতে অবসর লইবার সময় হইয়াছে, দিবা অবসান প্রায়

পুত্রের উপার্জ্জন।

হইয়া আসিয়াছে। জীবনের দিন কয়টী এখন গণনার মধ্যে আসিয়া ঠেকিয়াছে, সংসারের মায়া কমাইয়া লইবার সময় হইয়াছে। জীবনের উদ্‌যাপিত সদসৎ সকল কৰ্ম্ম তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়া দিয়া মাৰ্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া লইয়া তাঁহারই স্নেহের আহ্বানের প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হইয়া থাকিবার অবসর আজ মিলিয়াছে।

দিবা অবসান প্রায়।

মানুষের তৃষ্ণার্ত্ত আত্মা যুগে যুগে যে অমৃতের তৃষ্ণায় পাগল আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছে, মানুষের অতৃপ্ত প্রাণ যে অন্তর দেবতার সন্ধানে ফিরিয়াছে, সেই অমৃতের ব্যাকুল পিপাসা অন্তরে জাগ্রত করিয়া সেই দেবতার মিলন লিপ্সার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া তাঁহারই পথ পানে চাহিয়া থাকিলে তিনি সকল অপরাধ মাৰ্জ্জনা করিয়া চরণে তুলিয়া লইবেন। জীবনের পরপারে একলা নিঃসঙ্গ পথের ধারে অলক্ষ্যে তিনি তাঁহার স্নেহহস্ত বাড়াইয়া দিয়া সংগোপনে পাশে আসিয়া দাঁড়াইবেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

রোগীর চিকিৎসা ও সেবা

আমরা স্ত্রীপুত্রপরিজন লইয়া সংসার করি, অভাব অভিযোগ যেমন আমাদের নিত্য সহচর, ব্যাধিপীড়াও তেমনি চিরসঙ্গী। কি সহরে, কি পল্লীতে, এমন পরিবার খুব কমই দেখা যায়, যেখানে বৎসরে অন্ততঃ একটী মাসও চিকিৎসকের প্রয়োজন হয় না, ঔষধের দরকার পড়ে না। উদয়াস্তকাল অন্নবস্ত্রের জন্য সংগ্রাম করিয়া আমরা যেমন ক্ষত বিক্ষত হইতেছি, ব্যাধিপীড়ার তাড়নেও তেমনি নিষ্পেষিত হইয়া কোন প্রকারে জীবন্মৃতের ন্যায় দিনাতিপাত করিতেছি, ইহা আমাদের দুই একটী পরিবারের কথা নহে।

শরীর থাকিলে ব্যাধি হওয়া অসম্ভব নয়, সেজন্য অত্যন্ত উতালা হইয়া অবিরত ঔষধপত্রাদি ব্যবহার করা উচিত নহে। কি প্রক্রিয়া করিলে এবং কি কি নিয়মাধীন হইয়া চলিলে ব্যাধির আক্রমণ হয় না, তাহাই প্রতিপালন করাই রোগাক্রান্ত না হওয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। অতিরিক্ত ঔষধ সেবন করিলেই শরীর নিরোগ হওয়া সম্ভব নহে, সাময়িক হইলেও ব্যাধির আক্রমণের আশঙ্কা সর্ব্বদাই থাকে। পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের মতে অতিরিক্ত ঔষধ সেবনে ও ঔষধের অপব্যবহারে পৃথিবীতে যত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, যুদ্ধে, দুর্ভিক্ষে বা মহামারীতে তত লোক ক্ষয় হয় নাই। উপযুক্ত

অতিরিক্ত ঔষধ সেবন।

ঔষধের অপব্যবহার।

চিকিৎসকের অভাব এবং কুচিকিৎসকের ব্যবস্থামত ঔষধের অপব্যবহারই অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

সাধারণ ব্যাধি-পীড়ার কারণ নির্ণয় করিয়া ও সেই কারণ নাশ করিয়া পথ্যাদি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বনপূর্ব্বক চলিলেই অনেক সময় ব্যাধি নিরাময় হইয়া থাকে। আর রোগী সাবধানতা অবলম্বন না করিলে পৃথিবীর সমস্ত চিকিৎসক ও ঔষধ একত্র করিলেও কোন সুফলের আশা নাই। মঙ্গলময় ভগবান আমাদের দেহে এমন সব স্বাভাবিক শক্তি দিয়াছেন, যাহারা সর্ব্বদা দেহকে সুস্থ রাখিতে চেষ্টা করে এবং বাহিরের কোন বীজাণু দেহে প্রবেশ করিবামাত্রই তাহাকে ধ্বংস করিতে প্রয়াস পায়। রোগের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তাহা দুর করতঃ সাবধানতা অবলম্বন করিলেই, দেহস্থ সেই শক্তি অতি অল্প সময়ে দেহকে নীরোগ করিয়া তোলে।

সাধারণ ব্যাধিপীড়া।

গৃহে কাহারও সদ্য বলক্ষয়কারী সাংঘাতিক সংক্রামক, স্পর্শাক্রমক বা অন্য কোনরূপ গুরুতর ব্যাধি দেখা দিলে রোগীর ও রোগীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনগণের যে চিকিৎসায় বিশ্বাস আছে সেই চিকিৎসায় পারদর্শী সাধ্যায়ত্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের হাতে রোগী রাখাই ভাল, যাহাতে অবিরত চিকিৎসার পদ্ধতি ও চিকিৎসক বদ্‌লাইতে না হয়। তাহা না হইলে অনেক সময় রোগীর চিকিৎসায় ব্যাঘাত জন্মে এবং এইরূপ অবস্থায় রোগী মারা গেলে অনুতাপের আর সীমা পরিসীমা থাকে না।

চিকিৎসক নির্ণয়।

চিকিৎসক ও ঔষধ আনিলেই রোগী ভাল হইয়া উঠিবে, ইহা মনে করা ভ্রমাত্মক। অনেকে চিকিৎসক আনিয়াই রোগীর সমস্ত দায়িত্ব চিকিৎসকের

স্কন্ধে দিয়া ভারমুক্ত বোধ করেন ইহা অতিশয় অন্যায়। আরও এমন দুইটী বিষয় রহিয়াছে, যাহার উপর রোগীর জীবন-মরণ ঔষধ অপেক্ষা বেশী না হইলেও তুল্যভাবেই নির্ভর করে। ইহার একটী রোগীর শুশ্রূষা, অপরটী তাহার পথ্য। এই দুইটী বিষয় যথাযথভাবে পালিত হইলে রোগীকে নিরাময় করিতে বোধ করি ঔষধ অপেক্ষাও অধিক সাহায্য করে। আর এই দুইটী বিষয়ে অজ্ঞতা ও অবহেলা থাকিলে অনেক স্থলেই সুচিকিৎসক বা ঔষধপত্র কিছুই করিতে পারে না। রোগীর সেবা, শুশ্রূষা ও পথ্যাদি সম্পূর্ণভাবে গৃহের লোকের উপরই নির্ভর করে। কাজেই প্রত্যেক গৃহের স্ত্রী-পুরুষদের এ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যকীয়। যে গৃহে সেবা, শুশ্রূষা ও পথ্যাদির সুব্যবস্থা হয়, সে গৃহে রোগী অতি দ্রুতগতিতে নীরোগ হইতে থাকে এবং চিকিৎসকও সেখানে চিকিৎসা করিবা সুবিধা পাইয়া থাকেন।

রোগীর সেবা ও পথ্যের দায়িত্ব।

আমাদের দেশে ও অন্যান্য অনেক দেশেই সেবা কার্য্য প্রায় মেয়েরাই করিয়া থাকেন। স্বভাবতঃ তাঁহাদের হৃদয় অতিশয় স্নেহকোমল বলিয়া তাঁহারা সহজেই এই ধর্ম্মে পারদর্শী হইয়া ওঠেন।

যিনি বা যাঁহারা রোগীর সেবা করিবেন, তিনি বা তাঁহারা রোগীর ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় হওয়াই উচিত। যাহার প্রতি রোগীর রাগ, দ্বেষ, হিংসা বা অবিশ্বাস আছে তাহাকে কদাপি সেবা কার্য্যে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য নহে। সেবাকারী সুস্থকায়, সহৃদয়, দয়াবান, স্নেহশীল, বাক্‌সংযমী, মিষ্টভাষী, সহিষ্ণু, নির্ভীক, আশাবান ও দৃঢ়চিত্ত হইলেই খুব ভাল হয়। সেবা মানবের এক অতি উচ্চ ধর্ম্ম। কদাপি ইহাকে হীনচক্ষে দেখিতে নাই।

রোগীর সেবা করিবার অধিকারী।

নিষ্ঠুর, দুর্দ্দান্ত, ধর্ম্মহীন, মিথ্যাবাদী, দুশ্চরিত্র, বহুভাষী, অলস, ভীরু, ভগ্নস্বাস্থ্য, অসহিষ্ণু ও আশাহীন ব্যক্তি কদাপি সেবা করিবার অধিকারী হইতে পারে না। এই প্রকৃতির লোকের উপর কোন রোগীর সেবার ভার না দেওয়াই মঙ্গল।

রোগের গুরুত্ব ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সেবাকারীর বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। নতুবা অসাবধানতা প্রযুক্ত সেই রোগ তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে।

রোগীর গৃহ।

সুপ্রশস্ত, আলোবাতাসপরিপূর্ণ, শুষ্ক ও সর্ব্বতোভাবে পরিষ্কৃত গৃহই রোগীর জন্য নির্দ্দিষ্ট করা কর্ত্তব্য। রোগীর গৃহের আশেপাশে ড্রেন, পায়খানা, গলিত আবর্জ্জনা বা কোনরূপ দুর্গন্ধাদি না থাকে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গৃহের মধ্যে বা রোগীর তক্তপোষের নীচে অতিরিক্ত কোন দ্রব্য সম্ভার না থাকাই ভাল। গৃহের এক পাশে একটী টেবিলের উপর ঔষধ-পত্রাদি ও একটী ছোট আলনায় রোগীর ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদি সাজাইয়া গুছাইয়া রাখা যাইতে পারে। শুশ্রূষাকারীর বসিবার জন্য দুই একখানি চেয়ার, টুল, হাওয়া করিবার পাখা, জলের পাত্র, মলমূত্র, বমি ও থুথুর পাত্র ভিন্ন অপর কোন জিনিষ সে গৃহে রাখিবার প্রয়োজন নাই। কোনরূপ অস্ত্র, ধারাল ছুরি, দা প্রভৃতি রোগীর গৃহে কদাপি রাখিতে নাই। গৃহের এমন স্থানে রোগীর শয্যা রচনা করিতে হইবে, যাহাতে সোজাসুজিভাবে তাহার দেহে বাহিরের বাতাস না লাগিতে পারে, অথচ গৃহের সমস্ত দরজা-জানালাই প্রয়োজন মত সদা সর্ব্বদা খুলিয়া রাখা যায়। রোগীর গৃহেব সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া গৃহে আলো জ্বালিয়া

প্রয়োজনাতিরিক্ত লোক কখনই রোগীর গৃহে থাকিবেন না। চিকিৎসকের নিষেধাজ্ঞা না পাইলে দিবারাত্রি সর্ব্বদাই গৃহের জানালা খোলা রাখিবেন।

রোগীর চক্ষে লাগে এরূপ প্রবল আলো কদাপি রোগীর গৃহে রাখা কর্ত্তব্য নহে। কেরোসিন প্রভৃতির আলো না রাখাই ভাল। ঐ সব আলো প্রায়ই অতিশয় তীব্র হয় এবং ঐ প্রকার আলোতে ঘর গরম হইয়া ওঠে ও একটা বিশ্রী গন্ধ ঘরের বাতাস দূষিত করিয়া ফেলে। মোমবাতি বা তেলের প্রদীপ রোগীর গৃহে রাখাই প্রশস্ত।

রোগীর গৃহে বা গৃহের অনতিদূরে যাহাতে কোনরূপ হাস্যকলরব, ঝগড়া, বিবাদ, উচ্চকণ্ঠে চিৎকার, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন ইত্যাদি না হয় সে দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পল্লীগ্রামে প্রায়ই দেখা যায়, রোগীর গৃহে অবিরত লোকজন যাইয়া নানা প্রশ্নে রোগীকে উত্তেজিত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া এবং সেই গৃহেই সকলে মিলিয়া বসিয়া নানারূপ আলোচনা ও জটলা করিয়া রোগীর নিদ্রা, শান্তি ও বিশ্রামের ব্যাঘাত জন্মাইয়া তাহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া থাকেন। ইহা রোগীর পক্ষে মারাত্মক আচরণ। কোন কোন রোগে রোগীর ইচ্ছানুসারে তাঁহার দুই একটী প্রিয়জন বা সমবয়সী তাঁহার নিকট বসিয়া নানারূপ আমোদজনক আলাপ আলোচনা করিলে রোগী আরাম বোধ করেন বটে, কিন্তু সকল রোগের পক্ষে সেরূপ ব্যবস্থা চলে না, রোগীও তাহা ইচ্ছা করেন না। এরূপ সহানুভূতি রোগীর পক্ষে সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায়।

রোগীর গৃহে জটলা।

রোগীর শয্যা যথাসম্ভব পুরু, কোমল ও পরিষ্কৃত হওয়া কর্ত্তব্য।

বিছানার চাদর প্রতিদিনই সাবান কাচা করিয়া শুকাইয়া লইতে পারিলে ভাল হয়। বিছানার চাদর, বালিসের ওয়াড় প্রভৃতি দুই প্রস্থ থাকিলেই এ সব কার্য্যে বিশেষ সুবিধা হয়। বিছানা নরম না হইলে ও রোগীকে দীর্ঘদিন শয্যায় পড়িয়া ভুগিতে হইলে রোগীর শয্যাক্ষত হইবার সম্ভাবনা।

রোগীর শয্যা।

রোগীর শরীর সর্ব্বদা পরিষ্কার বস্ত্রে আবৃত রাখা কর্ত্তব্য। শীতকালে উপযুক্ত পাতলা গরম বস্ত্র তাহার গায়ে রাখাই উচিত। কোন প্রকার ভারি ও অপরিষ্কৃত লেপ, কাঁথা, কম্বল প্রভৃতি কদাচ রোগীর গায়ে দিতে নাই। রোগীর পরিধেয় বস্ত্রাদি দিনে একবার এবং ঘর্ম্মাদি দ্বারা বা অন্য কোন কারণে তাহা ভিজিয়া গেলে তৎক্ষণাৎ তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। সেই সব বস্ত্রাদি না ধুইয়া কোন ক্রমেই আর রোগীকে ব্যবহার করিতে দিতে নাই।

রোগীর ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদি।

রোগীর গৃহে দুর্গন্ধ হইলে ফিনাইল বা অন্য কোনরূপ দুর্গন্ধ নাশক ঔষধ জলে মিশ্রিত করিয়া গৃহে ছড়াইয়া দেওয়া উচিত এবং সকালে সন্ধ্যায় গৃহে ধূপ, ধূনা দেওয়া কর্ত্তব্য।

রোগীর গৃহে দুর্গন্ধ।

রোগীর থুথু ফেলিবার পাত্র তাহার শয্যাপার্শ্বে এমনভাবে রাখিতে হইবে যাহাতে রোগীর থুথু ফেলিতে কোনরূপ অসুবিধা না হয়। কোন রোগীর কোন কারণেই গৃহের দেয়ালে, মেঝেতে বা যেখানে সেখানে থুথু ফেলা উচিত নহে। থুথু ফেলিবার পাত্র দিনে রাত্রিতে বহুবার পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য এবং কোনরূপ দুর্গন্ধ ও বীজাণু নাশক ঔষধ জল সহযোগে সামান্য মাত্রায়

রোগীর থুথু ফেলা।

ঐ পাত্রে দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে দুর্গন্ধ নাশ হয়, মাছি বসিয়া রোগের বীজাণু অন্যত্র লইয়া যাইতে পারে না। রোগী মলমূত্র ত্যাগ করিবামাত্র তাহা বাহির করিয়া ফেলা উচিত এবং সংক্রামক রোগাক্রান্ত রোগী হইলে তাহার মলমূত্র বীজাণু নাশক ঔষধ সহযোগে পুঁতিয়া ফেলাই অবশ্য কর্ত্তব্য। অবহেলা বা আলস্য করিয়া ঐ সব রোগীর মলমূত্র বা বমি বাড়ীর আশেপাশে ফেলিয়া ও সকলের ব্যবহার্য্য জলাশয় প্রভৃতিতে ঐ সব পাত্র ধুইয়া পরিবার ও স্বগ্রামে মহামারী ডাকিয়া আনা কোন ক্রমেই উচিত নহে। থুথু, মলমূত্র, বমি প্রভৃতি ফেলিয়া দিয়া সে সব পাত্র বীজাণু নাশক ঔষধ সহযোগে না ধুইয়া কদাপি রোগীর ঘরে নিতে নাই। এই সব কার্য্য অতিশয় তৎপরতার সহিত করা কর্ত্তব্য। রোগীর হয়তো ঘন ঘন বমি ও মলমূত্রের বেগ আসিতে পারে, যথাসময় পাত্রাদি না পাইলে রোগীর বিশেষ অসুবিধা ঘটিবারই সম্ভাবনা।

রোগীর মল-মূত্র-বমি।

রোগীর বিকারাবস্থায় বা সাংঘাতিক অবস্থায় শুশ্রূষাকারী কদাপি কোন কারণেই রোগীকে একা ফেলিয়া বাহিরে যাইবেন না। এরূপ ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি শুশ্রূষার ভার লইবেন। একই ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে দিবারাত্র শুশ্রূষা করিলে নানারূপ অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা। হয়তো অতিরিক্ত শ্রমে ও উৎকণ্ঠায় তাঁহার অসুখ করিতে পারে এবং সারাদিনের শ্রমে রাত্রিতে তিনি আপনার অজ্ঞাতে ঘুমাইয়া পড়িতে পারেন, তাহা হইলে রোগীর বিশেষ অসুবিধা হইতে পারে। একাধিক ব্যক্তি পর্য্যায়ক্রমে রোগীর সেবায় নিযুক্ত থাকাই কর্ত্তব্য। ঔষধ খাওয়ান ও রোগীর মলমূত্র,

রোগীর সাংঘাতিক অবস্থা।

দেহের উত্তাপ এবং অন্যান্য সমস্ত লক্ষণ ও উপসর্গের তালিকা রক্ষার ভার একজনের হাতে থাকিলেই ভাল হয়। রোগের অবস্থা, বাহ্য-প্রস্রাবের বার ও পরিমাণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখা কর্ত্তব্য এবং পথ্যাদি তাহার হজম হইতেছে কি না, ক্ষুধা, পিপাসা ও অন্য সকল প্রকার গ্লানি কখন কিরূপ হয়, না হয়, এই সমস্ত যথাযথভাবে লিখিয়া রাখা কর্ত্তব্য, যাহাতে চিকিৎসক আসিয়া কাগজখানি দেখিলেই রোগীর সকল খবর পাইতে পারেন। লিখিয়া না রাখিলে হয়তো সকল কথা মনে থাকিবে না এবং রোগীর সকল অবস্থা চিকিৎসকের নিকট গুছাইয়া বলা সম্ভব হইবে না।

রোগীর প্রকৃত বিবরণ রাখা।

কোন ঔষধ খাইয়া যদি রোগীর অবস্থা সহসা খারাপ হইয়া পড়ে বা সেবাকারী ভুলে অন্য কোন ঔষধ রোগীকে খাওয়াইয়া ফেলেন, তবে তৎক্ষণাৎ সেই ঔষধের শিশি সহ চিকিৎসকের নিকট যাইয়া বা লোক পাঠাইয়া সকল কথা তাঁহার গোচর করা কর্ত্তব্য।

সেবাকারীর ভুল।

খাইবার ঔষধ, মালিসের ঔষধ, জল মিশ্রিত করিয়া ঘরে ছড়াইয়া দিবার জন্য দুর্গন্ধ ও বীজাণু নাশক ঔষধ কোন কারণেই একস্থানে রাখা কর্ত্তব্য নহে। ঐরূপ রাখিলে শুশ্রূষাকারী বিশেষ পারদর্শী ও জ্ঞানী হইলেও সহসা তাঁহার ভুল হওয়া বিচিত্র নহে। ভুলক্রমে কোন তীব্র বা বিষাক্ত ঔষধ রোগীকে খাওয়াইলে তাহার এমন সাংঘাতিক অবস্থা আসিতে পারে, যাহার সংশোধন আর কোনক্রমেই সম্ভব হইবে না। এক রোগীকে একাধিক ঔষধ খাওয়াইবার প্রয়োজন হইলে ঔষধের শিশির গায়ে নম্বর দিয়া লওয়া কর্ত্তব্য এবং যখন

ঔষধ রাখা ও রোগীকে খাওয়ান।

যে নম্বরের ঔষধ খাওয়ান হয় তাহা লিখিয়া রাখা উচিত। নিজের ইচ্ছামত ঔষধের মাত্রা ছোট বড় করা বা ঔষধ খাওয়াইবার সময়ের ব্যবধানের পরিবর্ত্তন করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। রোগী যদি আরামে নিদ্রা যাইতে থাকে তবে কোন কারণেই তাহাকে ডাকিয়া ঔষধাদি খাওয়ান বা খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করা কর্ত্তব্য নহে। ঔষধ ও পথ্য অপেক্ষাও রোগীর সুনিদ্রা অধিক প্রয়োজনীয় ও শান্তিদায়ক।

সহসা ঘুম হইতে উঠিয়া, অন্যের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে বা অন্য কোন কারণে অন্যমনস্ক হইয়া, ঔষধের শিশি উত্তমরূপে দেখিয়া না লইয়া তাড়াতাড়ি করিয়া কদাচ রোগীকে ঔষধ খাওয়ান উচিত নহে, ইহাতে ভুল হওয়া সম্ভব।

কোনরূপ দুর্গন্ধ ও বিস্বাদ ঔষধ রোগীর সম্মুখে আনিয়া ঢালিতে নাই। ঠিক সময় মত ঔষধ, মুখ ধোয়ার জল ইত্যাদি সহ রোগীর নিকট আসিতে হয়। ঔষধ না খাইতে চাহিলে সেজন্য রূঢ় কথা বলিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া ভয় দেখাইয়া কদাপি রোগীকে ঔষধ খাওয়াইবার চেষ্টা করিতে নাই। মিষ্ট কথায় তোষামোদ করিয়া ঔষধ খাওয়ানই উচিত।

রোগীর কথার জবাব

রোগীর সকল কথার জবাব বিশদভাবে দিবার বা তাহার বিকার অবস্থায় তাহার কথার প্রত্যুত্তর দিয়া তাহার উত্তেজনা বাড়াইবার কোন প্রয়োজন নাই। অতি সংক্ষেপে দুই একটী মিষ্ট কথায় রোগীর কথার সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য। রোগী যদি সেবাকারীকে কোনরূপ কটু কথা বলে, চড় চাপড় মারে তথাপি সেবাকারীর কোনরূপ বিরক্তি বা উত্তেজনা প্রকাশ করা উচিত নহে। হাসিমুখে সকলই সহিয়া যাইতে হইবে।

রোগী জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িলে, মিষ্ট কথায় সর্ব্বদা তাহাকে সাহস ও সান্ত্বনা দিতে হইবে এবং সে ক্রমশঃ ভাল হইতেছে এই বিশ্বাস রোগীর মনে সুকৌশলে জন্মাইয়া দিতে হইবে।

রোগীর নিকট কখনও বিষাদিত মুখে কাহারও যাওয়া উচিত নহে এবং যে চিকিৎসক চিকিৎসা করেন রোগীর সম্মুখে তাঁহার চিকিৎসায় অনাস্থা জ্ঞাপন ও তাঁহার নিন্দাবাদ করা অনুচিত। তাঁহার চিকিৎসাধীনে থাকিয়া মৃত্যু হইয়াছে, এরূপ কোন রোগীর বিষয় রোগীর সম্মুখে আলাপ করা অথবা কোন কথা লইয়া রোগীর গৃহে কানাকানি করা ঘোরতর অন্যায়। পরিবারে বা গ্রামের কোনরূপ আকস্মিক মৃত্যু বা কঠিন ব্যাধির সংবাদ কদাপি রোগীকে দিতে নাই। রোগী যাহাতে সর্ব্বদা আপনার রোগ সম্বন্ধে চিন্তা না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। প্রয়োজন বোধ করিলে তাহার সঙ্গে ধীরে ধীরে অন্য বিষয়ের আলাপ, আলোচনা বা আমোদজনক হাসি, গল্পাদিপূর্ণ পুস্তকাদিপাঠ প্রভৃতি দ্বারা তাহাকে অন্যমনস্ক রাখিতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

রোগীর জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শুশ্রূষাকারী কোন কারণেই হতাশ হইয়া রোগীর শুশ্রূষার ব্যাঘাত জন্মাইবেন না। ভগবানে বিশ্বাস ও

রোগীর শেষ মুহূর্ত্ত।

নিজের অপরিসীম সহিষ্ণুতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার বলে চক্ষের জলকে চাপিয়া রাখিয়া যিনি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অচল অটল অবিচলিত ভাবে নিষ্ঠার সহিত সেবা করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সেবা করিবার যোগ্য, তিনিই রোগীর বন্ধু। নিতান্ত প্রিয়জন ঐরূপ অবস্থায় পতিত হইলেও কদাপি আপনাকে তিলমাত্র বিচলিত হইতে দিবেন না, হৃদয় পাষাণ করিয়া লইয়া আপন

কর্ত্তব্য সমাপন করিবেন। রোগীর মৃত্যু হইলে কাঁদিবার, দুঃখ করিবার সময়ের অভাব জীবনে হইবে না, কিন্তু রোগীর মুমূর্ষু অবস্থায় বা তাহার সাংঘাতিক অবস্থায় সেবাকারী বিচলিত হইয়া আপন কর্ত্তব্যে অবহেলা করিলে সে অনুতাপ জীবনব্যাপী তুষের আগুনে দগ্ধ করিবে।

রোগীর পথ্য

রোগীর ঔষধ ও সেবা-শুশ্রূষার ন্যায় রোগীর পথ্যও তাহার রোগ নিরাময় হইবার পক্ষে তুল্যভাবে প্রয়োজন। সুনির্ব্বাচিত ও যথাযথ ভাবে প্রস্তুত পথ্যই রোগীর পক্ষে পরম হিতকর। পথ্যাদি নির্ণয় ও তাহা প্রস্তুত বিষয়ে অতিশয় সতর্ক না হইলে রোগ সহজে সারিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। সুনির্ব্বাচিত ও যথানিয়মে প্রস্তুত পথ্য রোগীকে যেমন অতিদ্রুত গতিতে সুস্থ করিয়া তোলে, কুপথ্যও তাহার জীবননাশে তেমনই সহায়তা করে, শত শত ঔষধেও কোন প্রতিকার হয় না!

কুপথ্যের পরিণাম।

বহুকাল ভুগিয়া যে রোগী ক্রমশঃ নিরাময় হইয়া উঠিতেছে, এক দিনের কুপথ্যের ফলে রোগ বিপরীত ও প্রবল আকার ধারণ করিয়া রোগীর জীবন নাশ করিয়াছে, এরূপ বহু ঘটনা শুনা গিয়াছে। মমতা বশে অসময়ে ও অপ্রয়োজনে আহার করাইয়া গুরুতর ব্যাধিগ্রস্ত রোগী অতিদ্রুত মৃত্যুমুখে পতিত

হইয়াছে, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। রোগীর পথ্যাদি প্রস্তুত প্রণালীর সম্যক্ জ্ঞান ও পথ্যাদি দিবার দায়িত্ব বোধ যদি গৃহী ও গৃহিণীর না থাকে, তবে সে পরিবারে রোগীর জীবন যে কোন মুহূর্ত্তে বিপন্ন হইয়া উঠিতে পারে।

গৃহে কাহারও ব্যাধিপীড়া হইলে চিকিৎসক দেখাইয়া ও ঔষধ আনিয়াই আমরা অনেক ক্ষেত্রেই আপন দায়িত্ব সম্পন্ন বোধ করি। রোগী মরিলে চিকিৎসকের ক্রটী ও আপনাদের মন্দভাগ্যের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপাইয়া মনে সান্ত্বনা আনিতে চেষ্টা করি, কিন্তু রোগীর পক্ষে অপরিহার্য্য ও জীবন-মৃত্যুর সহায়ক পথ্যাদির কোন প্রকার ক্রটীর কথা আমরা কল্পনায়ও আনি না। চিকিৎসকের ঔষধই রোগীর জীবনরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট ও চিকিৎসকই রোগীর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী এই ভ্রান্ত ধারণা লইয়া আমরা অনেক ক্ষেত্রেই রোগীর চিকিৎসা সুরু করাই। আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না, যিনি রোগীর সেবা করেন, যিনি ঔষধ-পথ্য খাওয়ান, যিনি রোগীর জন্য পথ্যাদি প্রস্তুত করেন গৃহের সেই সব লোকের দায়িত্ব চিকিৎসক অপেক্ষাও অনেক বেশী।

রোগীর সম্বন্ধে পরিবারের দায়িত্ব।

আমাদের দেশের মায়েরা অনেকেই স্নেহান্ধ। স্নেহান্ধতার জন্য তাঁহারা অনেক সময় রোগীর আব্দার ও ইচ্ছানুযায়ী আহার্য্য দিয়া তাহার জীবন সংশয় করিয়া তোলেন। রোগী একটু কাঁদিলে কাটিলে, আব্দার করিলে, জেদ করিলে বা মিনতি করিলে মায়েরা স্থির থাকিতে পারেন না, গোপনে রোগীর রুচি অনুযায়ী খাদ্য তাহাকে দেন। চিকিৎসক ইহার কিছুই জানিতে

রোগীর প্রতি স্নেহান্ধতা।

পারেন না। কাজেই কোন ঔষধেই সুফল না পাইয়া তিনি অবিরত ঔষধ পরিবর্ত্তন করিতে থাকেন। এইরূপ স্নেহান্ধতার ফলে কোন এক মহিলা তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর কারণ হইয়া আজীবন চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া গিয়াছেন, ইহা আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি। এ অনুতাপ যে কত বড় অনুতাপ, ইহার দহন যে দেহমনকে কি ভাবে শুষ্ক, নীরস করিয়া তোলে, কি ভাবে সুদীর্ঘ পরমায়ু চক্ষের পলকে গ্রাস করিয়া বসে, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে কল্পনাও করিতে পারিবে না।

রোগীর পথ্যাদি সম্বন্ধে দৃঢ়তা।

রোগীর পথ্যাদি সম্বন্ধে অতিশয় দৃঢ়তা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কিছুতেই রোগীর ইচ্ছা বা মর্জ্জি মত কুপথ্য তাহাকে দিয়া তাহার রোগ জটিল ও জীবন সংশয় করিয়া তোলা উচিত নহে। রোগীকে কুপথ্য দেওয়া ও তাহার মুখে বিষপাত্র তুলিয়া দেওয়া যেমন একই কথা, রোগীকে সুনির্ব্বাচিত সুপথ্য দেওয়া ও তাহার জীবনী শক্তি বর্দ্ধনে সহায়তা করাও তেমনই একই কথা। ইহাই চিন্তা করিয়া রোগীর পথ্যাদি বিষয়ে অতিশয় সতর্ক হইলে আমরা অনেক পরিমাণে আমাদের গৃহের রোগ, ভোগ ও অশান্তির হাত এড়াইয়া চলিতে পারি।

পথ্যপ্রস্তুতে আলস্য ও অজ্ঞতা।

কোন্ পথ্য কি ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়, না হয়, তাহার একটা মোটামুটি জ্ঞান প্রত্যেক পরিবারের গৃহী ও গৃহিণীর থাকিলে ভাল হয়। অনেকে যথাযথভাবে পথ্য প্রস্তুত করিতেও জানেন না, অনেকে জানিয়াও আলস্য, অবহেলা করিয়া বা তাড়াতাড়ি করিয়া যথাযথভাবে পথ্য প্রস্তুত করেন না। ইহা গুরুতর অপরাধ। পথ্যের উপর রোগীর রোগ সারা,

না সারা ও জীবন-মরণ অনেকাংশে নির্ভর করে, ইহা সকলেরই ভাবিয়া দেখিয়া, এ বিষয়ে সাবধান হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

পথ্যাদি প্রস্তুতের একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

সাগু—এক তোলা আন্দাজ সাগুদানা পরিষ্কৃত জলে উত্তমরূপে ধুইয়া অন্ততঃ এক ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। তারপর আড়াই পোয়া আন্দাজ জল সহযোগে নরম জ্বালে তুলিয়া দিয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। অন্ততঃ পনর মিনিটকাল ফুটিলেই সাগুদানা জলের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে। তখন নামাইয়া লইয়া বলকা দুধ, মিছরী অথবা লবণ, লেবুর রস সহযোগে ঈষদুষ্ণ অবস্থায় রোগীকে পথ্য দিতে হইবে।

বার্লি—প্রয়োজনমত বার্লি অল্প ঠাণ্ডা জলে বেশ করিয়া মিশাইয়া লইতে হইবে। তৎপর উহা উনানের উপর পরিমাণমত ফুটন্ত জলে ঢালিয়া দিতে হইবে ও অবিরত নাড়িতে হইবে। বার্লি ফুটিয়া বেশ সিদ্ধ হইয়া স্বচ্ছ হইয়া উঠিলে নামাইয়া লইয়া বল্‌কা দুধ, মিছরি বা লবণ, লেবুর রস সহযোগে ঈষদুষ্ণ অবস্থায় রোগীকে পথ্য দিতে হইবে।

এরারুট—ঠিক বার্লির মত প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

শটী—প্রয়োজনমত শটীর পাল লইয়া অল্প পরিমাণ ঠাণ্ডা জলে ভাল করিয়া মিশাইয়া লইয়া প্রয়োজনমত ফুটন্ত জলে উহা ঢালিয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া সিদ্ধ করিয়া লইয়া প্রয়োজনমত দুগ্ধাদি সহযোগে পথ্য দেওয়া চলে।

এই সব পথ্য দুধ বা মিছরি মিশাইয়া বেশীক্ষণ রাখা উচিত নহে এবং একেবারে ঠাণ্ডা পথ্য কদাপি রোগীকে দিতে নাই। সাগু, বার্লি,

শটী প্রভৃতি আলাদা প্রস্তুত করিয়া লইয়া চিকিৎসকের সম্মতি থাকিলে, বন্‌কা দুধ, মিছরি প্রভৃতি মিশাইয়া রোগীকে দেওয়া ভাল। সাগু, বার্লি, এরারুট প্রভৃতি কদাপি দুগ্ধ সহযোগে জ্বাল দিতে নাই, তাহাতে পথ্য গুরুপাক হইবার সম্ভাবনা। প্রতিবার পথ্য দিবার কিছুকাল পূর্ব্বে তাহা প্রস্তুত করাই প্রশস্ত। নিতান্ত তাহা না পারিলে বায়ু চলাচল করিতে পারে এরূপ ঢাক্‌না দিয়া প্রস্তুত পথ্য পরিষ্কৃত স্থানে উত্তমরূপে ঢাকিয়া রাখাই উচিত। চারি পাঁচ ঘণ্টারও অধিক কাল রাখিয়া সেই পথ্য অথবা সন্দেহজনক কোন পথ্য কোন কারণেই রোগীকে দিতে নাই। সত্ত্ব বলক্ষয়কারী, সাংঘাতিক ও জীবন সংশয়কারী ব্যাধিতে প্রতিবার সত্ত্ব প্রস্তুত করিয়া পথ্য দেওয়াই বিশেষ হিতকর।

অনেকে সাগু, বার্লি ইত্যাদি খাইতে চাহেন না বা পারেন না। কাগ্‌জি লেবুর রস সহযোগে ঐ সব পথ্য অনেক সময় খাওয়া সম্ভব হয়। পথ্যাদি কদাপি রোগীর সম্মুখে প্রস্তুত করিতে নাই। পথ্যের আনুষঙ্গিক মুখ ধোয়ার জল, লেবু, লবণ, দুধ, মিছরি প্রভৃতি একবারে লইয়া রোগীর সম্মুখে উপস্থিত হওয়াই উচিত নতুবা রোগীর সম্মুখে পথ্য আনিয়া তারপর লেবু, লবণ, জল, মিছরি প্রভৃতির জন্য ছুটাছুটি করিলে রোগীর অসহিষ্ণু ও বিরক্ত হওয়া অসম্ভব নহে।

ছানার জল—প্রয়োজনমত ফুটন্ত দুগ্ধে লেবুর রস বা কাঁচা পেঁপের আঠা কয়েক ফোঁটা দিলেই দুধ কাটিয়া ছানা উঠিয়া যাইবে। উত্তমরূপে শোধিত ন্যাকড়ায় ছানা ছাঁকিয়া লইয়া নির্ম্মল ছানার জল রোগীকে পথ্য দেওয়া চলে। ইহা বেশ মুখরোচক, বলকারী ও সহজপাচ্য পথ্য।

চিড়ার মণ্ড—সরু পাতলা চিড়া পরিস্কৃত শীতল জলে উত্তমরূপে কয়েকবার ধুইয়া লইয়া জল দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে কিছুকাল পরে উহা গলিয়া যাইবে। তারপর অগ্নির উত্তাপে বেশ করিয়া নাড়িয়া সিদ্ধ করিয়া লইয়া পরিষ্কার শোধিত কাপড়ে ঢালিয়া আঙ্গুল দিয়া নাড়িলে ন্যাকৃড়া ছাঁকা হইয়া যাহা পাত্রে পড়িবে তাহার সহিত লবণ, লেবুর রস, মিছরি প্রভৃতি মিশাইয়া রোগীকে দিতে হইবে। ইহা বেশ রুচিকর ও স্নিগ্ধকর পথ্য।

খইয়ের মণ্ড—টাট্‌কা খৈ গরমজলে কিছুকাল ফেলিয়া রাখিয়া তারপর অগ্নির উত্তাপে চড়াইয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া সিদ্ধ করিয়া লইয়া পরিষ্কার মোটা কাপড়ে ঢালিয়া আঙ্গুল দিয়া নাড়িলে ন্যাক্‌ড়া ছাঁকা হইয়া যাহা পাত্রে পড়িবে তাহার সহিত লবণ, লেবুর রস অথবা বল্‌কা দুধ মিছরি মিশাইয়া পথ্য দিতে হয়।

ভাতের মণ্ড—পুরাতন সরু চাউল উত্তমরূপে ধুইয়া বেশী পরিমাণ জলে সিদ্ধ করিয়া গলাইয়া চট্‌কাইয়া লইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লবণ, লেবুর রস বা দুধ-মিছরি সহযোগে রোগীকে দেওয়া চলে।

ডালের যূষ—এক ছটাক পরিমাণ মসুর বা কাঁচা মুগের ডাল অন্ততঃ এক সের জল সহযোগে জ্বালে চড়াইতে হইবে। গোটা ধনে ও হলুদ বাটা দেওয়া চলে। ডাল উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া জল সিকি পরিমাণ থাকিতে নামাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া সামান্য ঘৃত, তেজপত্র ও জিরার সম্বরা দিয়া লবণ মিশাইয়া রোগীকে দেওয়া যায়।

কিসমিসের যূষ—দুই তোলা কিসমিস পরিষ্কার করিয়া বাছিয়া ধুইয়া এক পোয়া পরিমাণ জলে কয়েক মিনিট ফুটাইয়া নামাইয়া

জলের সঙ্গে কিসমিস চট্‌কাইয়া ছাঁকিয়া সেই জল রোগীকে দেওয়া চলে।

মাংসের যূষ—এক পোয়া পরিমাণ ছাগল, ভেড়া কিম্বা মুরগীর মাংস উত্তমরূপে কুটিয়া চর্ব্বিরহিত করিয়া সের দুই জলে ঘণ্টা দুয়েক ভিজাইয়া রাখিয়া তৎপর মৃদু জ্বালে চড়াইতে হইবে। একখণ্ড ন্যাকড়ায় সামান্য কয়েকটা গোলমরিচ, আস্ত ধনে, কিছু হরিদ্রা, দুই চারি কুচি আদা ও পরিমাণ মত লবণ বাঁধিয়া উহাতে ফেলিয়া দিতে পারা যায়। পাত্রের মুখ ঢাকা অবস্থায় মৃদু জ্বালে সিদ্ধ করিয়া লইয়া ২০।২৫ মিনিট শক্ত জ্বালে ফুটাইয়া জল মরিয়া আধ সের খানেক থাকিতে নামাইয়া লইয়া সিদ্ধ মাংস হইতে হাড় বাছিয়া ফেলিয়া বেশ করিয়া চট্‌কাইয়া পরিষ্কার ফ্ল্যানেলের কাপড়ে ঝোলটুকু ছাঁকিয়া লইতে হইবে। যূষ তৈয়ার করিতে মুরগীর মাংসই প্রশস্ত। ৫।৬ ঘণ্টার বেশী ইহা ভাল থাকে না। কাজেই ৫।৬ ঘণ্টার পর আর উহা রোগীকে না দেওয়াই ভাল। একটী পাত্রে আবশ্যকমত যূষ লইয়া উহা গরম জলের মধ্যে বসাইয়া গরম করিয়া লইয়া রোগীকে দেওয়াই উত্তম।

আটার রুটি—পরিমাণ মত আটা জল দিয়া বেশ করিয়া মাখিয়া কিছুকাল রাখিয়া দিয়া তারপর উত্তমরূপে ঠাসিয়া রুটি তৈয়ারি করিয়া ফুলা ফুলা করিয়া সেঁকিয়া ফুটন্ত গরম জলে ধুইয়া দেওয়া চলে।

সুজির রুটি—পরিমাণ মত সুজি জল দিয়া মাখিয়া কিছুকাল রাখিয়া একটী ডেলা পাকাইয়া ফুটন্ত গরম জলে দশ পনর মিনিট কাল সিদ্ধ করিয়া লইয়া নামাইয়া বেশ করিয়া ঠাসিয়া রুটি তৈয়ারি করিয়া গরম জলে ধুইয়া লইতে হইবে।

চূণের জল—আধ তোলাখানেক পান খাবার টাট্‌কা চূণ বড় একটী বোতলে দিয়া বোতলটী জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া অনেকক্ষণ ঘোলাইয়া বোতলটী এক স্থানে বসাইয়া রাখিতে হইবে। পরদিন বোতলের উপরের জল আস্তে আস্তে ঢালিয়া পৃথক একটী পরিষ্কার বোতলে ছিপি আঁটিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। ইহা অতিশয় প্রয়োজনীয় ঔষধ। প্রত্যেক গৃহে ইহা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত।

সাধারণ ব্যাধি-পীড়ায় আহার-বিহারে সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক থাকিলে অল্প সময়েই তাহা সারিয়া যায়। ঔষধাদির প্রয়োজন বড় একটা হয় না। কিন্তু সত্ত বলক্ষয়কারী, সাংঘাতিক, প্রাণঘাতী রোগে, বা সাধারণ রোগেও কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ সাধ্যায়ত্ত সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, অন্যথায় গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হওয়া এতটুকুও বিচিত্র নহে। চিকিৎসক যে পথ্যের ব্যবস্থা দেন, তাহা যথাযথভাবে প্রস্তুত করিয়া যথাসময়ে রোগীকে দিলে সেই পথ্যই রোগ নিরাময় হইতে সহায়তা করে। পথ্যাদি বিষয়ে অজ্ঞতা ও অবহেলা থাকিলে শত চিকিৎসকও সহজে রোগ নিরাময় করিতে পারিবেন না।

সংক্রামক রোগ

গ্রামে বা পরিবারেব মধ্যে সহসা কোন সংক্রামক রোগ দেখা দিলে ভীত ও অস্থির না হইয়া উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করিলে ব্যাধির প্রকোপ বেশী বিস্তার লাভ করিতে পারে না। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই

এই সব বিষয়ে অতিরিক্ত উদাসীন। এই উদাসীনতা গ্রাম্য লোকের মধ্যেই বেশী লক্ষিত হয় এবং ইহারই ফলে স্থানে স্থানে মহামারীর বেদীমূলে তাহাদিগকে বাৎসরিক বলি যোগান দিতে হয়। ব্যাধির সঙ্গেও মানুষের মত লড়াই করা চলে এবং তাহাকে অল্প সময়ে দূরীভূত করিয়া দেওয়া যায়। সংক্রামক ব্যাধিপীড়ার সময় নির্ভিক প্রফুল্লচিত্তে, ভগবানের নাম হৃদয়ে লইয়া উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করাই মানুষের কাজ এবং সেই সাবধানতা গ্রহণের উপায় ও প্রক্রিয়া সকলেরই জানা থাকা কর্ত্তব্য।

কলেরা—ইহা অতি মারাত্মক সদ্য বলক্ষয়কারী জীবনী শক্তি-নাশক সংক্রামক ব্যাধি। সচরাচর ইহা আক্রান্ত ব্যক্তির গৃহ বা গ্রাম হইতে অন্য অসতর্ক ব্যক্তির দ্বারা স্থান হইতে স্থানান্তরে বিস্তৃত হয়। রোগীর ভেদবমি প্রভৃতি অসতর্কভাবে যেখানে সেখানে ফেলিলে ইহা মাছি দ্বারা চারিদিকে নীত হয়। রোগীর ভেদ-বমি-দুষ্ট বস্ত্র বা পাত্রাদি গৃহের অসতর্ক ও অজ্ঞ কোন লোক সাধারণের ব্যবহৃত পুকুর, নদী প্রভৃতিতে ধুইয়া চারিদিকে মহামারী জাগিয়া উঠিতে সহায়তা করে।

বিশেষজ্ঞগণের মতে, এক প্রকার বীজাণু খাদ্য বা পানীয় আশ্রয় করিয়া উদরস্থ হইলে এই রোগ হইবার সম্ভাবনা।

ইহা অতি সাংঘাতিক ব্যাধি। গ্রামে বা গ্রামের আশপাশে এই ব্যাধি দেখা দিবামাত্র চারিদিকে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। পরিবারে, গ্রামে বা গ্রামের আশেপাশে এই রোগ দেখা দিলে অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন করা ও ভগবানের নাম লইয়া মন প্রফুল্ল রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। বাসি, পচা, মাছিবসা, বাজার হইতে আনীত বা সন্দেহজনক কোন খাদ্য

গ্রহণ না করাই কর্ত্তব্য। সত্ত রান্না করা, লঘুপাক আহার্য্য অতি উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত আহার করাই বিধেয়। পানীয় জল, দুধ প্রভৃতি উত্তমরূপে ফুটাইয়া লইয়া ব্যবহার করাই সমীচীন। খাদ্য ও পানীয় সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখা উচিত। কোনরূপেই যেন আহার্য্যে বা পানীয়ে মাছি বসিতে না পারে, অথচ ঢাকনির ভিতর দিয়া বায়ু চলাচল করিতে পারে। কূপের জলে ক্লোরোজেন বা অন্য কোন বীজাণু নাশক ঔষধ পরিমাণ মত দিয়া শোধিত করিয়া লইয়া সেই জল দ্বারা স্নান, হাত, মুখ ধোয়া, বাসন মাজা প্রভৃতি সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। গ্রামে কলেরা হইলে কদাপি কোন কারণেই সাধারণের ব্যবহার্য্য জলাশয় ব্যবহার করা উচিত নহে।

রোগীর ভেদবমি বীজাণু নাশক ঔষধ মিশাইয়া, যেখানে তাহা মিলে না, সেখানে কেবল ফিনাইল বা চূণগোলা জল মিশাইয়া পুঁতিয়া ফেলিলে এবং তাহার ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদি দগ্ধ করিয়া ফেলিলে রোগ প্রসার লাভ করিতে পারে না, আমরা অনেকে ইহা জানিয়াও তাহা করি না এবং নিজেদের সমূহ সর্ব্বনাশ নিজেরা ডাকিয়া আনিয়া হাহাকার করিয়া মরি।

কোন কারণেই এ সময়ে ভীত, বিমর্ষ, অস্থির চিত্ত হইয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে। কোনরূপ নেশা করা, অধিক রাত্রি জাগা, রোগাক্রমণের আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া কালাতিপাত করা অতিশয় মারাত্মক। সকাল-সন্ধ্যায় গৃহের চতুর্দ্দিকে ও প্রতিঘরে ধূপ, ধূনা, গন্ধক প্রভৃতির ধূম দেওয়া কর্ত্তব্য। গৃহের আশপাশের সমস্ত ময়লা আবর্জ্জনাদি পরিষ্কার করিয়া দূরে ফেলিয়া

দেওয়া এবং অন্ধকার স্যাঁৎস্যাঁতে স্থানে ফিনাইল অথবা ফিনাইলের অভাবে তাজা গোবর গুলিয়া ছিটাইয়া দেওয়া হিতকর।

গৃহের কাহারও সহসা তরল ভেদ ও বমি আরম্ভ হইলে বা চারিদিকে কলেরার সময় কেবল দমকা ভেদ বা বমি আরম্ভ হইলেই অবিলম্বে সাধ্যায়ত্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের জন্য দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোক পাঠাইয়া এক প্যান বা গামলা পরিমাণ পরিষ্কৃত জল ঢাকা দিয়া উত্তমরূপে ফুটাইয়া ঢাকা অবস্থায়ই পাত্রসহ নামাইয়া রাখিতে হইবে। এই জল চিকিৎসক আসিবামাত্রই প্রয়োজন হইতে পারে। পূর্ব্ব হইতেই ইহা ঠিক করিয়া না রাখিলে চিকিৎসার বিলম্ব ও রোগীর জীবন সংশয় হওয়া অসম্ভব নহে।

রোগীকে স্থিরভাবে শায়িত অবস্থায় রাখিতে হইবে। রোগীর বিছানার অধোভাগে একখানা অয়েল ক্লথ পাতিয়া দিতে হইবে। রোগীর হাত-পা খিল ধরিয়া আসিলে তাহার হাত ও পায়ের কাছে গরম জলের বোতল রাখা ও ফ্ল্যানেল বা ছেঁড়া কম্বল গরম করিয়া সেক দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। রোগীকে বরফ চুষিতে দিতে হইবে। বরফের অভাবে পরিষ্কার বিশুদ্ধ শীতল জল, ডাবের জল প্রভৃতি নিরাপত্তিতে রোগীকে দেওয়া উচিত। রোগী যখন জল চাহিবে, তখনই অল্প পরিমাণে জল তাহাকে দিতে হইবে। রোগীর দেহের জলীয় অংশ ভেদবমির সহিত অবিরত নির্গত হইয়া দারুণ পিপাসার উদ্রেক হয়। এই নিদারুণ বুক ফাটা মরুতৃষ্ণার বিষয় লেখকের কিঞ্চিৎ ধারণা আছে। কলেরা রোগীর যে কি তৃষ্ণা, আর সেই প্রাণঘাতী তৃষ্ণার জ্বালায় রোগী তাহার লুপ্ত প্রায় জীবনীশক্তির সমস্ত ব্যাকুলতা লইয়া কোটরগত, পাণ্ডুর, নিষ্প্রভ দুই চক্ষু

শুশ্রূষাকারীর প্রতি পাতিয়া এক ফোঁটা জলের জন্য কি করুণ মিনতি জানায়। জ্ঞানের শেষ রেখাটী থাকা পর্য্যন্ত ভগ্ন, ক্ষীণ আৰ্ত্তকণ্ঠে কি সীমাহীন কাতরতার সঙ্গে এক ফোঁটা জল যাচ্ঞা করে, তাহা না দেখিলে অনুভব করা অসম্ভব।

শুনিয়াছি, বহু পূর্ব্বে কলেরারোগীকে জল দেওয়া হইত না। জল দিলে ঘন ঘন বমি হইবে এই আশঙ্কায় এখনও বহু চিকিৎসকহীন স্থানে জল দেওয়া হয় না। ইহা যে কত দূর নির্ম্মম অজ্ঞতা তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এরূপ শুনা গিয়াছে যে, রোগী তৃষ্ণার তাড়নায় অস্থির হইয়া গৃহকোণস্থ জল পাত্রের নিকট অবসন্ন দেহ লইয়া ছুটিয়া গিয়াই পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে। বরফ বা ডাব সর্ব্বসময় সর্ব্বস্থানে হয়তো সহজ লভ্য নহে, কিন্তু দয়াময়ের অযাচিত দান জলের অভাব কোন স্থানেই বড় একটা নাই। জল ফুটাইয়া বিশুদ্ধ করিয়া লইতেও বিশেষ কোন ব্যয় ও শ্রমের প্রয়োজন হয় না। কলেরারোগীকে জল দিতে কদাচ কার্পণ্য বা বিবেচনা করা উচিত নহে। জল খাইলে তাহার উপকারই হইবে।

রোগীর গৃহে যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু চলাচল করিতে পারে, সেজন্য সমস্ত দরজা-জানালা খোলা রাখাই উত্তম। রোগীর ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ও ঔষধপত্রাদি ভিন্ন অপর কোন দ্রব্য রোগীর ঘরে রাখিতে নাই।

রোগীর যিনি সেবা করিবেন, তিনি অতিশয় সাবধানে থাকিবেন। চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারী ভিন্ন পরিবারের অপর লোক পারতপক্ষে রোগীর গৃহে যাইবেন না। গেলেও কাপড় চোপড় ছাড়িয়া, হাত, পা, মুখ উত্তমরূপে না ধুইয়া, অন্যের সঙ্গে মেলামেশা করা বা অন্য ঘরে যাওয়া, বিশেষতঃ রান্না ঘরে যাওয়া অতিশয় মারাত্মক। কার্ব্বলিক লোশন মিশ্রিত

জলে উত্তমরূপে হাত-পা না শোধিত করিয়া লইয়া সেবাকারী কদাপি কোন কিছু আহার করিবেন না। পরিবারের অপর কাহারও সঙ্গে একস্থানে না বসিয়া, সেবাকারীর আহার পৃথক স্থানে হওয়াই ভাল। সেবাকারী গৃহের অপর কাহারও সঙ্গে বেশী মেলামেশা করিবেন না। কার্ব্বলিক এসিড মিশ্রিত জলে পুরাতন কাপড় ভিজাইয়া রোগীর গৃহের জানালা-দরজা ঢাকিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পরিবারের কোন শিশুকে কদাপি সংক্রামক রোগীর গৃহে প্রবেশ করিতে দিতে নাই। শুশ্রূষাকারী কদাপি অনশনে থাকিবেন না। রোগীর হিমাঙ্গ অবস্থা দেখিয়া নিরাশ, ভীত বা বিমর্ষ হইবেন না। অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ভগবানের নাম হৃদয়ে লইয়া রোগীর জীবন সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়া প্রফুল্ল চিত্তে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার সহিত রোগীর সেবায় নিযুক্ত থাকিবেন। রোগীর ভেদবমির বার ও পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন। প্রস্রাব হয় কি না এবং হইলে কি পরিমাণ হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

রোগী ক্রমশঃ ভাল হইয়া উঠিতে থাকিলেও চিকিৎসকের উপদেশ ছাড়া কদাপি রোগীকে কোন পথ্য দিবেন না। রোগীর শত অনুনয়-বিনয়, কাকুতি-মিনতি কান্নাকাটিতেও কোন কারণেই চিকিৎসকের উপদেশ ছাড়া রোগীকে কোন পথ্যই দিবেন না। চিকিৎসক যখন যে পথ্য দিতে বলেন, সদ্য প্রস্তুত করিয়া তাহা পরিমাণ মত রোগীকে দিবেন। রোগী সম্পূর্ণ নিরাময় না হইয়া ওঠা পর্য্যন্ত তাহার সেবা, যত্ন বা পথ্যাদিতে তিলমাত্র অবহেলা প্রদর্শন করিবেন না। অনেক দূর ভাল হইয়াও সেবা ও পথ্যাদির অবহেলায় রোগী প্রাণ হারাইয়াছে এরূপ ঘটনা শুনা গিয়াছে।

রোগী আরোগ্য লাভ করিবার পর তাহার গৃহ অত্যুষ্ণ গরম জল দ্বারা ধুইয়া ফেলা উচিত। পাকা ঘর হইলে ফুটন্ত গরম জল দ্বারা মেঝে ধুইয়া ফেলিয়া দেয়ালে চুণকাম করাইয়া লওয়াই শ্রেয়ঃ। গৃহের মধ্যে একটা পাত্রে কয়লার আগুন জ্বালাইয়া বেশী পরিমাণ ধূপ, ধূনা, গন্ধক দিয়া গৃহের সমস্ত দরজা-জানালা রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া গৃহের বায়ু শোধিত করিয়া লওয়া চলে।

বসন্ত, হাম, ডিপ্থিরিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগেও কলেরারোগীর সেবা, শুশ্রূষা, গৃহ, পরিধেয় প্রভৃতির অনুরূপ ব্যবস্থা নিঃসংশয়ে করা চলে।

বসন্ত—ইহা অতিশয় ক্লেশদায়ক, প্রাণঘাতী, সাংঘাতিক সংক্রামক রোগ। ইহার সংক্রমণ শক্তি অতিশয় প্রবল। গ্রামে, পরিবারে বা আশেপাশে এই ব্যাধি দেখা দিলে অথবা বসন্ত দেখা না দিলেও শীতান্তে পরিবারের আবালবৃদ্ধবণিতা সকলের টীকা লওয়া কর্ত্তব্য। প্রতি বৎসরই টীকা লইতে কাহারও কদাপি আলস্য বা অবহেলা করা উচিত নহে।

বসন্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সেবাশুশ্রূষা করিলে, বসন্তের পুঁজ বা মরামাস কোনক্রমে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইতে পারিলে রোগ অপরে সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা। কলেরা বসন্তের আক্রমণে একই পরিবারে বহু লোক একে একে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, এরূপ ঘটনা দেখা গিয়াছে। অতিশয় সাবধানতার সহিত এই সব রোগীর শুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য। টীকা না লইয়া কদাচ বসন্ত রোগীর সেবায় নিযুক্ত হইতে নাই।

মাছি দ্বারা এই রোগ চারিদিকে বিস্তারিত ও সংক্রামিত হইবার সহায়তা হয়। বসন্তের পুঁজ মুখে করিয়া মাছি গৃহের আহার্য্য, পানীয়

বাজারের খাবার প্রভৃতিতে বসে এবং ঐ সব দ্রব্য উদরস্থ করিয়া অন্যে এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। রোগীর গৃহে যাহাতে মাছির উপদ্রব হইতে না পারে এবং রোগীর মলমূত্র, থুথু, পরিধেয় বস্ত্র ও শয্যা প্রভৃতিতে যাহাতে মাছি না বসিতে পারে সেই ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। রোগীকে পরিষ্কার উঁচু মশারির নীচে রাখিলে, গৃহ সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া বীজাণু নাশক ঔষধ বা ফিনাইল প্রভৃতি ব্যবহার করিলে এবং ধূপ, ধূনা, নিয়মিত রোগীর গৃহে দিলে, মাছির উপদ্রব কম থাকে। রোগীর ব্যবহার্য্য বস্ত্র, বিছানাপত্র বিনা দ্বিধায় দগ্ধ করিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য। ঐ সব দ্রব্যের মায়ায় কদাচ উহা রাখিতে নাই, তাহাতে অপরের জীবন সংশয় হওয়া বিচিত্র নহে।

রোগের বীজ দেহে প্রবিষ্ট হইবার কয়েকদিন পরে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রবল জ্বর হয়। জ্বরের সঙ্গে শিরঃপীড়া, কোমর ও পৃষ্ঠে অসহ্য বেদনা অনুভূত হইতে থাকে। দেহের প্রতি গাঁটে বেদনা, বিবমিষা ও মোহও হইতে দেখা যায়। জ্বর আরম্ভ হইবার তিন চারি দিন পরে মুখে লাল লাল গুটী দেখা দেয় এবং ক্রমশঃ তাহা সমস্ত দেহে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। গুটী বাহির হইবার আট নয় দিন পর হইতে উহা পাকিতে আরম্ভ করে। পাকিবার সময় পুনরায় জ্বর আরম্ভ হয়। বসন্ত ঝাড়িয়া উঠিয়া পাকিয়া গেলে অনেকটা নিরাপদ। বসন্ত না পাকিয়া যদি বসিয়া যায় ও সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া ওঠে, তবে রোগীর অবস্থা সাংঘাতিক বুঝিতে হইবে।

দেশীয় মতে চিকিৎসা করাইয়া রোগী নিরাময় হইতে আমি নিজে দেখিয়াছি। অনেক স্থানেই দেশীয় মতে বসন্তের ভাল চিকিৎসক আছেন। বিশ্বাস থাকিলে ঐ চিকিৎসা করান মন্দ নহে।

শুশ্রূষাকারী অতিশয় সাবধানে ও সাহস অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বদা রোগীর সেবা যত্ন করিবেন। পরিবারের অপর কোন লোক কদাচ কোন কারণেই রোগীর ঘরে আসিবেন না। রোগীর বিছানা অতিশয় নরম হওয়া উচিত। নিমের পল্লব দ্বারা রোগীকে হাওয়া করা ভাল।

বসন্ত রোগ দেখা দিলে বাজারের খাবার, দুধ, মাছ প্রভৃতি যথাসাধ্য বর্জ্জন করিয়া চলা একান্ত কর্ত্তব্য। উচ্ছে পাতার রস ইহার প্রতিশেধক। পরিবারের সকলে ও রোগীর সেবাকারী নিশ্চয়ই ইহা খাইবেন।

যক্ষ্মা—ইহা অতি মর্ম্মান্তিক জীবনশক্তিক্ষয়কারী, দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধি। বর্ত্তমানে এই রোগের প্রকোপ আমাদের দেশে অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। সহরে এই রোগীর সংখ্যা অগণিত এবং এই রোগহীন কয়টী গ্রাম বাংলাদেশে আছে তাহা বলা কঠিন। সারা বঙ্গব্যাপী নিদারুণ স্বাস্থ্যহীনতা, খাদ্যাভাব, যৌন অত্যাচার, সহরে ধূমমলিন আলোবাতাসস্পর্শলেশহীন স্যাঁৎস্যাঁতে গৃহে বাস, অনিয়মিত জীবনযাপন ও নানাপ্রকার অজ্ঞতাই ইহার দ্রুত প্রসারের সহায়ক বলিয়া মনে হয়। মেয়েদের মধ্যেই এই রোগের প্রকোপ বেশী দেখা যায়। তাঁহাদিগকে অন্ধকার ও পর্য্যাপ্ত আলোবাতাসহীন গৃহকোণে অবগুণ্ঠনের নীচে দিবানিশি থাকিতে হয়। তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও জীবন সম্বন্ধে আমরা উদাসীন হওয়ায় অপরিমিত আহার্য্যদ্বারা তাঁহাদিগকে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হয় এবং অশক্ত দুর্ব্বলদেহে আমাদের অসংযমের ফলে অনুপযুক্ত, অক্ষম, অবস্থায়ও তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণ করিতে হয় বলিয়াই বোধ করি তাঁহারাই এই রোগের বেদীমূলে বাৎসরিক বলির বেশীর ভাগ যোগান দিয়া থাকেন।

সহরে সর্ব্বসাধারণের হোটেল, চায়ের দোকান, খাবারের দোকানের সাহায্যেও এই রোগ অতি অনায়াসে একজন হইতে অন্য জনে বিস্তার লাভ করিবার সুবিধা পায়।

এই ব্যাধি একবার আক্রমণ করিলে গরিব বা মধ্যবিত্তের জীবনের আশা প্রায়ই থাকে না। অবস্থাপন্ন কোন কোন ব্যক্তি বহু অর্থব্যয়ে রোগমুক্ত হইতে পারিয়াছেন এরূপ শুনা যায়। এই রোগীর সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা অতি ব্যয়সাধ্য। এ ব্যাধি দীর্ঘদিনব্যাপী মানসিক ও শারীরিক উভয়বিধ যন্ত্রণাদায়ক। দীর্ঘদিন রোগে ভুগিয়া রোগীর জীবনশক্তি তিলে তিলে নিঃশেষ হইয়া আসিতে থাকে, আর রোগীর বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবলতর হইতে থাকে। অথচ জীবনরক্ষা করিবার কোন উপায়ই থাকে না। ইহা বড়ই করুণ, বড়ই মর্ম্মভেদী।

বিবাহ করিবার পূর্ব্বে কাহারও এই রোগ হইয়া সারিয়া গেলে বা কমিয়া থাকিলে তাহার আর কিছুতেই বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে।

এ রোগে নির্ম্মল বায়ু সেবন ও পুষ্টিকর, সহজপাচ্য, বলকারী আহার্য্যাদি গ্রহণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতে পারিলেই ভাল হয়।

রোগীর গায়ে কোনরূপ ঠাণ্ডা লাগিতে না পারে গৃহের এইরূপ স্থানে রোগীর শয্যা রচনা করিয়া উপযুক্ত বস্ত্রাদি দ্বারা তাহার দেহ আবৃত করিয়া রাখা উচিত। নির্ম্মল বায়ু রোগীর পক্ষে সর্ব্বদা প্রয়োজন। কাজেই গৃহের দরজা জানালা খুলিয়া রাখাই কর্ত্তব্য। রোগীর গৃহে পরিবারের অপর কাহার না থাকাই ভাল। রোগীর হাঁচি, থুথু, কাশির সঙ্গে এই রোগের বীজাণু ছড়াইয়া পড়ে। রোগীর মুখের কাছে বসিয়া

কদাপি তাহার সঙ্গে গল্প করা কর্ত্তব্য নহে। রোগীর থুথু ফেলিবার পাত্রে বীজাণুনাশক ঔষধ দিয়া রাখিতে হইবে এবং রোগীর থুথু মাটির নীচে পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে। রোগী কদাচ যেখানে সেখানে থুথু ফেলিবেন না, ইহা অতিশয় মারাত্মক। রোগীর ব্যবহার্য্য কোন দ্রব্য রোগীর গৃহ ভিন্ন অন্য গৃহে কদাপি নিতে নাই, বা তাহা অপর কাহারও ব্যবহার করিতে নাই। রোগী শয্যায় শুইয়া থাকিতে কষ্টবোধ করিলে ইজি চেয়ারে নরম গদি পাতিয়া তাহাতে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় তাহাকে রাখিলে অনেকটা আরাম বোধ করিবে।

রোগী বিবাহিত হইলে তাঁহাকে স্ত্রী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে হইবে। রোগীর শত অনুনয়েও সহজপাচ্য, পুষ্টিকর, পথ্যাদি ভিন্ন উত্তেজক কোন প্রকার আহার্য্য তাহাকে দিতে নাই। সকল প্রকার সংযম, নির্ম্মলবায়ু সেবন, পুষ্টিকর, সহজপাচ্য আহার্য্যগ্রহণ রোগ নিরাময় হইবার সহায়ক।

অসংযম, দূষিত বায়ু সেবন, ইন্দ্রিয় চর্চ্চা, উত্তেজক আহারগ্রহণ, রাত্রি জাগরণ, জনাকীর্ণ স্থানে বাস, শারীরিক শ্রম, উপযুক্ত পথ্যের অভাব, উচ্চৈঃস্বরে বচসা করা অতিশয় অহিতকর।

ডিপ্‌থিরিয়া—ইহা অতি সাংঘাতিক প্রাণক্ষয়কারী সংক্রামক রোগ। ইহাতে রোগীর শ্বাস রোধ হইয়া মৃত্যু হয়। শিশুদের মধ্যেই এই রোগের প্রাবল্য দেখা যায়। পরিবারের কেহ এই রোগে আক্রান্ত হইলে, গৃহের বালক বালিকাদিগকে তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরে প্রেরণ করাই অতি উত্তম ব্যবস্থা। রোগাক্রমণের দুই এক দিন পূর্ব্বেই রোগী অতিশয় দুর্ব্বল ও অবসন্ন বোধ করে। ক্রমশঃ গলার ব্যথা হয় ও ঢোক গিলিতে

অতিশয় কষ্টবোধ হয়। অপর কোন সুস্থ ব্যক্তি রোগীর নিশ্বাস গ্রহণ, মুখচুম্বন ইত্যাদি করিলে এই রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস অথবা উদ্গত শ্লেষ্মাদি যাহাতে কোন প্রকারে সেবাকারীর মুখে না লাগিতে পারে সে বিষয়ে অতিশয় সতর্ক হইয়া সেবা করিতে হইবে।

অতিশয় সাবধানে রোগীকে পথ্য দিতে হইবে। একবারে বেশী পথ্য রোগীকে দিলে সহসা তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। অল্প অল্প করিয়া ধীরে ধীরে রোগীকে খাইতে দিতে হইবে। পথ্য খাইবার সময় আস্তে আস্তে রোগীর গলা ও বুক মাজিয়া দেওয়া ভাল। দুগ্ধপোষ্য শিশুর এরোগ হইলে মাতৃস্তন পান করিতে দিতে নাই, তাহাতে মায়ের বিপদ ঘটিতে পারে।

রোগীর ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্যাদি, রোগীর থুথু, বমন প্রভৃতির ব্যবস্থা অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় করিতে হইবে।

হাম—ইহাও একটী সংক্রামক রোগ ও ইহা শিশুদেরই প্রায় হইয়া থাকে। হামের সঙ্গে প্রায়ই সর্দ্দিকাশি ও কখন কখনও বা উদরাময় থাকে। হাম ঝাড়িয়া উঠিয়া গেলেই জ্বর ত্যাগ হইতে থাকে। জ্বর ত্যাগ না হইলেও ভয়ের কোন কারণ নাই। হাম বসিয়া গেলে গুরুতর হইবার সম্ভাবনা। হামরোগীর গায়ে যাহাতে কিছুতেই ঠাণ্ডা না লাগিতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ঠাণ্ডা লাগিলে সর্দ্দি, কাশি প্রবল আকার ধারণ করে ও নিমোনিয়া, প্লুরিসি প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি আসিয়া দেখা দেওয়াও বিচিত্র নহে। হামের মৃদু আক্রমণ হইলেও কদাপি তাহাকে অবহেলা করিতে নাই। রোগীকে অতিশয়

সাবধানে রাখিতে হয়। অবহেলায় গুরুতর উদরাময় ও শ্লেষ্মার দোষ ঘটিয়া রোগীর জীবননাশ হইতেও দেখা গিয়াছে। যে শিশুকে এই রোগ আক্রমণ করে তাহার সঙ্গে গৃহের অন্য শিশুদিগকে কিছুতেই মিশিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। তাহার ব্যবহার্য্য চামচ, বাটী, জামা, বিছানাও কদাপি অন্য শিশুকে ব্যবহার করাইতে নাই। অনেক সময় আক্রান্ত শিশুর সহিত অন্যান্য শিশুদের মিশিতে না দিলে তাহার জনক-জননী অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ইহা ঘোরতর অন্যায় ও স্নেহান্ধতার পরিণাম। কোন প্রকার সংক্রামক রোগাক্রান্ত শিশুর জনক-জননীর কিছুতেই আপনাদের শিশুকে পারিবারের বা প্রতিবেশীর শিশুদের সহিত মিশিতে দিয়া রোগ ব্যাপক আকার ধারণ কারিতে সহায়তা করা কর্ত্তব্য নহে। শিশু পিতামাতার যতই স্নেহের পাত্র হোক্ ব্যাধি চিরকালই শত্রু, ইহা মনে রাখিয়া তদনুরূপ ব্যবস্থা করাই উচিত।

হুপিংকাশ—ইহাও বড়ই কষ্টদায়ক ও শিশুদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধি। ইহার ভোগকাল তিন মাসকাল হইয়া থাকে। রুগ্ন ও দুর্ব্বল শিশুকে এই রোগে মারা যাইতেও দেখা গিয়াছে। গ্রামে বা পরিবারে এই কাশি দেখা দিলে সুস্থ শিশুদিগকে কদাপি সেদিকে যাইতে দিতে নাই। আক্রান্ত শিশুকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিশুরা কাশিতে কাশিতে প্রায়ই বমি করে। এজন্য এক সঙ্গে বেশী পথ্য না দিয়া বারে বারে অল্প পরিমাণে পথ্য দেওয়াই ভাল। আক্রান্ত শিশুর অঙ্গে ঢোলা জামা ব্যবহার করা উচিত।

সংক্রামক, স্পর্শাক্রমক, প্রাণঘাতী, সাংঘাতিক কোন ব্যাধির চিকিৎসার ভার কদাপি নিজের হাতে বা অজ্ঞ চিকিৎসকের হাতে রাখিতে

নাই। রোগের সন্দেহ হওয়া মাত্র সাধ্যায়ত্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের হাতে তাহার চিকিৎসার ভার দিয়া ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে রোগীর সেবা ও পথ্যাদির নিয়ম যথাযথভাবে পালন করিলে রোগী সহজেই নিরাময় হইয়া উঠিবে। পরিবারের মধ্যে বা গ্রামে কোনরূপ সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে সর্ব্বপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করাই রোগাক্রান্ত না হইবার শ্রেষ্ঠ উপায়। রোগাক্রান্ত হইয়া চিকিৎসা, শুশ্রূষা, পথ্যাদির পেছনে প্রাণপাত ও অর্থব্যয় করা অপেক্ষা সময় থাকিতে একটু শ্রম স্বীকার করিয়া সাবধান হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। শত্রু একবার দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিলে সে পরাজিত হইতে হইতেও দুর্গের অনেক অংশ ধ্বংস করিয়া দিয়া যায়। তাহাকে দুর করিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য ও অসাধ্য হইয়া ওঠে। শত্রু যাহাতে দুর্গে প্রবেশ করিতে না পারে তাহা করাই যেমন সাবধানী ও বুদ্ধিমান সৈনিকের কাজ। এ সংসারসংগ্রামেও তেমনই বুদ্ধি, সতর্কতা ও সাবধানতার সহিত আপন দেহ ও গৃহ দুর্গকে যিনি সর্ব্বদা সুরক্ষিত রাখিতে পারেন, তাঁহার দুর্গে কোন প্রকার শত্রুই কোন দিন প্রবেশ করিতে পারে না। আক্রমণ করিতে আসিয়াও ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যায়। আর যাঁহারা সময় থাকিতে সাবধান হন না, তাঁহাদের অরক্ষিত দেহে ও গৃহদুর্গে প্রতি নিয়ত কত শত্রু প্রবেশ করিয়া দেহ ও গৃহকে অশক্ত অকর্ম্মণ্য করিয়া দিয়া চলিয়া যায়।

দৈব দুর্ঘটনা

পরিবারের মধ্যে অনেক সময় অনেক দৈব দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে এবং নিকটে চিকিৎসক না থাকিলে হয়তো কাহারও প্রাণ যাওয়াও বিচিত্র নহে। দৈব দুর্ঘটনা ও আকস্মিক বিপদপাতে অধৈর্য্য ও অসহিষ্ণু না হইয়া বিজ্ঞ চিকিৎসকের জন্য লোক পাঠাইয়া এমন অনেক প্রক্রিয়া করা চলে যাহাতে চিকিৎসক আসা পর্য্যন্ত রোগীকে রক্ষা করা যায়। সাধারণ বিপদ আপদ অনেক সময় অতি সাধারণ প্রক্রিয়াতেই দূর হইয়া যায়, কিন্তু সেই সাধারণ প্রক্রিয়াও জানা না থাকিলে সাধারণ বিপদ আপদও সময়ে সময়ে প্রাণঘাতী হইয়া দাঁড়ান বিচিত্র নহে। সংসারে প্রতিপদে পরমুখাপেক্ষীকে জীবনব্যাপী অনন্ত দুঃখলাঞ্ছনাভাগী হইতে হয়। জীবনে সকল প্রকার দুঃখ, দুর্দ্দশা, বিপদ, আপদ, দৈব দুর্ঘটনার সঙ্গে মানুষের মত লড়িবার শিক্ষা অর্জ্জন করাই মানুষের কাজ। সে সম্বন্ধে প্রতিপরিবারের প্রত্যেক গৃহী গৃহিণীর মোটামুটি একটা জ্ঞান থাকিলে অনেক সময়ে বিনা ব্যয়ে ও সহজে অনেক বিপদ আপদ অতিক্রম করিয়া চলা সম্ভব হয়।

অগ্নিদাহ—হঠাৎ কাহারও কাপড়ে আগুন লাগিয়া গেলে ভীত চিত্তে ছুটাছুটি না করিয়া দ্রুত হস্তে বস্ত্রাদি খুলিয়া ফেলিতে হইবে। যদি গায়ের জামা, সেমিজ, ব্লাউজে আগুন লাগে, তাড়াতাড়ি খুলিয়া ফেলা সম্ভব না হয় তবে মাটিতে গড়াগড়ি দিলে অথবা সতরঞ্চি প্রভৃতি দ্বারা চাপা দিলে আগুন নির্ব্বাপিত হইয়া যাওয়া সম্ভব। দেহের বেশী স্থান দগ্ধ হইয়া গেলে তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া কর্ত্তব্য।

অন্যথায় দগ্ধ ব্যক্তির প্রাণ বিয়োগ ঘটা বিচিত্র নহে। দেহের কোন স্থান সামান্য দগ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ মধুর প্রলেপ দিলে দাহের জ্বালা নিবারিত হইয়া যায়। মিথিলেটেড্ স্প্রীট্ বা ব্র্যাণ্ডি দিয়া দগ্ধ স্থান ভিজাইয়া দিলেও জ্বালা নিবারণ হয় ও ফোস্কা উঠিতে পারে না। ঘরে আগুন থাকিলে, সে ঘরে স্প্রীট্ ঢালিয়া দেওয়া অতিশয় বিপদজনক। চূণের জল ও নারিকেল তেল মিশাইয়া দিলে দাহের জ্বালা নিবারিত হইয়া ক্ষত সারিবার সহায়তা করে। লঙ্কার পাতার রস লেপন করিয়া দিলে অথবা গোল আলু বাঁটিয়া দিলেও বিশেষ উপকার দর্শে। পুড়িয়া সামান্য ক্ষত হইলে লাল কেঁচো তেলে ভাজিয়া সেই তেল ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। এই কয়টী প্রক্রিয়াই সামান্য পোড়ার পক্ষে অতিশয় হিতকারী। কিন্তু পোড়া বহুস্থানব্যাপক ও সাংঘাতিক হইলে কদাপি ইহারই উপর নির্ভর না করিয়া চিকিৎসকের জন্য লোক পাঠান কর্ত্তব্য এবং চিকিৎসক আসিবার পূর্ব্বে প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে ইহার যে কোন একটী প্রক্রিয়া করা চলে।

রক্তপাত—দেহে কোন স্থান কাটিয়া রক্তপাত হইতে থাকিলে পরিষ্কার ন্যাকড়া দ্বারা সেই স্থান টিপিয়া ধরিতে হইবে। তাহাতেও রক্ত বন্ধ না হইলে শীতল জল, বরফ বা সহ্যমত উষ্ণজল প্রয়োগে উপকার দর্শে। যদি তীব্রবেগে রক্ত ছুটিতে থাকে তবে কাটা জায়গায় কিছু উপরে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ক্ষতমুখে পরিষ্কার দূর্ব্বাঘাস থেতো করিয়া, গাঁদাপাতা থেতো করিয়া ক্ষতমুখ বাঁধিয়া দিলে উপকার দর্শিবে। যদি এই সব করাতেও রক্ত বন্ধ না হয় এবং দেহের কোন অঙ্গ কাটিয়া অনেকটা ফাঁক হইয়া যায় তবে ছিন্ন শিরা শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া

রাখিতে হইবে এবং অবিলম্বে চিকিৎসকের জন্য লোক পাঠাইতে হইবে। সামান্য কাটাস্থানে কচু ডাঁটার রস, দূর্ব্বার রস, গাঁদাপাতার রসের যে কোন একটী দিলেই সুফল দর্শে। কাটা স্থানে কদাপি মাটি, অপরিষ্কৃত নোংরা বস্ত্রাদি লাগাইতে নাই। তাহাতে খারাপ হইতে পারে। নাক দিয়া রক্ত পড়িতে থাকিলে, মাথায় বরফ দিলে এবং দূর্ব্বাঘাসের রস নাক দিয়া টানিলে উপকার দর্শিবে।

আঘাত পাইয়া মূর্চ্ছা হইলে—তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের প্রয়োজন। জ্ঞানলুপ্ত হইলেও অল্পক্ষণেই চেতনা ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা। মাথায় আঘাত লাগিলে চোখ-মুখ রক্তহীন বিবর্ণ হইয়া ওঠে। রোগীর অঙ্গের সমস্ত কাপড় জামা ঢিলা করিয়া দিতে হইবে। গায়ের জামা কাঁচি দিয়া কাটিয়া খুলিয়া ফেলিতে হইবে। রোগীকে নাড়াচাড়া না করিয়া মাথায় বরফ বা শীতল জল প্রয়োগ করিতে হইবে। চোখে-মুখে শীতল জলের ছিটা দিতে হইবে। রোগীকে ঘিরিয়া দাঁড়ান অতিশয় অন্যায়। তাহার গায়ে বাতাস লাগিতে দিতে হইবে ও মাথায় বাতাস করিতে হইবে। গুরুতর আঘাতে রোগীর দেহ শীতল হইয়া আসিলে গা গরম কাপড়ে ঢাকিয়া পায়ের কাছে গরম জলের বোতল রাখিতে হইবে।

হিষ্টিরিয়া—ইহা সচরাচর স্ত্রীলোকেরই হইয়া থাকে। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে তক্তপোষে না শোয়াইয়া মেঝেতে শোয়াইবার ব্যবস্থা করাই ভাল। হঠাৎ তক্তপোষ হইতে পড়িয়া গিয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হওয়া বিচিত্র নহে। হিষ্টিরিয়া রোগীকে যত অন্যমনস্ক ও প্রফুল্ল রাখা যায় ততই ভাল। রোগীর মানসিক শক্তি বাড়াইতে পারিলে

রোগ চলিয়া যায়। এই জন্যই বোধ হয় তাবিজ কবচের উপর বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পারিলে এ রোগে অতি শীঘ্র ফল দেখা যায়। রোগাক্রমণের সময় রোগীর হাত পা শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিতে নাই বা দাঁত খুলিতে চেষ্টা করিতে নাই। চোখে-মুখে ঠাণ্ডা জলের ছিটা ও মাথায় বাতাস দিলেই যথেষ্ট। রোগীর সম্মুখে কদাপি এ রোগের বিষয় লইয়া আলোচনা করা উচিত নহে, বা তাহাকে বিষণ্ণভাবে থাকিতে দিতে নাই।

গলায় কিছু আটকাইয়া গেলে—হঠাৎ শ্বাস রুদ্ধ হইয়া মৃত্যু হওয়া অসম্ভব নহে। হা করাইয়া আবদ্ধ বস্তু আঙ্গুল দিয়া বাহির করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কোন কোমল খাদ্য দ্রব্য আট্‌কাইয়া গেলে তাহা ঠেলিয়া নীচে নামাইয়া দিতে পারিলেও হয়। কিন্তু কোন কঠিন পদার্থ আটকাইয়া গেলে ও তাহা আঙ্গুল দিয়া বাহির করিতে না পারিলে পিঠের মাঝখানে সজোরে আঘাত করিলে উহা বাহির হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। গলায় সুড়সুড়ি দিয়া বা বমনকারক কোন ঔষধ খাওয়াইয়া বমির বেগ দেওয়াইতে পারিলে বা বমি করাইতে পারিলে উপকার হইবে।

মাছের কাঁটা গলায় আটকাইলে ভাতের ডেলা, চিড়ার ডেলা, কলা প্রভৃতি বেশী পরিমাণে একবারে গিলিলে কাঁটা নামিয়া যাইবে। না নামিলে চিকিৎসক দেখাইতে হইবে।

কাণে কিছু ঢুকিলে—কাণে ছোট পোকা বা পিপ্‌ড়ে ঢুকিলে ভয়ানক অস্বস্তি বোধ হয়। তাহা খোঁচাইয়া বাহির করিবার চেষ্টা করা অতিশয় বিপদজনক। সরিষার তেল সহ্যমত গরম করিয়া অথবা জল কাণে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া দিয়া কর্ণগহ্বর পূর্ণ করিয়া অন্যদিকে কাৎ

ফিরিলেই তাহা বাহির হইয়া যাইবে। কাণে জল ঢুকিলে সেই কাণেই আরো কয়েক ফোঁটা জল দিয়া চট্ করিয়া কাৎ ফিরিলেই জল বাহির হইয়া যায়। মটর বা অন্য কিছু কাণে ঢুকিলে সেই দিকে কাৎ হইয়া বিপরীত কাণে আস্তে আস্তে চাপড় দিলে বাহির হইয়া যাওয়া সম্ভব। সোন্না দিয়াও বাহির করা যাইতে পারে। বাহির করিতে না পারিলে চিকিৎসকের আশ্রয় লওয়াই উচিত।

বিষ ভক্ষণ করিলে—বিষ বা বিষাক্ত কোন ঔষধ সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের জন্য লোক পাঠাইয়া রোগীকে সর্ব্বাগ্রে বমি করাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। আঁস ধোয়া জল, লবণ জল, গোমূত্র প্রভৃতি খাওয়াইয়া অথবা গলায় আঙ্গুল দিয়া যে ভাবেই হোক্ রোগীকে বমন করাইতেই হইবে। রোগীকে কিছুতেই ঘুমাইতে দিতে নাই। হাটাইয়া, দৌড় করাইয়া, সুড়সুড়ি দিয়া যে ভাবেই হোক রোগীকে জাগাইয়া রাখিতে হইবে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের হাতে রোগীর ভার দিতে হইবে।

ক্ষিপ্ত কুকুর বা শৃগাল দংশন—দংশন করিলেই খোঁজ লইতে হইবে শৃগাল বা কুকুর ক্ষিপ্ত কি না। ক্ষিপ্ত না হইলেও দষ্ট স্থান তৎক্ষণাৎ উত্তপ্ত লৌহ শলাকা, কষ্টিক অথবা কার্ব্বলিক এসিড দ্বারা পোড়াইয়া দিতে হইবে। কুকুর বা শৃগাল ক্ষিপ্ত হইলে কাল বিলম্ব না করিয়া কলিকাতা মেডিকাল কলেজে চিকিৎসার্থ যাইতে হইবে। যে কুকুর বা শৃগালে দংশন করে, দংশন করিয়াই সে যদি নিরুদ্দিষ্ট হইয়া যায়, ক্ষিপ্ত কি না যদি জানিবার উপায় না থাকে, অথবা মনে কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক হয় তবে অবিলম্বে চিকিৎসার্থ যাওয়াই মঙ্গল। ক্ষিপ্ত

শৃগাল-কুকুরের লেজ সর্ব্বদাই নিচের দিকে ঝুলিয়া থাকে, জিভ্ ঝুলিয়া পড়ে ও মুখ হইতে অবিরত লালাস্রাব হয়, মাথা নীচু করিয়া কেবল ভীত ও চকিতভাবে চারিদিকে ইতস্তত ছুটাছুটি করে এবং দুই সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

সর্প দংশন—সর্প দংশনের অব্যর্থ ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হইয়াছে কি না তাহা নির্ণয় করিয়া বলা কঠিন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে সর্প থাকিতে পারে না, ঘর দুয়ার পরিষ্কার রাখিলে সর্পের চলাচল কম হয়। ঘরে ইঁদুরের গর্ত্ত থাকিলে ইঁদুরের লোভে সর্প সেই গর্ত্তে ঢুকিয়া অনেক সময় গৃহে প্রবেশ করে। হাত দিয়া ইঁদুরের গর্ত্ত বুজাইতে যাইয়া অনেকে সর্পদষ্ট হইয়াছেন। অনেক শিশু গৃহের গর্ত্তে আঙ্গুল ঢুকাইয়া দিয়া সর্পদংশনে প্রাণ হারাইয়াছে এরূপ বহু দুর্ঘটনা প্রায়ই শুনা যায়। গৃহের কোন গর্ত্তই কদাপি হাত দিয়া বুজাইতে নাই। গৃহ যাহাতে গর্ত্তশূন্য ও ইঁদুরশূন্য হয় তাহা করা উচিত। প্রতিদিন ধূপ, ধূনা, গন্ধক প্রভৃতির ধূম গৃহের প্রতিঘরে দিলে সর্প ঐ গন্ধ সহ্য করিতে না পারিয়া দূরে সরিয়া যায়। ইহাতে গৃহের বায়ুও বেশ বিশুদ্ধ হয়। পূর্ব্বে আমাদের দেশে ঘরে ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ ও ধূনা দেওয়ার প্রথা ছিল। এখন বিদেশী হ্যারিকেন লণ্ঠনের প্রভাবে মাটির প্রদীপ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার বাতাসে ধূপ-ধূনার পাট উড়িয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে সপের বিবর জলমগ্ন হইয়া গেলে অনেক সময় নিরুপায় হইয়া তাহারা গৃহস্থের কুটীরে আশ্রয় লয় এবং সুযোগ পাইলেই দংশন করিতে ছাড়ে না। এজন্য বর্ষাকালেই গ্রামে ঘরে সর্পদংশনের বাহুল্য দেখা যায়। এ সময় ঘরে ধূপ, ধূনা বা কার্ব্বলিক এসিড ব্যবহার করা উচিত।

সর্পে দংশন করিলে দষ্ট স্থানের চারিপাশ নীলাভ হইয়া ওঠে। সর্প দংশন পোকামাকড়ের দংশন হইতে গভীর হইয়া থাকে। সর্প দষ্টব্যক্তি লঙ্কা চিবাইলেও ঝাল বোধ হয় না।

সর্প দংশনের সন্দেহমাত্র, অথবা অন্য কোন পোকামাকড়ে দংশন করিলেও দংশন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত হাতের কাছে যাহা কিছু থাকুক, নিজের পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়িয়া দিতে হইলেও দষ্ট স্থানের কয়েক অঙ্গুলি উপরে ক্রমান্বয়ে সজোরে দুই তিনটী তাগা বাঁধা সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। কিছুতেই যেন দষ্ট স্থান হইতে রক্ত চলাচল করিতে না পারে। রোগী সম্পূর্ণ নির্ব্বিষ হইয়া না গেলে কাহারও কথায়ই ঐ তাগা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। এইরূপ করিয়া রোগী অকস্মাৎ প্রাণ হারাইয়াছে, এরূপ ঘটনা আমি জানি। উত্তমরূপে তাগা বাঁধা হইলে উপযুক্ত চিকিৎসক ও বিশ্বাস্য ওঝার জন্য তৎক্ষণাৎ লোক পাঠান উচিত। দষ্ট স্থান একটু গভীর করিয়া ছুরি দ্বারা চিরিয়া পার্ম্মাঙ্গানেট অব পটাশ নামক ঔষধ কিছু কাল ঘষিয়া দিলে সুফল হইবার সম্ভাবনা। মুরগী চিকিৎসায় বিষাক্ত সর্প দংশন হইতে জীবনরক্ষা হইয়াছে, এরূপ ঘটনা আমি অতিশয় বিশ্বস্ত লোকের নিকট শুনিয়াছি। কয়েকটা মুরগীর ছানা তাড়াতাড়ি যোগাড় করিয়া লইতে হয়। ছুরি দ্বারা ছানার গুহ্য দ্বার চিরিয়া দষ্ট স্থানের সহিত এমনভাবে লাগাইয়া ধরিতে হইবে যেন মুরগীর ঐ চেরা স্থান ও দষ্টস্থান এক হইয়া মিলিয়া যায়। ছানাটী মরিয়া গেলে আর একটী ঐরূপে ধরিতে হইবে। ক্রমান্বয়ে এই ভাবে পর পর ছানা প্রয়োগ করিতে হইবে। যখন মুরগীর ছানা আর মরিবে না তখন বুঝা যাইবে রোগীর দেহ নির্ব্বিষ হইয়াছে। ৩।৪টী ছানা ঐভাবে প্রয়োগ করিয়াও

যদি না মরে তবেই রোগী সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তখন যদি রোগী লঙ্কা খাইলে ঝাল বোধ করে এবং দষ্ট স্থানে শীতল লোহা স্থাপন করিলে তাহা শীতল বোধ করে তবে রোগী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

রোগ ও আকস্মিক বিপদপাত প্রভৃতিতে একান্ত প্রয়োজনীয় কতকগুলি দ্রব্য প্রত্যেক গৃহস্থেরই সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয়। পল্লীগ্রামে অনেক সময় এই সব দ্রব্য সংগ্রহ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। গৃহে এই সব দ্রব্য থাকিলে সহরেও সময় ও শ্রমের লাঘব হয়। সময়ে এমন সাংঘাতিক ঘটনা ঘটিতে পারে যে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। দোকান হইতে আনিতে গেলে অনেক বিলম্ব হইবারই সম্ভাবনা। এই সব প্রয়োজনীয় দ্রব্যের একটী তালিকা যথাসাধ্য নিম্নে দেওয়া হইল।

রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি।

শরীরের উত্তাপ দেখিবার থার্ম্মোমিটার একটী। বাহ্য করাইবার পাত্র (বেড্‌প্যান্) একটী, বেড্‌প্যানের অভাবে মাটির সড়া; প্রস্রাব করিবার পাত্র, বা মোটা মুখওয়ালা বোতল একটী। দুর্ব্বল, অশক্ত, সত্ত্বলক্ষয়কারী রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে বাহ্য, প্রস্রাব বা বমি করাইবার জন্য কদাপি শয্যা হইতে উঠাইতে নাই। এরূপ অবস্থায় রোগী উঠিয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। থুথু ফেলিবার পাত্র। পথ্য খাওয়াইবার নলযুক্ত পাত্র। ঔষধ খাওয়াইবার দাগ কাটা গ্লাস। ছোট বড় তিন চারিটী পরিষ্কার শিশি, ইহাতে ঔষধ আনা চলিবে। গরম জলের সেক দিবার রবারের ব্যাগ বা পরিষ্কার তিন চারিটী বড় বোতল। মাথায় বরফ দিবার থলে। ছোট বড় চামচ দুইটী। ডাক্তারী কাঁচি একটী। ইহা

দ্বারা নবজাত শিশুর নাড়ী কাটা চলিবে। ধারাল ছুরি একখানা। জল গরম করিবার পাত্র। ষ্টোভ। গরম জল ঢালিবার পাত্র। ডাক্তারী তুলা এক প্যাকেট। পরিষ্কার সিদ্ধ করা কাপড় একখানি। নরম বালিস দুইটী। পাশ বালিস। পরিষ্কার বিছানার চাদর। নরম গদি। অয়েল ক্লথ বা রবার ক্লথ এক গজ। তোয়ালে দুই খানা। ঔষধ মারিবার খলডাঁটী। বিশুদ্ধ মধু। টিংচার আইওডিন। মেথিলেটেড্ স্পিরিট্। চূণের জল। জোয়ানের জল। তারপিন তেল। রেড়ীর তেল। গ্লিসারিন। পটাশ পারামাঙ্গনেট। ফিনাইল। মকরধ্বজ। ফিটকারী। সোহাগা ইত্যাদি।

মুষ্টিযোগ

আমরা অশ্রদ্ধা, অবহেলা ও অজ্ঞতায় আমাদের যে সব পৈতৃক সম্পদহারা হইয়াছি মুষ্টিযোগ তাহার অন্যতম। ব্যাধিপীড়া আমাদের নিত্য সহচর, ঔষধ আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয়, অথচ আমরা তাহা নিত্য ক্রয় করিবার সামর্থ্যহীন। তবুও স্বদেশজাত অমূল্য ও অমোঘ সহজপ্রাপ্য দ্রব্যের আমরা সন্ধান করি না। যাহা ভগবানের স্নেহের অবারিত, অফুরন্ত দান, তাহা অবহেলা করিয়া খোকা-খুকুর একটু সর্দ্দি লাগিলেই বিদেশী ঔষধের দোকানে ছুটিয়া গিয়া যা হয় একটা রংবেরং এর ঔষধ যা' তা' দাম দিয়া আনিয়া তবে নিস্তার পাই।

আগেকার সব গৃহী গৃহিণীরা এমন সব লতাপাতার সন্ধান জানিতেন

যাহা অমূল্য ও অমোঘ ভেষজরূপে ব্যবহৃত হইয়া আশ্চর্য্য ভাবে ব্যাধি নিরাময় করিত। ইহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান।

যে তুলসী আমাদের গৃহকোণে মূর্ত্তিমতী স্বাস্থ্যদায়িনী ত্রিতাপহারিণী দেবীরূপে বিরাজিতা, যাহার পাতা হইতে মুল পর্য্যন্ত অমোঘ শক্তিশালী মহৌষধ, যাহার বায়ু পর্য্যন্ত রোগবিধ্বংশী, এত প্রয়োজনীয় বলিয়া যাহাকে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ দেবী আখ্যা দিয়া সাদরে গৃহকোণে স্থান দিয়া গিয়াছেন, সকাল সন্ধ্যায় প্রণাম ও প্রদীপ দিবার ছলেও যাঁহার নিকট দুই দণ্ড বসিবার ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন, আপনাদিগকে সভ্য ও উন্নত বিবেচনায় আবর্জ্জনাজ্ঞানে আমরা কেহ কেহ সে তুলসীকে প্রাঙ্গণ হইতে চির বিদায় দিয়া গুণ-গন্ধহীন বিদেশী মরশুমী ফুলগাছে তাহা ভরিয়া রাখিয়াছি। তুলসীর ন্যায় ডালিম, অশোক, বকুল, অর্জ্জুন, জাম, নিম, বেল, অপরাজিতা, অশ্বগন্ধা প্রভৃতি এবং আরও কত সংখ্যাহীন বৃক্ষাদিকে আমরা অবহেলা করিয়া যে নিজেদের দুঃখ-দারিদ্র্য নিজেরা বাড়াইতেছি তাহার সীমা পরিসীমা নাই।

দুই পুরুষ পূর্ব্বে আমাদের গ্রামেরই এক বিধবা ব্রাহ্মণী ঠাকুরাণী কেবল লতাপাতার জাপ বাঁধিয়া গলিত কুষ্ঠ ও দুষ্ট ক্ষত নিরাময় করিয়াছেন, ইহা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি। পুনঃ পুনঃ অস্ত্রোপচার করিয়া ও নানারূপ ঔষধ প্রয়োগেও যে ক্ষত নিরাময় হয় নাই, দেশীয় গাছগাছড়া হইতে প্রস্তুত ঔষধ প্রয়োগে সেই ক্ষত বিনা জ্বালা-যন্ত্রণায় অল্প সময়ে নিরাময় হইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আমরা শিক্ষা গর্ব্বে গর্ব্বিত, আধুনিক সভ্যতায় আচ্ছন্ন তাই চক্ষের উপর তাহার সুফল দেখিয়াও তাহা বিশ্বাস করিতে চাই না।

যদি কাহারও এই সব দ্রব্যগুণে বিশ্বাস থাকে, সাধারণ ব্যাধি-পীড়ায়ও ঔষধ পত্রাদি কিনিয়া বহু কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিবার ইচ্ছা ও সামর্থ্য না থাকে, তবে অতি সাধারণ অসুখ-বিসুখে এই সব মুষ্টিযোগে বিশেষ ফল দর্শিবে। কাহারও কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে নিকটস্থ বিজ্ঞ কবিরাজের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতে পারেন। তবে এই সব ঔষধ চিকিৎসকের অনুমোদিত ও পরীক্ষিত এবং অনেক স্থানে প্রচলিত, ইহা আমি জানি।

সর্দ্দিকাশি—সর্দ্দি আক্রমণের সময়ে অতি সামান্য মাত্রায় কর্পূর খাইলে প্রশমিত হইয়া যায়। রাত্রিতে শুইবার পূর্ব্বে পায়ের তলায় উত্তমরূপে গরম সরিষার তেল মালিশ করিয়া নিদ্রা গেলে অনেক উপকার দর্শে। এক ঝিনুক পরিমাণ তুলসী পাতার রস মধু সহ পান করাইলে শিশুর সর্দ্দিতে উপকার দর্শে। দ্রোণ পুষ্প বুকের দুধে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই দুধ খাওয়াইলে নিতান্ত শিশুর সর্দ্দিতে উপকার হয়; আমের পাতায় সরিষার তেল ও চূণ লইয়া তেল প্রদীপে গরম করিয়া হাতে-পায়ে মালিশ করিলে শিশুর প্রবল সর্দ্দিতেও উপকার হয়। কেবল তেল গরম করিয়া দিলেও উপকার হয়। নাক বন্ধ হইয়া আসিলে নাকের উপর গরম তেল মালিস করিলে শিশুরা আরামে নিঃশ্বাস ফেলিবে। কালজিরা বা কর্পূর ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া পুনঃ পুনঃ ঘ্রাণ লইলে সর্দ্দি অনেক পরিমাণে উপশম হয়। বাসক পাতার রস মধু সহ সেবন করিলে কাশিতে বিশেষ উপকার হয়।

সামান্য জ্বর—সামান্য জ্বরে লঙ্ঘনই সর্ব্ব প্রথম ঔষধ। সেফালিকা পাতার রস মধু সহ সেবনে উপকার দর্শে। সেফালিকা পাতার রস ও

গুলঞ্চের রস সামান্য মধু সহ সেবন করাইলে শিশুদের প্লীহা যকৃত সংযুক্ত জ্বরে বিশেষ ফল হয়। জ্বর আসিবার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে নিসিন্দাপাতা হাতে রগড়াইয়া পুনঃ পুনঃ ঘ্রাণ লইলে জ্বর আসা বন্ধ হয়। কালো মেঘের পাতার রস মধু সহ সেবন করাইলেও শিশুদের বিশেষ ফল হয়। জ্বরের সঙ্গে পেটের অসুখ বা অন্য কোনরূপ গুরুতর উপসর্গ থাকিলে প্রথম হইতেই চিকিৎসকের আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য। জ্বর ছাড়িয়া গেলে ও বহু কুইনাইন সেবনের পর প্রতিদিন প্রাতে চিরতা ভিজাইয়া জল খাইলে রক্তহীনতা, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি নানাবিধ উপসর্গ দূর হইয়া শরীরে বলাধান হয়।

কোষ্ঠবদ্ধতা—আহারের ঘণ্টা দুই পর, রাত্রিতে শুইবার পূর্ব্বে অধিক পরিমাণে শীতল জল পান করিলে, প্রত্যূষে উঠিয়া এক গ্লাস শীতল জল পান করিলে এবং প্রতিদিনই কিছু কিছু ফলমূল খাইলে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়। বুকের দুধের সঙ্গে অতি সামান্য মাত্রায় উচ্ছে পাতার রস খাওয়াইলে শিশুর কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। এরণ্ড তৈল পানের বোঁটায় লাগাইয়া গুহ্য দ্বারে প্রবেশ করাইলে শিশুর বাহ্য হইয়া থাকে।

অজীর্ণ—শিশুর পথ্যের সঙ্গে সামান্য মাত্রায় চূণের জল খাওয়াইলে সুফল দর্শে। মৌরী ভিজান জলে ২।১ ফোঁটা লেবুর রস দিয়া খাওয়াইলে অজীর্ণ রোগে বিশেষ ফল হয়। তেলাকুচা পাতার রস সামান্য পরিমাণে খাওয়াইলে উপকার হয়। হঠাৎ পাতলা ভেদে কয়েক ফোঁটা মুথার রস চিনির জল সহ দিবসে তিন বার সেবন করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

অরুচি—প্রাতে আদা লবণ খাইলে অগ্নিবল বৃদ্ধি হয়। মধুর সহিত আদার রস পান করিলেও উপকার হয়। পরিমিত ব্যায়াম

করিলে ও কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলে ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া অরুচি বিনষ্ট হয়। দণ্ড কলসের পাতা তেলে ভাজিয়া খাইলে উপকার হয়।

আমাশয়—থানকুনি পাতার রস চিনি সহ সকাল-সন্ধ্যায় দুই বেলা সেবন করিলে সুফল দর্শে। পুরাতন তেতুঁল চিনি ও মর্ত্তমান কলা মিশাইয়া খাইলে উপকার হয়। ইসবগুল ও মিছরি এক তোলা পরিমাণ লইয়া জলের সঙ্গে গুলিয়া খাইলে উপকার হয়। গন্ধভাদালিয়ার পাতার রস মধু সহ অথবা ২।৩টী দুগ্ধিকার ডগা আতপ চাউল ধোয়া জলে থেঁতো করিয়া সেই রস দিনে ২।৩ বার সেবন করাইলে শিশুর আমাশয়ে সুফল দর্শে। যথেষ্ট আম নির্গত হইয়া গেলে ডালিমের খোসা ছাগ দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ সেবনে অথবা কুড়চির ছাল ও ডালিমের ছাল সিদ্ধ করিয়া সেই জলপানে রক্তামাশয়েও উপকার হয়। আমাশয়ের সঙ্গে প্রবল জ্বর, শরীরের অত্যধিক দুর্ব্বলতা, দমকা ভেদ প্রভৃতি থাকিলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের আশ্রয় লইতে হইবে।

অম্ল—কয়েক খণ্ড আমলকী থেতো করিয়া সামান্য জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন সকালে চিনি সহ সেই জল পান করিলে উপকার হয়। আহারের সঙ্গে জল পান না করা, উত্তেজক ঝাল ও টক আহার না করা, প্রাতর্ভ্রমণ, সহ্যমত ব্যায়াম, নারিকেলের খাবার প্রভৃতি খাওয়া, ডাবের জল পান করা ও কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা অম্লের পক্ষে হিতকারী।

ক্রিমি—উচ্ছে পাতার রস অথবা আনারসের পাতার গোড়ার দিকের সাদা অংশ ছেঁচিয়া চিনি সহ সেবন করাইলে শিশুর ক্রিমিতে বিশেষ

উপকার দর্শে। ডালিমের মূলের রস বিড়ঙ্গ চূর্ণ মিশাইয়া পান করিলে বিশেষ উপকার হয়। পায়খানা যাইবার পূর্ব্বে লবণ জল বা নিমছাল সিদ্ধ করিয়া সেই জল দ্বারা এনিমা দিলে সূত্রবৎ কৃমির উপশম হয়।

বমন—মুড়ি ভিজান জল পান করিলে, অথবা চিনির সরবতে কচি আমপাতা রগড়াইয়া পান করিলে উপকার হয়। ডাবের জল ও মৌরী ভিজান জলও বিশেষ উপকারী। কঠিন বমিতে থানিকটা দুর্ব্বার রস চিনি সহ খাইলে উপকার দর্শে।

পেটফাঁপা—লবণ ও যোয়ান মিশাইয়া খাইলে পেট ফাঁপার উপশম হয়। সাবান জল দিয়া নিচ পেট উত্তমরূপে মালিশ করিলে শিশুর পেট ফাঁপায় উপকার দর্শে।

ফোড়া—তোকমার পুলটিশ উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া ফোড়া ফাটিয়া শুকান পর্য্যন্ত ব্যবহার করা চলে। নিমপাতা বাঁটিয়া পুলটিশ দিলে অথবা সাবান ও চিনি একত্র মিশাইয়া দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। কচি পুঁই পাতার সম্মুখের পিঠে বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত মাখিয়া অগ্নির উত্তাপে উষ্ণ করিয়া ঘন ঘন লাগাইলে ফোড়া ফাটিয়া যাইবে ও পুঁজ নির্গত হইবার সহায়তা করিবে। নিমপাতা গব্য ঘৃতে ভাজিয়া ঐ ঘৃতের সঙ্গেই মিশাইয়া মলম প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য হয়। যজ্ঞ ডুমুরের আঠা ফোড়ার উপর প্রলেপ দিলে ফোড়া বসিয়া যায়। ফোড়া অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক, বহুস্থানব্যাপক ও শক্ত হইয়া উঠিতে থাকিলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

মুখে ঘা—সোহাগার খৈ মধুর সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করিলে আরোগ্য হয়।

পাঁচড়া-চুলকণা—নিমপাতাসিদ্ধ জলে ধুইয়া চালমুগুরার তেল লাগাইলে আশু উপকার হয়। কচি নিমপাতা ভাজা খাইলে ও নিম তেল বা নিমের মলম লাগাইলে বিশেষ উপকার হয়। চন্দনের তৈল ব্যবহারে পাঁচড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

চক্ষুউঠা—হাতী শুড়ার পাতার রস দিবসে ২।৩ বার দুই এক ফোঁটা করিয়া দিলে বা গুগ্‌লির জল ৪।৫ বার চক্ষে দিলে বিশেষ উপকার হয়।

দাঁতের পীড়া—বকুল ছাল ও গুপারি বা নারিকেলের শিকড় জলে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া দিনে ২।৩ বার ও রাত্রিতে শুইবার পূর্ব্বে উত্তমরূপে কুলকুচা করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

ছুলি—সোহাগার খৈ লেবুর রস সহ অথবা ঘৃত সহযোগে লাগাইলে, অথবা শ্বেত চন্দন ঘষিয়া লেবুর রস সহ লাগাইলে অথবা তামাক পাতা ভিজান জলে হরিতাল পিষিয়া মালিশ করিলে ছুলি আরোগ্য হইবে।

আঙ্গুলহাড়া—কচি বেগুনের মধ্যে লবণ পুরিয়া আক্রান্ত অঙ্গুলি তাহার মধ্যে ঢুকাইয়া রাখিলে আরোগ্য হয়। পাকিয়া উঠিলে ছেঞ্চি শাক আদা সহ নির্জ্জলা বাঁটিয়া লাগাইয়া বাঁধিয়া রাখিলে ঘা অতি সত্বর ফাটাইয়া শুকাইয়া দেয়।

ব্রণ—হওয়া মাত্র চূণ দিলে, অথবা গোলমরিচ বাঁটিয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়। যদি বহুস্থানব্যাপক ও অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক হয় তবে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া কর্ত্তব্য।

পরিশিষ্ট

কি উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের গৃহধর্ম্ম সত্যিকারের গৃহধর্ম্মাচরণে ফুটিয়া উঠিতে পারে, আমাদের ঘরে ঘরে লুপ্ত শান্তি, স্বাস্থ্য, সম্পদ, আনন্দ, ধর্ম্ম, সত্য, শ্রী আবার ফিরিয়া আসিতে পারে, প্রতি ঘরে মানুষের মত মানুষ জন্মিয়া আমাদের বংশ, পরিবার, সমাজ, স্বদেশকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারে, আমাদের পরিবার, সমাজ ও জাতির ক্লেদ দূর করিয়া দিয়া কোন্ পথে আমরা মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার সন্ধান করিয়া লইতে পারি, ঘরে ঘরে মানুষ গঠন করিয়া আমাদের সকল প্রকার সমস্যা ও বিরুদ্ধতার বিপক্ষে মানুষের মত লড়িতে পারি, অজ্ঞতায়, অন্যায়ে, অবিচারে আমাদের গৃহের অন্ধকূপে যে নারীহত্যা, শিশুহত্যা, প্রসূতি-হত্যা চলিতেছে কি করিলে আমরা তাহা প্রতিরোধ করিতে পারি, কি করিলে চারিদিকের বিরুদ্ধ ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও আমরা ঘরে ঘরে আমাদের মনুষ্যোচিত ধর্ম্মের দীপটীকে জ্বালাইয়া রাখিতে পারি, এই নিশ্চিত মৃত্যু, সীমাহীন দারিদ্র্য, অখণ্ড দুঃখ-বেদনার পাষাণ ভার ঠেলিয়া আমরা কি ভাবে মানুষের মত স্বাস্থ্যবলগর্ব্বোন্নত দেহে, ন্যায়, সত্য, ধর্ম্মে উদ্ভাসিত হইয়া মানুষের ন্যায় জগতে বিচরণ করিতে পারি, তাহারই আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থারম্ভ করিয়াছিলাম। গ্রন্থ মধ্যেও সেই কথা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। হয়তো ইহার মধ্যে বহু ভুল ত্রুটী রহিয়া গেল। হয়তো এমন অনেক বিষয় আমি উল্লেখ করিতে পারি নাই, যাহা আমার জ্ঞান, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার অতীত। কোন সহৃদয় পাঠক পাঠিকা আমার কোনরূপ ত্রুটিবিচ্যুতি জানাইলে সসম্মানে তাহা গ্রহণ করিয়া বারান্তরে মুদ্রিত করিবার আশা রহিল।

গৃহধর্ম্ম

যে কথা আমার এই আগাগোড়া গ্রন্থের অন্তরালে রহিয়াছে, যাহা আমি সংসারের প্রতিপদক্ষেপে অনুভব করিয়া লইবার জন্য প্রত্যেক কথার সহিত সংযুক্ত রাখিয়াছি, প্রত্যেক মানবের জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যাহা তাহাকে সকল প্রকার দুঃখ, বেদনা, বিপদে রক্ষা করিয়া চলিতে পারে সেই সম্বন্ধে আর দুই একটী কথা বলিয়া গ্রন্থ শেষ করিব।

কাহারও কাহারও জীবনে এমন এক একটা মর্ম্মান্তিক সময় আসিয়া দেখা দেয়, যখন জীবন দুর্ব্বহ, দুঃসহ, যন্ত্রণাময় হইয়া ওঠে। সংসার তিক্ত বিষাক্ত বলিয়া বোধ হয়। সকল কামনা, সকল আকাঙ্ক্ষা, সর্ব্ব প্রকার আশা, আনন্দের ছবি চক্ষের নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া যায়। হয়তো কাহারও জরাগ্রস্ত বার্দ্ধক্যের অন্তিম সম্বল একমাত্র পুত্র পিতার গৃহশূন্য করিয়া মায়ের বুক ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া গেল, কেহবা উদয়াস্ত সংগ্রাম করিয়াও অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে না পারিয়া আত্মহত্যাপ্রয়াসী হইয়া উঠিল, কেহ বা দুশ্চরিত্র স্বামী কর্তৃক উপেক্ষিতা, অনাদৃতা, লাঞ্ছিতা হইয়া ধীরে ধীরে আপনাকে নিঃশেষে ক্ষয় করিয়া আনিতে লাগিলেন, কাহারও বা সংসারজীবনের পরিপূর্ণ সুখ, আনন্দ, উৎসবের মধ্যে প্রিয়তমা ভার্য্যা আপন মৃত্যুশয্যা বিছাইয়া সংসারের সকল সুখ, আনন্দ, হাসিকলরোল মুছিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। কর্ম্ম দোষে সংসারে যাঁহাদের ভাগ্যে বিধাতা এই সব মর্ম্মন্তুদ দুঃখ লিখিয়া রাখিয়াছেন তাঁহাদেরও তো বাঁচিয়া থাকিতে হয়। জীবন-মরণের মালিক যিনি তাঁহারই নির্দ্ধারিত মরণের দিনটী না আসিলে শত মরণ কামনা করিয়াও তো মৃত্যুকে পাওয়া যায় না। কি লইয়া তাঁহারা বাঁচিয়া থাকিবেন? কখন কাহার ভাগ্যে কোন্ দুর্দ্দৈব অতি অকস্মাৎ আসিয়া কোন্ রূপে দেখা

দিবে তাহা এক অন্তর্যামী ভিন্ন কে-ই বা জানে। তখন কি আশ্রয় করিয়া মানুষ জীবন ধারণ করিবে? সেই চরম দুঃখের দিনে পরম বাঞ্ছিত ভগবানের চরণে শরণ লওয়া ভিন্ন আর আমাদের কি উপায় আছে।

পুত্রশোকাতুর, জরাপীড়িত, অশক্ত, অথর্ব্ব জীবনসায়াহ্নে, পরের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী, মুখাপেক্ষী, দুর্ব্বহ, দুঃসহ জীবনযাপনে, জীবনের সকল কামনা-বাসনা ভ্রষ্ট হইয়া অকাল বৈধব্যে তাঁহারই মুখ চাহিয়া জীবনের দিন গণনা করা ভিন্ন আর কোন্ পথই বা আছে। তাই সংসারে প্রবেশ করিবার সময়ই তাঁহারই চরণে বিশ্বাস রাখিয়া, তাঁহারই নাম মূলধন করিয়া লইয়া, জীবনের সকল কর্ম্ম তাঁহারই চরণে সমর্পণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া লইতে হয়, তাহা হইলে জীবনে সকল বিরুদ্ধতাকেই জয় করিয়া চলা যায়।

যিনি পিতৃস্নেহে সংসার পালন করিতেছেন, মায়ের মত অযাচিত করুণায় সৃষ্টিকে বক্ষে ধরিয়া রহিয়াছেন, প্রভুরূপে নিখিল বিশ্বের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিয়াছেন, শাস্তারূপে দুষ্কৃতের দমন করিতেছেন, যাঁহা হইতে সমস্ত বিশ্ব উদ্ভূত হইয়া আবার যাঁহাতে বিলীন হইতেছে, যিনি সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বময়, শিশুর হাসিতে, বিহঙ্গের কলকণ্ঠে, জননীর স্নেহে, সতীর প্রেমে, ফলফুল, পুষ্পবৃক্ষ, বন, বিটপি, লতা, পাতা, তৃণ, গুল্মে, প্রতি অণু পরমাণুতে যাঁহার মহিমা চির বিকসিত, তাঁহারই নাম হৃদয়ে লইয়া যাঁহারা গৃহধর্ম্মে প্রবেশ করিবেন তাঁহারা নিশ্চয়ই আদর্শ গৃহধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া অখণ্ড শান্তির অধিকারী ও সংসারসংগ্রামে জয়যুক্ত হইয়া তাঁহারই চরণতলে মানবের চরম ও পরম বাঞ্ছিত আশ্রয় লাভ করিয়া মুক্তির পথে চলিয়া যাইবেন।

শেষ